

না-মানুষের কাহিনী

না-মানুষের কাহিনী

নারায়ণ সান্যাল

S. C. B. R. T, West
Library
Calcutta

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

S. C. B. R. T, West
Library
Calcutta

NA-MANUSHER KAHINI
Narayan Sanyal
Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073

© শর্মিলা সান্যাল

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, মাঘ, ১৩৯৬
জানুয়ারী, ১৯৯০

প্রকাশক :
সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

অলঙ্করণ ও অঙ্গসজ্জা
গৌতম দাশগুপ্ত
অরুণ চট্টোপাধ্যায়
লেখক

প্রচ্ছদ :
গৌতম দাশগুপ্ত

প্রুফ নিরীক্ষা
সুবাস মৈত্র

মুদ্রক :
শ্রী স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 6.9.01
Accn. No. 10165

দাম ৩০ টাকা
Rupees Thirty only

॥ কৈফিয়ৎ ॥

এ বইতে সাজানো গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে সাময়িক পত্রিকায়—*ভারতকথার* রবিবাসরীয়তে, অথবা যুগান্তর, কথা সাহিত্য, *কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। *না-মানুষী বিশ্বকোষ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ 'মেরুদণ্ডী পর্যায়ে' তথ্য ও তত্ত্বের খাঁজে খাঁজে গোঁজামিল দেব বলে এগুলি গুছিয়ে রেখেছিলাম। ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'অমেরুদণ্ডী'পর্যায়েও তাই করেছি। কিন্তু এবার দেখছি না-মানুষী মেরুদণ্ডী প্রাণীর তথ্য এত বেশি যে, গল্পগুলোর সেখানে ঠাঁই হচ্ছে না।

অধিকাংশ গল্পের প্লট বিদেশী কাহিনী থেকে ধার নেওয়া। উৎসসূত্র সম্বন্ধে কাহিনীর মুখপাতে অথবা নটেগাছ মুড়ানোর পরে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সূচীপত্র এখানে দেওয়া গেল:



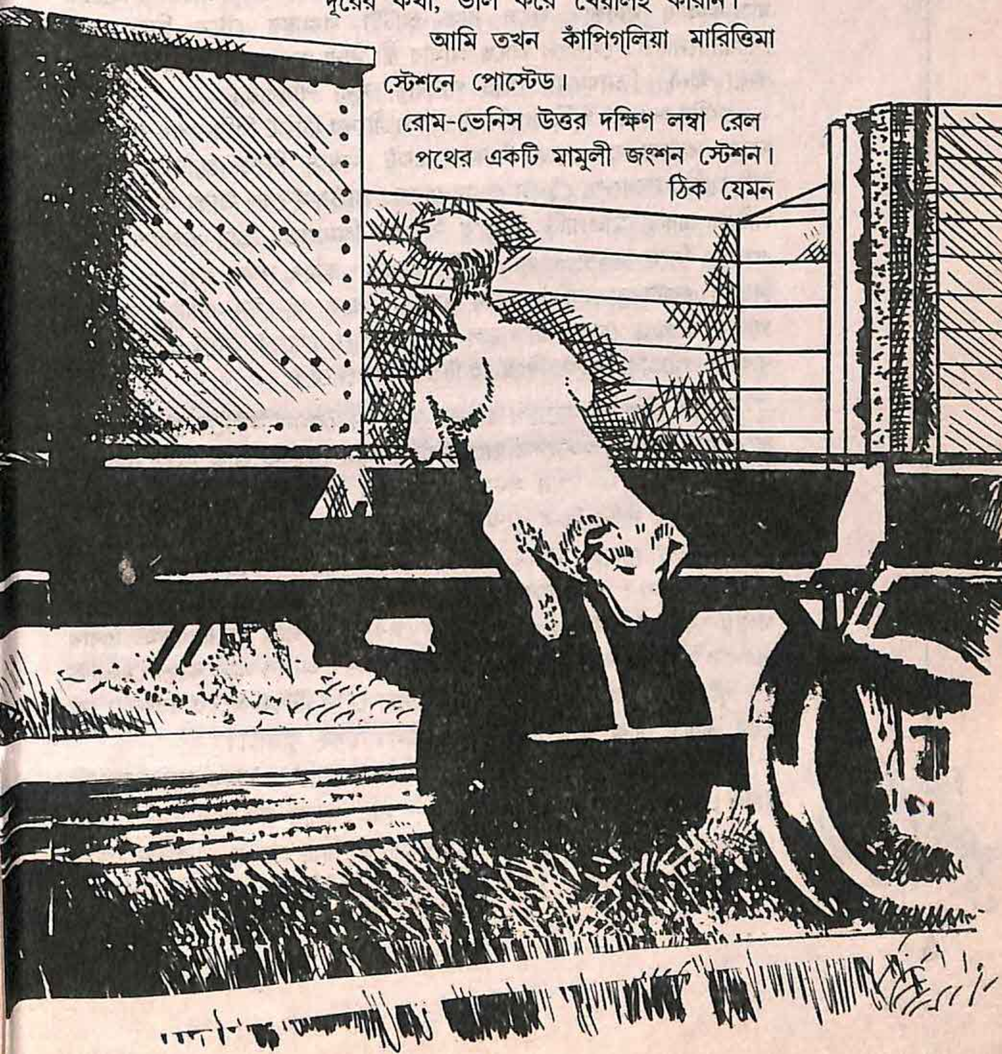
লাম্পো

'লাম্পো' একটি বাস্তব কুকুরের সত্য ঘটনা। ইতালিয়ান ভাষায় মূল কাহিনীটি লিখবার সময় লেখক কতটা রঙ চড়িয়েছিলেন জানি না, বাঙলা ভাষায় পরিবেশনের সময় আমি তথ্যগতভাবে খুব কিছু পরিবর্তন করিনি। আমি অবশ্য ইংরেজী ভাষা থেকে গল্পের কাঠামোটা সংগ্রহ করেছি — রীডার্স ডাইজেস্ট, জানুয়ারী 1981 সংখ্যা থেকে। সেখানে কাহিনীর শিরোনাম ছিল The Dog Who Rode Trains, লেখক, Elvio BarleHani.

তিপ্পান্ন সালের আগস্ট মাসে আমি প্রথম তার প্রেমে পড়ি। কিন্তু প্রথম দর্শনের যে শিহরণের কথা ক্লাসিকাল কাব্যে লেখা থাকে তেমন কিছু আদৌ ঘটেনি। অন্তত আমার তরফে। তাকে দেখে রোমাঞ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, ভাল করে খেয়ালই করিনি।

আমি তখন কাঁপিগ্‌লিয়া মারিত্তিমা স্টেশনে পোস্টেড।

রোম-ভেনিস উত্তর দক্ষিণ লম্বা রেল পথের একটি মামুলী জংশন স্টেশন। ঠিক যেমন



কলকাতা ভাইজাগ রেলপথের মাঝখানে খুর্দা স্টেশন। এত জংশন স্টেশন থাকতে বিশেষ করে খুর্দার কথা মনে পড়ল এ জন্য যে, মেনলাইনের এই কাঁপিগ্‌লিয়া মারিত্তিমা স্টেশনেও বড় বড় হরফে যাত্রী-সাধারণকে নির্দেশ দেওয়া আছে: পিয়োম্বিনো সমুদ্র সৈকতের যাত্রীদের এই স্থানে গাড়ী বদল করিতে হইবেক।

পিয়োম্বিনো পুরীর মতো বিখ্যাত নয়, তবু প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বহু স্নানার্থী এখানে এসে ভিড় করে; বিশেষ করে সপ্তাহান্তে।

আমি ছিলাম ঐ মারিত্তিমা জংশনে রেলের টিকিটবাবু। রেল কোয়ার্টার্স সমুদ্র সৈকতের কাছাকাছি অর্থাৎ পিয়োম্বিনো স্টেশন থেকে কয়েক-মিনিট হাঁটা পথের দূরত্ব। প্রতিদিন ব্রাঞ্চ লাইনের এই পনের কিলোমিটার রাস্তা আমাকে দিনে দু'বার পাড়ি দিতে হয়। নয় ঘণ্টার শিফট ডিউটি। আমি সকাল নয়টায় হাজরির খাতায় সই করে টিকিট বেচতে বসি। মাঝে বেলা একটা থেকে দুটো লাঞ্চ-ব্রেক। রেলওয়ে ক্যান্টিন-এ মধ্যাহ্নে আহারের মাস-কাবারি ব্যবস্থা। ফলে রাত আটটা পঞ্চান্নর ট্রেনে ফিরে যাই পিয়োম্বিনোতে। সেখানে আছে আমার স্ত্রী মীনা আর চার বছরের একমাত্র কন্যা মীর্না। তিনজনের ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।

সেদিন সকালে অফিসগামী ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট বিক্রি শেষ করে বদ্ধ ঘরের আবহাওয়া ছেড়ে ফাঁকায় একটু নিশ্বাস নিতে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি। সকালের ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম বেশ ফাঁকা ফাঁকা। থার্ড লাইনে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছে। তার ওপাশে ফাঁকা ওয়াগন নিয়ে একটা এঞ্জিন শান্টিং করছে। হঠাৎ নজর হল — উল্টো দিকের একটা মালগাড়ির ফাঁকা ওয়াগন থেকে কী যেন একটা ধপ্ করে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। কী পড়ল ওটা? এগিয়ে যেতেই দেখি একটা জ্যান্ত কুকুর। পড়েনি, লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমেছে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে যেন কেমন সিটিয়ে গেল। সুড়ুৎ করে সরে গেল বুক-স্টলের আড়ালে। সেখান থেকেই উঁকি মেরে একবার তাকিয়ে দেখল — যেন সমঝে নিতে চায় আমাকে। আমি লোকটা ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা বুঝে নিতে। আমার সে রকম কোনো দুরভিসন্ধি নেই বুঝতে পেরে আরাম করে সকালের রোদে শুয়ে পড়ে।

কার কুকুর? কোত্থেকে এল? নেহাৎ নেড়িকুত্তা তো নয়। অথচ ওর গলায় বক্‌লেস নেই! যাক গে, মরুক গে! টিকিট ঘরে ফিরে এলুম। এবার একবার ক্যাশ ব্যালান্সটা মিলিয়ে দেখা দরকার। আপন মনে ক্যাশ মেলাচ্ছি — খুট করে একটা শব্দ হল। চোখ তুলে দেখি টিকিট-ঘরের দরজাটা কে যেন একটু ফাঁক করেছে। নজরে এল: সেই কুত্তাটা।



মাঝারি গড়ন। ধব্‌ধবে সাদা লোম সারা গায়ে। মাঝে মাঝে বাদামি ছোপ। আবার নজর করে দেখি — না! গলায় বক্‌লেস নেই। কিন্তু তেল-চুকচুকে মসৃণ চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না ও কারও পোষা কুকুর— রাস্তার কুকুর নয়। চোখ দুটো ঘন নীল। কী জাতের কুকুর?

আন্দাজ করতে পারি না। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না — নাক দিয়ে ঠেলে সে দরজাটা দু'আঙুল ফাঁক করেছে। ভিতরের ব্যাপারটা কী — তা সম্‌ঝে নেবার চেষ্টা করছে।

— এই! তুই ওখানে কী করছিস্?

আচম্‌কা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল আমার।

নিতান্ত কথার কথা। অথবা বলা যায় — একটা প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা। ওর উচিত ছিল বলা — 'আজ্ঞে না, চাই না কিছু' অথবা 'মাপ করবেন, বুঝতে পারিনি' — কিম্বা কিছুই না বলে নিঃশব্দে কেটে পড়া। অন্তত মনুষ্য-ভদ্রতায় তাই বলে। কারও ঘরে উঁকি দিতে গিয়ে ধরা পড়লে একটু সংকোচ, একটু অপ্রস্তুত ভাব প্রত্যাশিত। কিন্তু ও ব্যাটা ওর সারমেয় বুদ্ধিতে উলটো বুঝলো। যেন আমি বলেছি, 'এই যে! বাইরে কেন? আসুন! ভিতরে আসুন।'

ও নাক দিয়ে ঠেলে দরজাটা হাট করে খুলে দিল। ঢুকল না কিন্তু। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই লেজটিকে তুরতুর করে নাড়তে থাকে। আমার দিকে এক জোড়া উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি মেলে। যেন নীরবে বলছে, 'বলছেন? ভিতরে আসতে?'

আমি ওর ভঙ্গিটা দেখে হেসে ফেলি। বলি, ভিতরে আসতে চাস তো আয়। তবে গোল করিস্ না? ঐ টেবিলের তলায় চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি ক্যাশ মেলাচ্ছি।

আমার কলমটা যে টেবিলের তলার দিকে নির্দেশ করছে চকিতে একবার সেদিকে দেখে নিল। তারপর একটিমাত্র সিলেব্ল ও বললেঃ ঘৌ।

ঢুকে পড়ল ঘরে। চুপচাপ সেঁদিয়ে গেল নির্দেশিত টেবিলটার তলায়। সামনের দুই থাবায় চিবুকটা রেখে এক দৃষ্টে আমাকে দেখতে থাকে। যেন সে দৃষ্টি বলতে চায়, ঠিক আছে স্যার, ক্যাশ মেলান। আমি গোল করব না।

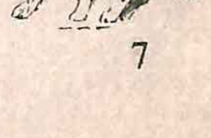
ওর কথা আর মনে ছিল না সারাদিন। কাজকর্ম সেরে ঘর তালাবন্ধ করে রাত ন'টার লোকালে যথারীতি বাড়ি ফিরে গেলুম। রাতে আহারান্তে বিছানায় শুয়ে মীর্না প্রতিদিনের মতোই বায়না ধরল, বাপি একটা গল্প বল!

বাপির কাছে এই গল্পটুকু শুনতে শুনতেই সে রোজ ঘুমিয়ে পড়ে। বলি, ঠিক আছে। আজ কিসের গপ্‌পো শুনবি বল? রাজপুত্তুর, রাক্ষস না পরীর গপ্‌পো?

— না! কুকুরের।

কুকুরের — চমকে উঠি আমি! সকালে আমারই আহ্বানে সেই বেগানা কুত্তাটা শুয়ে পড়েছিল। তারপর? না, বাকি দিন তাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। দুপুরে যখন লাঞ্চ খেতে যাই তখনো কি সে ঘুমাচ্ছিল? কী আশ্চর্য! আমি কি তাকে তালাবন্ধ রেখে ক্যান্টিনে খেতে গিয়েছিলুম! বেশ, তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু রাত্রে যখন ঘর তালাবন্ধ করে চলে আসি? অসম্ভব। সারাটা দিন কুকুরটা নিশ্চয় ওখানে ঘুমাচ্ছিল না। কখন নিঃশব্দে নিশ্চয় বের হয়ে গেছে। আমি খেয়াল করিনি।

মীর্না আমার ভাবান্তরটা নজর করেছে। বললে, কী ভাবছ বল তো?



ওকে আদ্যন্ত খুলে বলি। মীর্না শুনছিল কিনা খেয়াল করি নি। মীনা আমাকে আশ্বাস দিল — কুকুরটা নিশ্চয় কখন নিঃসাড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে!

তাই হবে। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন যথারীতি সকাল ন'টায় অফিস ঘরের তালা খুলতেই আমার টেবিলের তলা থেকে একটি সারমেয় সুপ্রভাত ধ্বনি বের হয়ে এল ঃ ঘৌ!

আমি নিতান্ত অপ্রস্তুত! কিন্তু আমাকে ক্ষমা চাইবার অবকাশ সে দিল না। পাল্লা খোলা পেয়েই সে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের ও-প্রান্তে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে সরে গিয়ে পিছনের বাঁ ঠ্যাংটা উচু করে দিল। তারপর একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে তুরতুর করে কোথায় মিলিয়ে গেল। নজর করে দেখি আমার টেবিলের তলাটা আর্দ্র নয়। অর্থাৎ সারারাত সে সংযত হয়েই ছিল — ঘরটা নোংরা করেনি। তার মানে— ও কারও পোষা কুকুর। স্যানিটারি সেন্স আছে তার। তাহলে গলায় বকলেস নেই কেন? কার কুকুর? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল এখানে?

সেদিন দুপুরে লাঞ্চ আওয়ার্সে ক্যান্টিনের দিকে পা বাড়াতেই দেখি শ্রীমান হাজির। আমাকে দেখে লেজটা তুরতুর করে নাড়াচ্ছে। আমি প্রায়শ্চিত্তের একটা অবকাশ পেলুম। ওকে বলি, তুইও আয় আমার সঙ্গে।

বুঝল। আমার পিছু পিছু সেও চলে এল ক্যান্টিনে। ভিতরে ঢুকল না কিন্তু। বেশ সহবৎ জ্ঞান। আমার মনে পড়ল — হয় তো কাল থেকে বেচারি না খেয়ে আছে। ক্যান্টিন ম্যানেজারকে বলি, আমার সঙ্গে একটা পোষা কুকুর আছে। তাকে কী দেওয়া যায় বল তো?

লোকটা রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, কুকুর! আপনার? কই কখনো দেখিনি তো?

ক্যান্টিন ম্যানেজারের একথা বলার হক আছে। আমি সাত বছর আছি। কোনদিন আমার সঙ্গে কোনও কুকুরকে সে দেখেনি। যা হোক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবার পর লোকটা খানকতক বিস্কিট, শক্ত হয়ে যাওয়া বান-রুটি আর ভাঙা সসপ্যানে কিছু স্যুপ ঢেলে দিল। কুত্তাটার ভদ্রতা জ্ঞান আছে। লেজ নেড়ে 'থ্যাঙ্ক' বলল, তারপর আহারে মন দিল!

খবরটা জানাজানি হয়ে গেল — টিকিটবাবু একটা কুত্তা পুষেছে। আমি বারে বারে প্রতিবাদ করি: আরে, আমি ওকে আদৌ পুষিনি। ও নিজে থেকেই আমার স্কন্ধে চেপেছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সারা দিনে ওর দিব্যি আলাপ হয়ে গেল।

সেদিন বাড়ি থেকে ফিরতেই মীর্না বললে, বাপি! 'ল্যাম্পো'-র খোঁজ পেয়েছ?

—লাম্পো! লাম্পো কে?

— বাঃ! যার গল্প কালকে বলছিলে। যাকে তুমি ভুল করে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে এসেছিলে?

মীর্নাও তাহলে কাল গল্পটা শুনেছে। ওকে আশ্বস্ত করি যে, কুকুরটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, সে ঘরেই ছিল। আজ দুপুরে সে আমার সঙ্গে লাঞ্চ



করেছে। কিন্তু ওর নাম 'লাম্পো' তা কে বললে?

— মাম্মি!

আমি মীনার দিকে তাকাতেই সে হেসে ফেলে। বলে হ্যাঁ, আমরা ওর নামকরণ করেছি — লাম্পো।

নামটা আমারও পছন্দ হল। আমাদের ভাষায় 'লাম্পো' মানে flash! যে বিদুৎগতিতে আসে যায়! যা অকারণে আকাশে ঝিলিক দিয়ে ওঠে: বিদ্যুৎ!

দিন যায়। লাম্পো দিব্যি আমার ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। আমার সহকর্মীদের সকলের সঙ্গেই তার দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। মায় বেশ কয়েকজন ডেলি প্যাসেঞ্জারের সঙ্গেও — যাদের ও প্রত্যহ দেখে। মীনা বা মীর্না ওকে চাক্ষুস দেখেনি; কিন্তু রোজই তার তত্ত্ব-তালাশ নিত। লাম্পো আজ কী করেছে, কী খেয়েছে, দুপুরে কোথায় ছিল। যেন টিকিট বেচেই আমার শান্তি নেই, লাম্পোর তত্ত্ব-তালাশ রাখাও আমার ডিউটি।

দিন কয়েক পরে মীনা আমার টিফিন বাক্সের সঙ্গে আর একটা প্যাকেটও ধরিয়ে দিয়ে বললে, এটাও নিয়ে যাও।

—কী আছে ওতে?

— ডগ বিস্কিট। রোজ রোজ ক্যান্টিনের শক্ত-হয়ে যাওয়া ডিনার রোল খেলে লাম্পোর শরীর খারাপ হবে!

মীর্না রোজই বলে লাম্পোকে একদিন বাড়ি নিয়ে আসতে, কিন্তু আমার সাহস হয় না। কুকুর নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে হলে আলাদা টিকিট কাটাতে হয়। খরচ এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু আমি তো আইনসম্মতভাবে ওর মালিক নই। এভাবে টিকিট কাটা কিছুটা বে-আইনি হয়ে যাবে আমার পক্ষে। প্রতিদিন আমার ডিউটি অফ হলে আমি যখন ঘরের দরজা তালাবন্ধ করে চলে এসে আটটা পঞ্চাশের শেষ লোকালটা ধরি, তখন লাম্পো আসে আমাকে সী-অফ করতে। ব্র্যাঞ্চ লাইনে পিয়োম্বিনো যাবার ঐটেই শেষ ট্রেন। চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে। লাম্পো আমার পিছন পিছন আসে। আমি গাড়িতে উঠে পড়লে ও দরজার সামনে থাপন জুড়ে বসে। তারপর গাড়িটা চলতে শুরু করলেই ও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে প্রাণপণে ইলেকট্রিক ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। তারপর প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে কার উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে থাকে! সহকর্মীরা বলেছে, যতক্ষণ ট্রেনটাকে দেখা যায় ততক্ষণ সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীর পায়ে ফিরে যায়। টিকিট ঘরের সামনে যে কংক্রিটের বেঞ্চটা আছে তার নিচে চুপচাপ শুয়ে রাতটা কাটায়।

এ কাহিনী শুনে মীর্না একেবারে নাছোড়বান্দা। লাম্পোর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পাতাতেই হবে। মীনা বললে, বেশ তো লাম্পোকে বাড়িতে নিয়ে আসায় যদি বাধা থাকে তাহলে চল, আমরা মায়ে-ঝিয়ে একদিন জংশন স্টেশনে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসি। তাকে চোখে না দেখলে মীর্না ছাড়বে না।



তাতে আপত্তির কিছু নেই। তাই স্থির হল। পরের রবিবার আমার অফ ডিউটি। আমরা সবাই মিলে যাব কাপিগ্লিয়া মারিত্তিমায়। বুঝুন আমার অবস্থাটা। সপ্তাহে ছয় দিন যেভাবে যে-পথে যাতায়াতে কাটে ছুটির দিনটাও সেই একঘেয়েমিতে কাটাতে হবে। উপায় কী?

মীর্না একা হলেও না হয় ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু করা যেত — কিন্তু বায়না যে ধরেছেন মীর্নার গর্ভধারিণী স্বয়ং।

কিন্তু তার প্রয়োজন হল না। ছুটির দিনটা বেঘোরে মারা পড়ল না। সেই শনিবারেই এক কাণ্ড হল। রাত আটটা পঞ্চাশের লোকালটা ধরতে যাবার সময় লাম্পোকে দেখতে পেলুম না। বার কতক শিস দিয়ে ডাকলুম, নাম ধরে হাঁকাহাঁকি করলুম — কাকস্য পরিবেদনা। আমার ইচ্ছা ছিল, শনিবার যাবার আগে ওকে একটু তালিম দিয়ে যাব — আগামীকাল রবিবার, মীর্না ওর সঙ্গে আলাপ করতে আসবে। সে যেন সেজেগুজে ওই প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করে। কিন্তু তাকে সে কথা বলা গেল না। ত্রিসীমানায় তাকে দেখতে পেলুম না।

বত্রিশ মিনিটের ট্রেন জার্নি। কিন্তু সারা দিনের ক্লান্তিতে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আমি রোজ একটা বেড়াল-ঘুম দিয়ে নিই। পিয়াম্বিনো যে হেতু ব্রাঞ্চ লাইনের শেষ স্টেশান — তাই ওভার-ক্যারেড হবার আশঙ্কা নেই। সেই শনিবারেও আমি যথারীতি জানলায় মাথা রেখে বসেছি, একটু ঝিমুনি মতো এসেছে — হঠাৎ ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট শুনলুমঃ ঘৌ!

তন্দ্রাটা ছুটে গেল। এমনটা তো হতেই পারে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমনো যায় তাই আমরা দেখতে পাই স্বপ্নের আকারে। আজ যেহেতু লাম্পো আমাকে প্রতিদিনের মতো সী-অফ করতে আসেনি, তাই তার কথা চিন্তা করতে করতেই আমার তন্দ্রা মতো এসেছে। আর সে জন্যই তন্দ্রার ঘোরে···

— ঘৌ।

আঁৎকে উঠি। ব্যাপার কী? এখন তো আমি জেগে আছি। পায়ের দিকে নজর পড়তেই দেখি এক জোড়া নীল চোখের অপলক দৃষ্টি!

সর্বনাশ! ও কখন উঠে পড়েছে ট্রেনে? আমার কামরায় নিশ্চয় ওঠেনি —তাহলে আমার নজরে পড়ত। উঠেছে অন্য কোনও ডাব্বায়। ইন্টার-কম্যুনিকেটিং ট্রেনে এ-কামরায় ও-কামরায় যাতায়াত করা যায়। তাই নিঃশব্দে কখন এসে আমাকে খুঁজে নিয়ে বসেছে। আমি ইতিউতি তাকিয়ে দেখি — কনডাক্টার কাছে-পিঠে আছে কিনা। লাম্পো বিন্-টিকিটের যাত্রী। মায় তার গলায় বক্লস পর্যন্ত নেই। ওর মাথায় এক থাবড়া মেরে বলি, হতচ্ছাড়া! যা সিটের নিচে··· দেখতে পেলে···

বাকিটা বলতে হল না। মনে হল বিন্টিকিটে যাতায়াতের কায়দাটা ওর রপ্ত। সুরুৎ করে সেঁধিয়ে গেল সিটের নিচে। একেবারে স্পিকটি-নট্। ট্রেন এসে পিয়োম্বিনো স্টেশানে ঢুকতেই কামরার অটোমেটিক দরজাটা খুলে গেল। আমি নিচু হয়ে ডাকতে গেলুমঃ এবার বেরিয়ে আয়···



কোথায় কে? সিটের নিচে কেউ নেই। তাজ্জব! গেল কোথায়?

তখনি নজরে পড়ল — প্ল্যাটফর্মে উবু হয়ে বসে আছে লাম্পো। ঘৌ পর্যন্ত করছে না। পাছে কারও নজরে পড়ে যায়। একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে আমাকে।

দারুণ নামকরণটা করেছিল কিন্তু মীনা: এই আছে এই নেই। রাজার ভাণ্ডারে নেই···

স্টেশান থেকে — আগেই বলেছি — আমার রেল কোয়ার্টার্স পাঁচ-মিনিটের হাঁটা পথ। লাম্পো আমার পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে। অন্যান্য দিন রাত্রে কলিংবেল বাজালেই মীর্না এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বাপির কোলে। আজ তার ব্যতিক্রম হল। আমাকে যেন সে দেখতেই পেল না। মায় আমাকে পরিচয় পর্যন্ত করতে দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে তুলে নিল লাম্পোকে। ভিতর বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁকাড় পাড়েঃ মাম্মি। শিগ্গির এস! দেখ কে এসেছে।

একটা লোক যে সারাদিন তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরল তা মীর্নার গর্ভধারিণীরও নজর হল না। মীর্নার কোল থেকে ওকে কেড়ে নিয়ে বললে, অ্যাদ্দিন আসিসনি কেন রে? দুষ্টু।

আমি নীরবে জুতোর ফিতে খুলতে থাকি। যেন এ বাড়িতে এসেছে অবাঞ্ছিত একটা ফালতু লোক।

আর আজব-জন্তু ঐ লাম্পো। একবার গন্ধ শুঁকে দেখল না পর্যন্ত। মীনা আর মীর্না না হয় জানতো লাম্পোর কথা, কিন্তু লাম্পো তো আমার কাছে আমার বউ-বেটির গল্প শোনেনি। কিন্তু কে বলবে যে, ও অপরিচিত লোকের কোলে উঠেছে! দিব্যি ল্যাজ নেড়ে নেড়ে আদর কুড়োচ্ছে।

আর সহ্য হল না আমার। বলি, ওকে নিয়ে খুনসুটি করলেই চলবে?

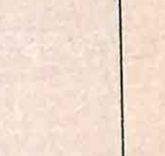
রাত্রে নৈশাহারের সময় ঐ মহামান্য অতিথিটি আমাদের সঙ্গে আহারে বসলেন। বরাত ভাল, মীনা ওকে চেয়ার অফার করেনি। তা করলেই বা ঠেকাতো কে? আমাকে তো কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। আমরা দু'জনে বসলুম মুখোমুখি। মীর্না তার নির্দেশিত হাই-চেয়ারে আর লাম্পো মাটিতে। আহারান্তে সদর দরজা খোলা পেয়েই সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেলই! আর তার পাত্তা নেই। মীনা বললে, ও প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে গেছে, এখনই ফিরবে। ইতিমধ্যেই সে সিঁড়ির নিচে কম্বল বিছিয়ে লাম্পোর বিছানা পেতে দিয়েছে। ঘুম পাচ্ছে, তবু উপায় নেই। অতিথি কখন ফিরবেন তা তো জানা নেই। অগত্যা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকতে হল। শেষমেশ দুত্তেরি নিকুচি করেছে বলে আমি দরজা বন্ধ করে দিলুম।

মীনা আমার বেপরোয়া ভঙ্গি দেখে আর প্রতিবাদ করল না। শুধু লাম্পোর বিছানাটা সদর দরজার বাইরে পেতে দিয়ে শুতে এল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই আমি মীনাকে কী একটা মিষ্টি কথা বলতে গেলুম। সে আমার কথায় কর্ণপাত না করে সদর দরজা খুলে বাইরে দেখে এসে বললে, না লাম্পো নেই। রাতে ও সেই বিছানায় শোয়নি পর্যন্ত।

আচ্ছা, এ কি আত্যান্তরে পড়লুম বলুন তো! হপ্তায় একদিন ছুটি, সেই



দিনটাতেও সকাল থেকে শুধু কুকুর আর কুকুর!

প্রাতরাশ শেষ হতেই মীনা বললে, পিয়োম্বিনো লাম্পোর কাছে অজানা জায়গা। শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল না তো? চল, একটু খুঁজে দেখি।

আমি বলি, তোমার শখ হয়ে থাকে তো তুমি যাও। আমি এখন রেকর্ড-প্লেয়ার বাজাব। গান শুনব। আজ আমার ছুটি।

মীনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বাজাও! নীরোর দেশের মানুষ তুমি। সঙ্গীতের উপর দারুণ দরদ! রোম পুড়ছে তাতে কী? বাজনা বাজাও।

আগে বলবার অবকাশ পাইনি — মীনা ইতালিয়ান নয়। তার বাড়ি গ্রীস।

রবিবারের সকালটা গেল বেহুদ্দো ছোটাছুটিতে। উপায় কী বলুন? আপনারাই কি পারতেন ঘরে বসে গান শুনতে, যখন আপনার ধর্মপত্নী চার বছরের মেয়েকে ট্যাঁকে করে সারা তল্লাটটা কুকুর খুঁজে বেড়াচ্ছে?

পিয়োম্বিনো ছোট্ট শহর। শ' দু-তিন বাড়ি সবই সমুদ্রের ধারে কাছে। সারা শহরটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজলুম। লাম্পো বেমালুম বেপাত্তা। পাড়ার কেউ তাকে দেখেওনি। দুপুর এবং বিকালটা আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠল। মীর্না নাকে কান্না জুড়ে দিল।

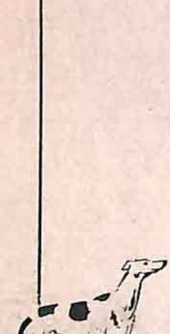
পরদিন সোমবার সকাল নয়টায় কাঁপিগ্‌লিয়ার কর্মস্থলে ফিরে যেতেই: ঘৌ। সেই কংক্রিটের বেঞ্চির নিচে শুয়ে আছেন হারানো মানিক।

তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিলুম। মীনা জানতে চায় — ও কখন, কেমন করে ফিরে গেল বল তো?

আমি দাঁতে দাঁত দিয়ে জবাব দিইঃ জানি না। আমাকে সেকথা বলেনি।

রাতের আটটা পঞ্চান্নর লোকালটা সাড়ে নটা নাগাদ পিয়োম্বিনোতে আসে, কিন্তু রাতে এখানে থাকে না। দশটা চল্লিশে সেটা জংশনে ফিরে যায়। জংশন স্টেশনে হাজিরা দিয়ে লোকো শেডে রাতের মত আশ্রয় নেয়। নির্ঘাৎ সেই ফাঁকা ট্রেন ধরেই লাম্পো জংশন স্টেশনে ফিরে এসেছিল কাল রাত্রে। সবই তো বুঝলুম — কিন্তু খালি রেকটা যে রাত দশটা চল্লিশে পিয়োম্বিনো থেকে কাঁপিগ্‌লিয়া ফিরে যাবে এই গূঢ় সংবাদটা ও জানল কেমন করে?

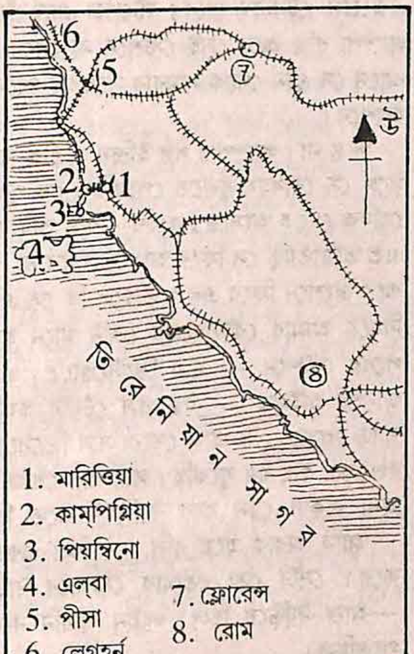
ক্রমে এটাই হয়ে উঠল ওর নিত্যকর্মপদ্ধতির কর্মসূচী। রাত আটটা পঞ্চান্নের লোকালে যে কন্ডাকটার গার্ড থাকে তার সঙ্গে ইতিমধ্যে লাম্পোর দোস্তি হয়ে গেছে। ফলে তাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে হয় না। রাতে টিকিট ঘরে তালা দেবার উপক্রম করলেই ও তুরতুর করে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলতে থাকে। আমার সঙ্গে ট্রেনে চেপে চলে আসে পিয়োম্বিনোতে। মীর্নার আদর খেতে। ডিনার শেষ করে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। দশটা চল্লিশের লোকাল ধরে ফিরে যায় জংশন স্টেশনে। ইতিমধ্যে সে কী জানি কী করে বুঝে ফেলেছে যে, ঐ লোকালটাই পরদিন সকালে ফার্স্ট লোকাল হিসাবে সাতটা কুড়িতে আবার পিয়োম্বিনোর দিকে চলতে থাকে। প্রতিদিন সে রাতটা জংশনে কাটিয়ে ঐ ফার্স্ট লোকাল ধরে চলে আসে আমার বাড়িতে। সকাল ঠিক আটটায় সদরে এসে কলিং বেল বাজায়ঃ ঘৌ!



ততক্ষণে মীর্না তার স্কুল ড্রেস পরে রেডি। সাড়া দেয়ঃ যাচ্ছি।

দোর খুলে মীর্না স্কুল ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে আসে। লাম্পোকে দেয় তার প্রাতরাশ, খান দুই ডগ বিস্কিট। লাম্পো এবার মীর্নাকে তার নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দেয়। মীনাকে আর সঙ্গে যেতে হয় না। আমি আটটা বাইশের লোকালটা ধরতে এসে দেখি স্টেশনে লাম্পো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখা মাত্র একটিমাত্র মনোসিলেব্লে সে জানিয়ে দেয়ঃ দিদিমণিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছি — ঘৌ!

জংশনে পৌঁছে আমি যতক্ষণ দরজা খুলে টিকিট বেচতে বসি ততক্ষণে লাম্পো গোটা স্টেশনে এক চক্কর সরেজমিন ইন্সপেক্শন করে আসেঃ দু নম্বর প্ল্যাটফর্মের লোকালটা ঠিক মতো এল-গেল কিনা: ডিস্ট্যান্ট সিগনালার ডিউটিতে আছে কি না, এক্জিট ডোরের সামনে টিকিট কালেক্টরবাবুরা হাজিরা দিয়েছে কিনা। দশটা সাতের লোকালটা ছেড়ে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসে টিকিট ঘরে।আরাম করে একটি দিবানিদ্রা দেয় দুপুর বারোটা পঞ্চান্নতক। আশ্চর্য তার সময় জ্ঞান!আমার মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, লাম্পোর হয় না। ঠিক একটায় অ্যালার্ম ঘড়ির মতো সে হাঁকাড় পাড়েঃ ঘৌ!



— কী স্যার? লাঞ্চে যাবেন না?

আহারান্তে আবার একটি নিটোল 'সিয়েস্তা।'

কোন কোন দিন অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয়। মধ্যাহ্ন আহারের পরে সে কোথায় যেন চরতে যায়। ফিরে আসে রাত ন'টার আগেই। কোথায় থাকে এতটা সময়? আমার সহকর্মী বন্ধুরা সে প্রশ্নের জবাব দিল। লাম্পো ঐ ছয়-সাত ঘন্টা সময় অন্যান্য স্টেশনে বেড়াতে যায়। আগেই বোধহয় বলেছি, পিয়োম্বিনো-কাঁপিগ্‌লিয়া একটি ব্রাঞ্চ লাইন। আসলে জংশন থেকে চার দিকে চারটি লাইন গেছে। দক্ষিণে রোম, উত্তরে তুরিন, পিসা, পূবে মিলান আর পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের ঐ সী-'রিসর্ট' পিয়োম্বিনো। যার বিপরীতে তিরেনিয়ান সাগরের সেই বিখ্যাত এল্‌বা দ্বীপ, যেখানে বন্দী-দশায় এককালে নির্বাসিত হয়েছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। সুতরাং লাম্পোর পক্ষে বেড়াবার জায়গা চারদিকেই। তা হোক, কিন্তু আমার আশঙ্কা হত — ও ঠিক মত চিনে ফিরে আসতে পারবে তো! কাঁপিগ্‌লিয়ায় আটটা প্ল্যাটফর্ম।



পিয়োম্বোনোর ট্রেন সব সময়েই ছাড়ে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। সেটা লাম্পো ভালভাবেই চেনে — কিন্তু বাকি ট্রেন কখন কোথায় যাচ্ছে ও তা কেমন করে বোঝে?

একদিন তাই ঘটল। সকাল আটটায় মীর্না‌কে স্কুলে পৌঁছবার জন্য লাম্পো হাজিরা দিতে এল না। কী ব্যাপার? মীর্না তো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সেদিন ডিউটিতে এসে শুনি ... জংশন থেকে সকাল সাতটা কুড়ির পিয়োম্বিনো লোকালটা চারের বদলে দশ মিনিট লেটে ছেড়েছে ছ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। হেতু রোম-মিলান এক্সপ্রেসটা আজ দেরীতে এসেছে — তাকে বাধ্য হয়ে চার নম্বরে ঠাঁই দিতে হয়েছিল।

সর্বনাশ! তার মানে লাম্পো সেই ট্রেন ধরে মিলানের দিকে চলে গেছে। এক্সপ্রেস ট্রেনটার পরের স্টপেজ প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে। যদি লাম্পো বুদ্ধি করে সেই স্টেশনে না নেমে পড়ে তাহলে বেলা এগারোটার আগে সে ট্রেন থেকে নামবার সুযোগই পাবে না। দেড়শ কিলোমিটার দূরের জংশনে।

কিন্তু না। লাম্পোর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ। মেল ট্রেনটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল সে পূব-মুখো যাচ্ছে — সূর্যের আলো যেদিক থেকে আসছে। কারণ... কিন্তু তাই বা হবে কী করে? তা হলেও তো এত তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসতে পারে না। সাড়ে নয়টার ভিতরে সে কেমন করে জংশনে ফিরে এল? তাহলে কি সে এক্সপ্রেস ট্রেনে আদৌ চড়েনি? এ বিষয়ে আমার কৌতূহলের কোন মানে হয় না। তবু ফোন করলুম ঠিক পরের স্টেশনে — সান ভিসেঁঞ্জোতে। ওখানে ট্রেনটা থামার কথা নয়। জানতে চাইলুম — এক্সপ্রেস ট্রেনটা কয়টার সময় সেই ছোট্ট স্টেশনটা পাড়ি দিয়েছে। ও-প্রান্ত থেকে সান ভিসেঁঞ্জোর অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশান মাস্টার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। লাম্পোর খোঁজ করছ তো? সে এখানেই নেমে অন্য একটা ট্রেন ধরে কাঁপিগলিয়াতে ফিরে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কি! এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে ও নামল কী করে? সেটা তো তোমার স্টেশানে দাঁড়ায় না।

—আজ দাঁড়িয়ে ছিল! লাইন পায়নি বলে। ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নালে আটক পড়েছিল।

— কিন্তু তাহলেও তো অটোমেটিক দরজা খুলবে না?

— তা জানি না বাপু! স্বচক্ষে যেটুকু দেখেছি — সেটুকুই শুধু বলতে পারি। এক্সপ্রেস ট্রেনটা ডিস্টান্ট সিগ্‌ন্যালে আট্‌কে গেল। তোমার লাম্পো বাবাজীবন তুরুক করে নামল। ছুটতে ছুটতে আমাদের প্ল্যাটফর্মে এল। তারপর তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে মিলান-কাঁপিগলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই উঠে পড়ল!

দারুণ খলিফা তো!



আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু হক কথা বলছি — লাম্পো এ জাতের ভুল আর কোনদিন করেনি। এর পরেও যান্ত্রিক প্রয়োজনে কাঁপিগলিয়া পিয়োম্বিনো লোকাল অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে

ছেড়েছে — দুই-ছয়-আট — তখন হয়তো অন্য কোন ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে চার নম্বরে — কিন্তু লাম্পো ফাঁদে পা দেয়নি! মাইক্রোফোনের ঘোষণা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত না — কিন্তু কি-জানি কী করে সে ঠিক বুঝে নিত!

কিছুদিন পরের কথা। হঠাৎ লাম্পো আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে মধ্যাহ্ন আহারে গেল না। আমি যত ডাকাডাকি করি উনি শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়েন। গতর নড়ান না। শেষ-মেশ আমি রেগে বলি, তবে আজ তুই শুয়ে থাক। আমি খেয়ে আসি।

সত্যিই সে খেতে গেল না দুপুরে। আহার বিষয়ে লাম্পোর এ জাতীয় অনীহা অপ্রত্যাশিত। যাকগে, মরুগ গে।

তার পর দিনও একই ব্যাপার। লাঞ্চে সে আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে যেতে স্বীকৃত হল না! রাত্রে ফিরে মীনাকে বললাম সে-কথা: আজ দুদিন ধরে লাম্পো আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে লাঞ্চ করতে যাচ্ছে না।

মীনা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাখিল করে, ওরা পেট বুঝে খায়! গরহজম হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বা কী করে হবে? রাত্রে তো ঠিক খাচ্ছে!

আমাদের পারিবারিক চিন্তা-ভাবনা যেন ক্রমশঃ সারমেয়-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। সব সময়েই আমাদের আলোচনা পাকে-চক্রে হয়ে পড়ছে লাম্পো ঘটিত! তৃতীয় দিনেও সেই একই অবস্থা। লাম্পো লাঞ্চ-আওয়ার্সে ক্যান্টিনে খেতে গেল না।

সেদিন আমার লক্ষ্য হল — ঠিক দুটো পঞ্চাশে লাম্পো উঠে পড়ল। কান খাড়া করে কী যেন সমঝে নিল। আড়ামুড়ি ভাঙল। তারপর তুরতুর করে বেরিয়ে গেল টিকিট ঘর ছেড়ে। আমার মনে পড়ল — গত দুদিনও ঠিক ঐ সময় সে বাইরে গেছিল। দুরন্ত কৌতূহল হল। আমার সহকর্মীকে বলি, তুমি একটু কাউন্টারে নজর রাখ তো ভাই — আমি দেখে আসি লাম্পো কোথায় গেল।

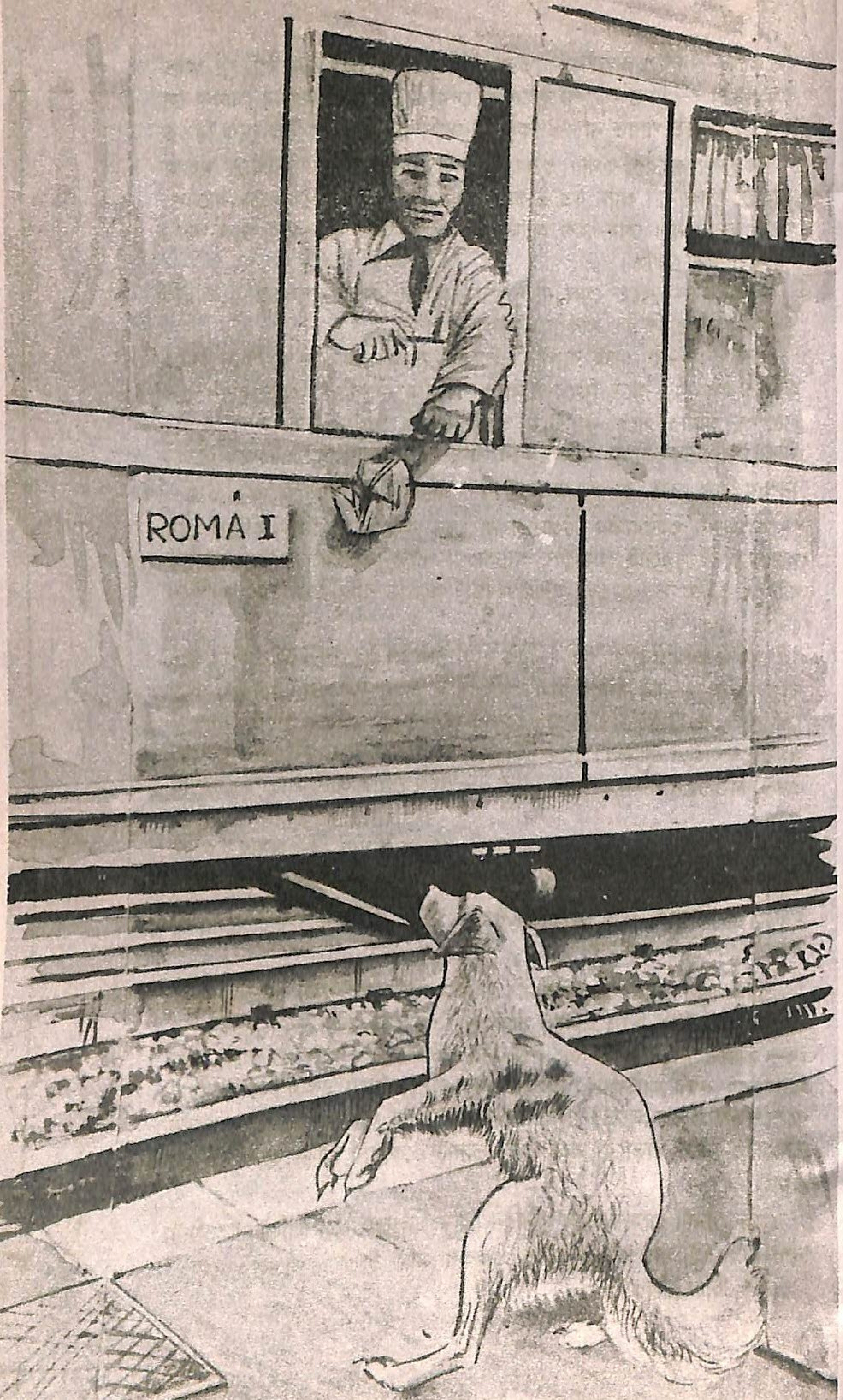
বন্ধু ধমক দেয়, এ কী লাম্পো-লাম্পো বাতিক হয়েছে হে তোমার? ও কি তোমার বউ, যে কখন কোথায় ফ্লার্টিং করতে যাচ্ছে তা নজর রাখতে হবে? হয়তো এ পাড়ার কোন কুত্তির সঙ্গে ওর একটু আশনাই হয়েছে। তোমার খবরদারির কী দরকার?

আমি বন্ধুর কথায় কান দিই না। বেরিয়ে আসি প্ল্যাটফর্মে। দেখতে পাই শ্রীমান ওভারব্রীজ দিয়ে ওদিকে চলেছেন! গোপনে ওকে ফলো করছি — বেশ তফাত রেখে আমি ওর পিছু নিই। ওভারব্রীজ দিয়ে সে চলে গেল সটান এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তুরতুর করে এগিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ স্থানে বসে পড়ল থাপন জুড়ে। যেন 'মেল-ম্যান'! যে সঠিক খবর রাখে এখনি ডাকগাড়ি এসে দাঁড়াবে, আর মেল-ভ্যানটা কোথায় খাড়া হবে তা ওর জানা।

মেল ট্রেনটা এসে দাঁড়াল। ট্যুরিন-রোম ডিল্যুক্স মেল গাড়িটা। গাড়িটা নিশ্চল হতেই লাম্পো ঊর্ধ্বমুখে একবার মাত্র হাঁকাড় পাড়লঃ ঘৌ!

যেন চিচিং ফাঁক!




ROMA I

আশ্চর্য ! ওর বিপরীতে ডাইনিং কারটা। তার একটা জানলা খুলে গেল। আর সাদা অ্যাপ্রন-পরা, সাদা টুপি মাথায় একটি মুখ দেখা গেল সেই খোলা জানলার সামনে। লোকটা বললে 'কৈ রে তুই?'

লাম্পো দ্বিতীয়বার সাড়া দিলঃ ঘৌ!

তৎক্ষণাৎ টিসু পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট এসে পড়ল প্ল্যাটফর্মে! কৃতজ্ঞতাসূচক লাঙ্গুল-নর্তনান্তে লাম্পো সেটা উঠিয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের একান্তে চলে গেল!

কখন কী করে মেল-গাড়ির ঐ হেডকুকের সঙ্গে লাম্পো দোস্তি পাতিয়েছে? খোদায় মালুম। কিন্তু ব্যবস্থা মনে হল পাকা এবং প্রত্যহের। লাম্পো বুঝে নিয়েছে রেলওয়ে ক্যান্টিনের শক্ত হয়ে যাওয়া ডিনার-রোলের চেয়ে অর্ধভুক্ত মুরগীর ঠ্যাঙ অনেক বেশি মুখরোচক।

কী বিচ্ছু কুকুর!

অচিরেই টের পেলুম লাম্পো বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। আশপাশের প্রত্যেকটি স্টেশানে তার অগুন্তি বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। শ'খানেক কিলোমিটারের মধ্যে এমন কোন রেলকর্মী রইল না যে এই কম্যুটার কুকুরের অপরিচিত। এমন কি এ লাইনের নিত্যযাত্রীদেরও এটা একটা মুখরোচক আলোচনা: আজ লাম্পোকে দেখতে পেলাম না তো?

বস্তুত লাম্পোর দৌলতে আমিও বেশ কিছুটা বিখ্যাত হয়ে পড়ি। লাম্পোর মালিক হিসাবে। অনেকে 'লাম্পো' নামটা জানে না, কুকুরটাকে চেনে। তাদের কাছে লাম্পোর পরিচয় পিয়োম্বিনোর সেই টিকিটবাবুর কুকুর। এমন কি উল্টোটাও বলা যেতে পারে। কোথাও আমাকে পরিচয় করাতে বন্ধুরা বলে, একে চিনতে পারছ না? লাম্পোর মালিক! সদ্যপরিচিত একগাল হেসে বলে, ও! তাই বলুন! আপনি লাম্পোর বাবু?

এটুকুই বাকি ছিল? পিতৃপরিচয় বা বংশ পরিচয় নয়, এমনকি জংশন স্টেশনের টিকিটবাবুও নয়, রেল-লাইনে আমার পরিচয় ঐ কুকুরের দৌলতে!

একদিন আর এক কাণ্ড হল। সেটাও ছুটির দিন। আমরা সকাল ছটার সময় গাড়ি নিয়ে সারাদিনের জন্য আউটিংয়ে বের হয়েছি। মীর্নার আপত্তি ছিল, বেচারি লাম্পো তো জানে না যে, মীর্না দিদিমণির স্কুলে সেদিন ছুটি। সে ঠিক আটটায় এসে কলিংবেল বাজাবেঃ ঘৌ! কেউ দরজা খুলবে না! লাম্পোর নাকি ভারি কষ্ট হবে তাতে! বলাবাহুল্য এসব ছেঁদো কথায় আমি কান দিইনি। সকাল-সকাল লাঞ্চ-প্যাকেট খাবার-দাবার নিয়ে আমরা গাড়ি করে চলে এসেছি পিয়েজা বোভিওতে। পিয়োম্বিনোর কাছাকাছি মাইল-সাতেক দূরত্বে এই সী-বীচটা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে এলবা দ্বীপটা দেখা যায়।

সেখানে পৌঁছে আমরা তিনজনে সমুদ্র-স্নান করলুম। মীনা আর মীর্না তখনও ঢেউ খাচ্ছে। আমি বালির উপর চিৎপাত হয়ে পড়েছি। তোয়ালে পেতে। আমার হাতে একটা সদ্য বন্ধনমুক্ত বিয়ারক্যান। হঠাৎ পায়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগল। চট্ করে উঠে বসি।

দেখি শ্রীমান্!

জল থেকেই মীর্না চিক্কুর পাড়েঃ লা-ম্ পো!

আর হতভাগাও দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে!

আমি আজও ভেবে পাই না — লাম্পো কী কায়দায় সাত মাইল দূরত্বে আমরা ঠিক কোথায় স্নান করছি তা বুঝতে পারল? ওদের ঘ্রাণশক্তি নাকি খুব প্রখর — কিন্তু আমরা তো এসেছি মোটর-গাড়িতে! গন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে নয় নিশ্চয়। আর যদি বলেন — শার্লক হোমি কায়দায় ও আমাদের গাড়ির টায়ারের দাগ লক্ষ্য করতে করতে এসেছে তাহলে তা আমি মানতে পারব না বাপু! কিন্তু এটা তো মানতেই হবে যে, সে আমাদের খুঁজে পেয়েছিল। সকাল আটটায় বাড়িতে কারও সাড়া না পেয়ে সে বুঝতে পেরেছিল — আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি। বাকিটুকু রহস্য।

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় জাতের রহস্য সেদিন অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

স্নানান্তে আমরা যখন আহারাদি করতে ব্যস্ত, তখন আবার সে না-পাত্তা হয়ে গেল। আহারকালে তাকে কখনো এমন অন্যমনস্ক হতে দেখিনি। এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকি। হঠাৎ মীর্নাই ওকে দেখতে পেলঃ ঐ তো।

সমুদ্রবেলায় আছে একটা ছোট্ট টিলা। 'ভিউ-পয়েন্ট'। লাম্পো তার একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। দূর সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে সে কী যেন খুঁজছে। অনেকক্ষণ সেটা খুঁজে না পেয়ে সে করুণ স্বরে ডেকে উঠল — এল্‌বা দ্বীপের দিকে মুখ ফিরিয়ে। যেন সম্রাট নেপোলিয়ান আজও এল্‌বাতে বন্দী; আর লাম্পো তাঁরই পোষা কুকুর।

সারাটা দিন সে নিশ্চুপ বসে রইল টিলার উপর। খেতে এল না। সন্ধ্যায় ফিরবার সময় আমি ওকে শিস্ দিয়ে ডাকলুম, নাম ধরে ডাকলুম। কিন্তু আশ্চর্য! আমার আহ্বানে সে সাড়া দিল না। হঠাৎ দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রকে দেখে তার কী এক বিস্মৃতপ্রায় অতীতের স্মৃতি জেগে উঠেছে। সে ক্রমাগত করুণস্বরে কাকে যেন ডাকতে থাকে!

কখনো — ঘৌ! ঘৌ! কখনো সকাতর — কুঁই! কুঁই।

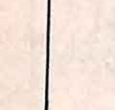
অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে আমাকে সেই টিলার উপর উঠতে হল। লাম্পো বালির উপর মুখ রগড়ে রগড়ে এক নাগাড়ে কুঁই কুঁই করছে — মনে হচ্ছে ওর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে নেমে এলুম। মীনা বা মীর্নার আদরেও তাকে শান্ত করা গেল না। হঠাৎ কী হল ওর?

আমি বলি, চল! ফেরার পথ ডঃ গুইলিয়ানোকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই।

ডক্টর গুইলিয়ানো পশু-চিকিৎসক। আমাদের পরিচিত। মীনা বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে শারীরিক যন্ত্রণায় লাম্পো এমন কুঁই কুঁই করছে না!

আমি ধমক দিই, শারীরিক ছাড়া কি মানসিক? ওর কি প্রথম প্রেমের কথা মনে পড়ে গেছে? বিরহ-যন্ত্রণায় কাঁদছে?

মীনা রাগ করল না। বললে, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার ধারণাটা তাই! দেখলে না — টিলার মাথাটায় চড়ে একসঙ্গে অনেকটা সমুদ্র দেখতে পেয়ে ওর কেমন যেন একটা ভাবান্তর হয়েছিল। ও কী যেন



খুঁজছিল! দিগন্তবিলীন নীল জল, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাদা ফেনার হাতছানি আর সী-গালের করুণ আর্তকণ্ঠে ও কেমন যেন উদাস হয়ে গেছল!

আমি আবার বলি, তোমার পাগলামিটা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, মীনা! কুকুর কি বিরহ-বেদনায় এতই কাতর হতে পারে যে, খাবার ইচ্ছাটা তার চলে যাবে?

— তা যে গেছে তা তো নিজের চোখেই দেখলে। ও কিচ্ছু মুখে দিলে না সারা দিনে!

— তার কারণ ওর পেট কামড়াচ্ছে!

ফেরার পথে ডক্টর গুইলিনো ওকে পরীক্ষা করে দেখলেন। না, কোন শারীরিক কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না তার এই বিসদৃশ আচরণের। এই মনমরা ভাবের, এই আহারে অনীহার।

বাড়িতে ফিরে গাড়ি থেকে নেমেই সে ছুটে স্টেশনে চলে গেল। যেন মনে মনে বলতে বলতে গেল, জোরে ছুটলে দশটা পঞ্চাশের লোকালটা এখনও ধরতে পারব!

পরদিন সকালে জংশন স্টেশনেও তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হল না।

আমাকে দেখে যথারীতি উঠে দাঁড়াল। প্রত্যাশিত 'ঘোঁ'-টা করল না। কাল দিনে-রাতে লাম্পো কিছু খায়নি। তাই মীনা আমার হাতে ওর প্রাতরাশ কিছু বেশি করেই দিয়ে দিয়েছিল। সেটা ওর সামনে বাড়িয়ে ধরি। ও খুব যে উৎফুল্ল হল তা মনে হল না। কারণ খুশি হলে সে একবার ঐ এক-ধ্বনি বিশিষ্ট ক-বর্গের চতুর্থ শব্দটা ঔ সহযোগে উচ্চারণ করে, নিদেন ল্যাজ নাড়ে। লাম্পো সেসব কিছুই করল না। নিঃশব্দে আহার সমাধা করে বেরিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মে।

প্রতিদিনের মত পাড়ায় পাড়ায় রোঁদ দিল না। আজ চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে গিয়ে মনমরা হয়ে শুয়ে পড়ল।

মীনাকে দোষ দিলে কী হবে, আমারও চিন্তা-ভাবনা ইদানিং লাম্পো-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ঠিকই বলেছিল মীনা। গতকাল ঐ টিলার মাথায় চড়ে লাম্পোর একটা ভাবান্তর হয়েছে। উঁচুতে উঠে একসঙ্গে অনেকটা সমুদ্র দেখতে পাওয়ায় ওর স্মৃতিতে কোনও অতীত অভিজ্ঞতার অনুরণন জেগেছে — দিগন্ত-অনুসারী নীল জল, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সফেন হাতছানি আর সী-গালের আর্ত-শীৎকার ওর স্নায়ুতন্ত্রে কী জানি কী একটা বেদনার মীড়-গমক তুলেছে — যেটা আমার অজানা — আর তাতেই ও কাল থেকে মনমরা হয়ে আছে। দুপুরে আজও আমার সঙ্গে লাঞ্চে গেল না। কিন্তু দুটো পঞ্চাশে যথারীতি উঠে বসল। কান খাড়া করে কী যেন শুনল। মেলট্রেনের আগমন-ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি না — আমি সেটা জেনেছি অ্যানাউন্সমেন্টে। কিন্তু লাম্পোর শ্রবণশক্তি আমার চেয়ে অনেক-অনেক প্রখর। পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকেই মেল ট্রেন তার আগমনী ঘোষণা করেছে নিগূঢ় ভূ-স্তনন ইঙ্গিতে। লাম্পো ওভারব্রীজ পার হয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো আমিও গেলুম ওর পিছু পিছু।



দুর্ভাগ্য লাম্পোর। আজ বোধ হয় সেই হেড-কুকের অফ-ডে। জানলা থেকে খাবারের প্যাকেট বার হয়ে এল না। তাতে ও যে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হল তা মনে হল না আমার। দুর্ভাগ্যটাকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করল। হঠাৎ দেখতে পেল আমাকে। ছুটে এল আমার কাছে। পায়ের কাছে মুখটা গুঁজে বার দুই কুঁই-কুঁই করল। আমি ওর মুখখানা ধরে বললুম, তোর কী হয়েছে রে লাম্পো! অমন করছিস্ কেন?

সে জবাব দিল না। আমার হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক তখনি মেল ট্রেনটা ছাড়ছে। লাম্পো হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটা কামরায়!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। এবার সে স্বেচ্ছায় টুরিন-রোম মেল ট্রেনে চেপেছে। যে গাড়ি বহু দূরে গিয়ে থামবে। ও কিছু একটা খুঁজছে! এটুকু বুঝেছে — তা কাছে-পিঠে নেই। গতকাল সমুদ্রের বিশালতাটা দেখেই কি সে ভূমার জন্য পাগল হয়ে উঠল?

এবার পুরো তিন দিন বাদে সে ফিরে এল। কোথায় গেছিল কেউ জানে না।

তারপর থেকেই শুরু হল তার দূরপাল্লার যাত্রা। কখনো 'রোম-তুরিন' কখনো 'জেনোয়া-রোম'। মেল আর এক্সপ্রেসে সে লম্বা পাড়ি জমাতো। এতদিনে সে এত বিখ্যাত হয়ে গেছে যে, টেলিফোনে সহকর্মীরা আমাকে প্রায়ই জানাতো, লাম্পোকে তারা কে কোথায় কবে দেখতে পেয়েছে।রোম, জেনোয়া, তুরিন সে হামে-হাল পাড়ি দিত। তিন-চারশ কিলোমিটার দূরত্ব গা-সওয়া হয়ে গেল। তারপর একজন বললে, লাম্পোকে ফ্লোরেন্সে দেখেছে। এটা আরও অবাক-করা খবর। কারণ ফ্লোরেন্সে যেতে হলে গাড়ি বদল করতে হয়। ও কি অ্যাদ্দিনে ব্রাঞ্চ-লাইনের ট্রেনগুলোকেও চিনে ফেলেছে?

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড হল। সব মানুষ তো সমান নয়। কেউ কেউ লাম্পোর এই বেয়াড়াপনা বরদাস্ত করতে চাইল না।

টিকিট-বিহীন, বকলস্-বিহীন এমন কুত্তাকে কেন যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে দেওয়া হবে? ও যদি কাউকে হঠাৎ কামড়ে দেয়, কে দায়ী হবে? তুমি?

ফলে রেলকর্মীদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লাম্পোপ্রেমিক, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের পক্ষে রেলওয়ে কানুন! লাম্পো এত বুদ্ধিমান যে, এই দলাদলিটা সে সমঝে নিয়েছে। মায় কোন কোন কর্মী তার বিপক্ষ দলের তা পর্যন্ত ওর নখদর্পণে। আপনারা প্রশ্ন করবেন — আমি কেমন করে জানলুম? অত্যন্ত সহজে! ওর আচরণে। আমরা, মানে লাম্পো-প্রেমিকেরা ওর গমনভঙ্গি দেখেই বলে দিতে পারতুম ট্রেনে যে কন্ডাক্টর আছে, যে রেলরক্ষী আছে তারা কোন দলের। আমাদের দলের হলে সে ট্রেনে উঠে সমস্ত গাড়িটা টহল দিয়ে খবরদারি করে সব যাত্রীর তত্ত্বতালাশ নেয়; আর ও-দলের কন্ডাক্টর বা রেলরক্ষী যদি গাড়িতে থাকে তখন সে সিটের নিচে এক্কেবারে স্পিক্‌টি নট! বিন্-টিকিটের চোরাই যাত্রীর ভাবভঙ্গি!



কথাটা আমাদের এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনেও উঠেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল তাদের আইন দেখিয়েও আমাদের কাবু করতে পারেনি। আমাদের একজন উৎসাহী বললে, ঠিক আছে লাম্পোর গলায় আমি টিকিট ঝুলিয়ে দেব!

যে-কথা সেই কাজ! পরদিন দেখা গেল লাম্পোর গলায় কে-একজন একটা চমৎকার বক্‌লেস ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর তা থেকে ঝুলছে অসংখ্য বাতিল টিকিট।

মীনা তো হেসেই বাঁচে না। সবচেয়ে মজার কথা টিকিটের মালা গলায় দিয়ে লাম্পো নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবতে শুরু করল! তার বিখ্যাত হতে যেটুকু বাকি ছিল তাও শেষ হল। অনেকেই তার ফটো তুলছে আজকাল। লাম্পো সহজেই ক্যামেরা ব্যাপারটা সমঝে নিল। কেউ তার দিকে ক্যামেরা তাক্ করলেই লাম্পো পোজ দিয়ে বসে যায়!

এদের মধ্যে একজন ছিলেন সাংবাদিক। এই মুখরোচক কাহিনীটা তিনি সচিত্র আকারে ছাপিয়ে দিলেন সান্‌ডে সেক্‌শনে। তারপর থেকে অনেক বেগানা লোক পর্যন্ত টিকিট কাটতে এসে আমাকে প্রশ্ন করতঃ আচ্ছা, এই স্টেশানে 'লাম্পো' নামে একটা আশ্চর্য কুকুর আছে, তাকে চেনেন?



আমি বলতুম, আলবৎ! ঐ দেখুন! কাছে-পিঠে থাকলে দেখিয়ে দিতুম। না থাকলে আমার টেবিল স্ট্যান্ডের ফটোটা — সিন্ডেরেলার সাজে মীনা আর টিকিটের মালা গলায় লাম্পো!

তারপরেই ঘটলো একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা!

সংখ্যালঘিষ্ঠরা মার-মার করে তেড়ে এল।

ঘটনাটা হয়েছিল এই রকমঃ

সাতটা কুড়ির লোকাল ধরে লাম্পো আসছিল আমাদের বাড়িতে। মীর্নাকে তার নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দিতে। কাঁপিগ্‌লিয়া আর পিয়োম্বিনোর মাঝামাঝি একটা স্টেশান পপুলো নিয়াতে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে। রোজই দাঁড়ায়। লাম্পোর কী মনে হলো — তুরুক করে নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। বোধহয় হাত-পা খেলিয়ে নেবার বাসনা চেগেছিল তার।গাড়িটা ওখানে মিনিট-দুয়েক দাঁড়ায়। কিন্তু গার্ড নজর করে দেখল — একটা লোকও

R.G.S.R.T, W.B. LIBRARY
Date 6.9.01
Acc. No. 10165

নামছে না, বা উঠছে না। লোকাল ট্রেনটা এমনিতেই লেট রান করছিল। তাই গার্ড মাত্র আধ মিনিটেই হুইসেল দিল। লাম্পো বিদ্যুদ্‌বেগে লাফিয়ে উঠতে গেল ট্রেনে। পারল না। তার দেহের আধাআধি যখন কাচের দরজাটা পাড়ি দিয়েছে তখনই অটোমেটিক দরজা বন্ধ হল। বেচারীর মুণ্ডু আর সামনের দুটো পা কামরার ভেতর, বাকি দেহটা বাইরে। সৌভাগ্যক্রমে এসব দরজায় রবার-লাইনিং দেওয়া থাকে, তাই লাম্পো দু-আধখানা হয়ে গেল না। কিন্তু পেটে চাপ পড়ায় সে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। অনেক যাত্রী ছুটে এল ওকে সাহায্য করতে; কিন্তু এ অবস্থায় চলন্ত ট্রেনের দরজা টানলে খোলে না। চেন টেনে কে গাড়িকে থামিয়ে দিল। গাড়ি দাঁড়াতেই দরজা গেল খুলে। ওরা মরণাপন্ন লাম্পোকে কামরায় টেনে তুলল।

লাম্পোর তরফে দুর্ঘটনা এখানেই শেষ হল না— এটুকু ভূমিকামাত্র। আসল দুর্দৈব ঃ ঐ কন্ডাক্টার ভদ্রলোক ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের! যাঁরা এতদিন চাইছিলেন লাম্পোর এই বেআইনি বিহার বন্ধ করতে। তিনি উপরমহলে এমন এক রামপট রিপোর্ট ঝাড়লেন যার মার নেই। কপি টু তাবড় তাবড় আসমান-তক্!

ওঁরা যা চাইছিলেন তাই হল।

উপরমহল থেকে কড়া নির্দেশ এল কাঁপিগ্‌লিয়া জংশনের স্টেশান-মাস্টারের কাছে। দুদিন পরে আমার ডাক পড়ল। বড়সাহেব রাশভারী লোক। বয়স পঞ্চাশের উপর। কম কথার মানুষ। কম কথাতেই নির্দেশ দিলেন তিনি, তোমাকে ডেকেছি শুধু এ জন্য যে, লোকে বলছে ও তোমার কুকুর। আমি জানি না কথাটা সত্য কিনা। তুমি কি ওর মালিক?

আমাকে স্বীকার করতে হল, না স্যার! আমি ওকে কিনিনি বা উপহার পাইনি। তবে আমার খুব পোষ মেনেছে ও!

— খুব আনন্দের কথা। শোন! সংখ্যাতত্ত্ব যাচাই করলে হয়তো দেখা যাবে শতকরা দশজন রেলওয়ে এম্‌প্লয়ীজের পোষা-কুকুর আছে। কিন্তু মিস্টার বার্লেতানি, তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে সেই পোষা কুকুরগুলো যত্র-তত্র রেলভ্রমণ করে বেড়ায় না।

আমাকে স্বীকার করতে হল এই অবিসংবাদিত সত্যটা।

—আমার কাছে অনেক দিন আগেই অভিযোগ এসেছিল; আমি জেনে-শুনে চোখ বুঁজে ছিলাম। কারণ কুকুরটাকে শুধু তুমি একা নও, কর্মীরা অনেকেই ভালবাসে। তার আজব কাণ্ডকারখানা প্রায় কিম্বদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু, আমি দুঃখিত! এবার যে কাণ্ডটা ঘটল — চেন টেনে গাড়ি থামানো, এবং তারপর লিখিত রিপোর্ট —আমার কিছু করণীয় নেই। হয় তুমি তোমার কুকুর সামলাও, নচেত আমাকে 'ডগ ক্যাচার ইউনিট'-কে খবর দিতে হবে! বুঝতে পারছ আমার কথাটা?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের টিকিট-ঘরে ফিরে আসি। বেগানা কুকুরের উপদ্রব হলে কর্তৃপক্ষ ঐ কুকুর ধরার বাহিনীকে খবর দেন। তারা বড় বড় সাঁড়াশি নিয়ে এসে ক্যাঁক করে রাস্তার কুকুরগুলোকে ধরে খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে যায়। তারপর ওরা কী করে কেউ জানে না। আর



সেই বেগানা ঘেয়ো কুকুরদের সে পাড়ায় দেখা যায় না।

আমি নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেই সবাই ঘনিয়ে আসে। সিগ্‌নালার, টি·সি·, কন্ডাক্টার, গার্ডেরা, মায়, এ·এস· এম। আদ্যোপান্ত সব কথা শুনে ওরা পরামর্শ দেয় : উপায় নেই। লাম্পোকে এবার থেকে চেন দিয়ে তোমার বাড়িতেই বেঁধে রাখতে হবে।

লরেঞ্জো বললে, কিন্তু তা কি ও থাকবে ? ওর রক্তের মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছে। লাম্পো জন্ম-ভবঘুরে !

লরেঞ্জো মাল গাড়ির গার্ড। রোম থেকে টুরিন যায় আর আসে। আমার এই জংশন স্টেশনের রানিং রুমে দু-এক রাত কাটিয়ে যায়। আমি তার দিকে ফিরে বলি, তুমি ঠিকই বলেছ লরেঞ্জাত্তি — লাম্পো ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে না পারলে মরে যাবে।

কিন্তু উপায় কী ?

এর পর থেকে শুরু হল লাম্পোর বন্দীজীবন। যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটল। লাম্পো তার বন্দীজীবন মেনে নিতে রাজী হল না। ঘৌ ঘৌ আর কুঁই কুঁই। শেষমেশ আহারে অনীহা দেখা দিল তার। দিন পনেরর মধ্যে লাম্পো আধখানা হয়ে গেল। নানান রকম খেলা দিয়ে, খাবার দিয়ে কিছুতেই তাকে ভোলানো গেল না। অথচ ওর গলার চেন খুলে দিতেও সাহস পাই না। কারণ ছাড়া পেলেই সে একছুটে স্টেশানে চলে যাবে আর ট্রেনে চেপে বসবে !

ডিউটি যেদিন না থাকে সেদিন সপরিবারে কোথাও বেড়াতে যাই গাড়ি নিয়ে। সেদিনটাই শুধু সে খুশিয়াল হয়ে ওঠে। গতি ওর মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। গাড়ি বার করলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। দরজাটা খুলে দেওয়া পর্যন্ত যেন সবুর সয় না — জানলা দিয়ে হাঁকুপাকু করে উঠে পড়ে। বসে ড্রাইভারের পাশের সিটে। মুণ্ডুটাকে বার করে দেয় জানলা দিয়ে। ঝোড়ো হাওয়ায় আরামে তার চোখ দুটো বুজে আসে।

শুধু একদিন এর ব্যতিক্রম হল। সেদিন আমরা আবার গিয়েছিলুম সেই পিয়েজা বোভিওর সমুদ্রসৈকতে। গাড়িটা পার্কিং জোনে রেখেছি কি রাখিনি জানলা গলিয়ে লাম্পো লাফিয়ে নামলো। পাঁই পাঁই ছুটতে ছুটতে উঠে গেল সেই ভিউ-পয়েন্ট টিলার মাথায়। আর সেখানে পৌঁছেই ওর ভাবান্তর হল। সারাটা দিন সে শুয়ে থাকল বালির উপর — তার দৃষ্টি সমুদ্রের ওপারে এল্‌বা দ্বীপের দিকে। অশান্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গর্জন, আর সী-গালের আর্তনাদ শুনল চুপটি করে। এবার কিন্তু সে ঘৌ ঘৌ বা কুঁই কুঁই করল না। আশ্চর্য ! দুপুরে খেতেও নামল না।

মীনা বললে, আর কোনদিন ওকে নিয়ে এখানে এস না।

— কিন্তু কেন বল তো ? পিয়োম্বিনোর সমুদ্রসৈকতে গিয়ে তো ও এমন করে না ? সেখানেও সমুদ্রের ঢেউ আছে, সেখানেও সী-গালের ডাক শোনা যায়।



— কীজানি। ঠিক বলতে পারিনা। আমার আন্দাজ ওর বাল্যকাল কেটেছে কোন একটা সমুদ্রের ধারে — টিলার উপর কোন বাড়িতে। যেখান

S.C.E.R.T. W.B. LIBRARY
Date 6.9.01
Accn. No. 10165
S.C.E.R.T. West Bengal Library

থেকে 'বার্ডস্ আই ভিউ'-তে দিগন্ত-জোড়া সমুদ্র দেখা যায়। এছাড়া কোন ব্যাখ্যা তো মনে পড়ছে না।

কিছুদিন পরে আবার লরেঞ্জোর সঙ্গে দেখা। মালগাড়ি নিয়ে টুরিন যাচ্ছে। এক রাত তাকে থাকতে হবে। জংশনের গার্ড্স রানিং রুমে। লোকটার বয়স হয়েছে। আর মাস কয়েকের মধ্যেই রিটায়ার করবে। জানতে চায়, লাম্পো কেমন আছে?

আমি সংক্ষেপে বলি, ভাল নয়।

কিন্তু অত সংক্ষিপ্ত উত্তরে লরেঞ্জোত্তি সন্তুষ্ট হল না। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শুনল। আমি বলি, তুমিও একজন 'ডগ-লাভার'; তাই নয় লরেঞ্জো?

চুরুটটা চিবোতে চিবোতে বললে, হ্যাঁ। আমার ছিল একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান। বছর পাঁচেক আগে মারা গেছে। তারপর আর পুষিনি!

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বলি, লাম্পোকে তুমি পুষবে? কিছুদিনের মধ্যেই তো তুমি রিটায়ার করছ — একটা অবলম্বন হবে, একটা সঙ্গী।

বৃদ্ধ শিরশ্চালনে অস্বীকৃতি জানালো।

— কেন? তোমার বউ কুকুর ভালবাসে না? তাই বা হবে কি করে? তোমার তো একটা অ্যালসেশিয়ান ছিল বহুদিন ধরে।

লরেঞ্জোত্তি বললে, আমি বিপত্নীক, সংসারে ছেলেপুলেও নেই। আমি একা।

আমি ওর হাত দুটো তুলে নিয়ে বলি, প্লিজ, লরেঞ্জো! তুমি ওকে আশ্রয় দাও!

বৃদ্ধ চুরুটে একটা টান দিয়ে বলে, সে হয় না! তুমি শুধু আমার দিকটাই দেখছ — ওর কথাটা ভাব্‌ছ না।

—ওর কথা! কার কথা?

— লাম্পোর কথা! সে তো রিটায়ার্ড গার্ড নয়! সে জন্ম-ভবঘুরে! বাস্তবিক পক্ষে লাম্পোকে আমি তোমার চেয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকাল বেশি চিনি, বুঝলে?

আমি অবাক হয়ে বলি, মানে?

শোন এলভিও! তোমাকে খুলেই বলি! ওকে তুমি যেদিন প্রথম দেখেছ তার আগের দিন আমার সঙ্গে লাম্পোর পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য তখন ওর ঐ নামকরণটা হয়নি। ওর পরিচয় তখন ছিল বক্‌লেস্‌হীন একটা বেগানা রাস্তার কুত্তা!

লরেঞ্জাত্তির কথা থেকে লাম্পোর পূর্ব ইতিহাস সামান্য কিছু শোনা গেল। সামান্য-অতীত জীবনের একটা মাত্র দিনের ইতিকথা:

লরেঞ্জাত্তি মালগাড়ি নিয়ে রোমা স্টেশনে থেকে উত্তরমুখো যাত্রা করবে বলে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো রোমা স্টেশনে কী-একটা হৈচৈ হচ্ছে। গার্ডরুম থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখে কয়েকজন 'ডগ ক্যাচার' ছুটাছুটি করছে আর একটা সাদা রঙের কুকুর নানা কায়দায় এ গাড়ির তলা



দিয়ে, ও গাড়ির পিছন দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। লরেঞ্জো কুকুর-প্রেমিক। এক নজরে সে দেখে নিয়েছে ঐ বক্‌লেসহীন বেগানা কুকুরটা ধব্‌ধবে শাদা, পিঠের কাছে বাদামি ছোপ ছোপ। বেশ ভাল জাতের কুকুর। হঠাৎ স্টেশনের উল্টো দিক দিয়ে কুকুরটা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গার্ড-কামরায়। বড় কাঠের বাক্সটার আড়ালে আত্মগোপন করল। একবার মুখ বার করে গার্ড সাহেবকে কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলল — পরক্ষণেই সে বেমালুম অদৃশ্য।

লরেঞ্জাত্তি অবাক হল। কুকুরের ঐ কুঁই-কুঁই ভাষাটা সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, 'প্লিজ! আমাকে ধরিয়ে দিও না!'

পরক্ষণেই কুকুর-শিকারীটা এসে পড়ল। ওর কাছে জানতে চাইল একটা কুকুরকে এদিকে দিয়ে পালাতে দেখেছ?

লরেঞ্জো শুধু 'না' বলেই ক্ষান্ত হল না — বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল — ঐ দিকে গেছে! সাদা রঙ বাদামি ছোপ্‌ ছোপ্‌ তো?

রোম থেকে কাঁপিগলিয় পর্যন্ত কুত্তাটা ওর গাড়িতেই পাড়ি দিয়েছে। অভুক্ত কুকুরটাকে লরেঞ্জো নিজের টিফিন বাক্স থেকে ভাগ খাইয়েছে!

আমি বলি, আশ্চর্য! তাহলে এতদিন এসব কথা বলনি কেন?

— তুমি নির্বোধ! বুঝলে না? সেদিন আমি যে কাজটা করেছিলুম তা বে-আইনি। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ লঙ্ঘন! ঐ কথা বলে শেষে পেন্‌শনটা খোয়াই আর কি!

লরেঞ্জো নিজে থেকেই বললে, শোন এল্‌ভিও! লাম্পোকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখলে সে ছয় মাসও বাঁচবে না। ও মুক্ত-প্রাণী! বন্দীদশায় এ জাতের কুকুর বাঁচে না। তোমার সামনে একটিমাত্র খোলা রাস্তা। দেখ, বিবেচনা করে —

লরেঞ্জোর প্রস্তাব : সে লাম্পোর দায়িত্ব নিতে রাজি। দু-তিনদিনের জন্য মাত্র। মালগাড়ি নিয়ে সে ইতালীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত যায়। আমি রাজি হলে সে লাম্পোকে কোন দূর, অতি দূর দেশে নিয়ে যাবে। অনেকবার ব্রাঞ্চ-লাইনে গাড়ি বদলে হাজার কিলোমিটার দূরের কোন স্টেশনে। তারপর নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে। সে অঞ্চলের স্টেশান, ট্রেন-টাইম, ব্রাঞ্চ-লাইনের জটিলতা সম্বন্ধে লাম্পোর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ফলে তার পক্ষে এখানে ফিরে আসা অসম্ভব!

আমি বলি, কী বলছ লরেঞ্জো! সে তো মৃত্যুদণ্ড!

— না! মুক্তি! নিজের এক্তিয়ার থেকে তুমি তাকে যীসাসের হেফাজতে হস্তান্তর করছ মাত্র! কেন মনে করছ — 'জীবে প্রেম' মন্ত্রটায় শুধু কাঁপিগলিয়ার টিকিটবাবুর একচেটিয়া অধিকার? হয়তো সে অঞ্চলের রেলকর্মীরা ওকে একই রকমভাবে ভালবাসবে! একইভাবে ওর গলায় পরিয়ে দেবে 'টিকিটের মালা'!

আমাকে রাজি হতে হল। এছাড়া সত্যিই আর কোন বিকল্প পথ ছিল না। চেন দিয়ে বেঁধে রাখলে লাম্পো ছ-মাসের মধ্যে মারা যাবে। চেন খুলে দিলে কুকুর-শিকারীরা তাকে শেষ করবে! এই ভাল! ওকে যীসাসের করুণায় সমর্পণ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বললুম, আমি রাজি। শুধু একটা



শর্ত! কথাটা যেন গোপন থাকে!

— গোপন! কেন, গোপন থাকবে কেন?

— আমি চাই না মীনা বা মীর্না...

— ও, আই সী!

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মালগাড়িটা ছাড়বে। ট্রেনে করে কুকুর পাচার করার জন্য বিশেষ এক জাতের খাঁচা পাওয়া যায়। এ· এস· এম· তাই একটা ইস্যু করিয়ে দিয়েছেন লরেঞ্জোত্তির নামে। সচরাচর এই খাঁচাটা থাকে ব্রেকভ্যানে; কিন্তু গার্ডসাহেবের ইচ্ছায় আজ খাঁচাটা রাখা হয়েছে গার্ড-কামরায়। লাম্পোকে শেষ বিদায় জানাতে আমরা গুটি চার-পাঁচ কর্মচারী শুধু সমবেত হয়েছি। জানাজানি হলে হয়তো শতখানেক রেলওয়ে কর্মচারী সমবেত হত ওকে সী-অফ করতে। কিন্তু আমিই প্রচারবিমুখ। বিয়োগান্ত বার্তাটা মীনা আর মীর্নার কাছে গোপন রাখতে চাই। ওদের বলব, লাম্পো কোন এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে চলে গেছে। সে যদি না ফিরে আসে তার জন্য কি আমি দায়ী?

ওর গলায় বক্‌লেস। চেন দিয়ে বাঁধা ছিল আমার চেয়ারের পায়ার সঙ্গে।

লরেঞ্জো বল্‌লে, এবার যেতে হয়।

আমি লাম্পোর মুখের সামনে আমার টিফিনবাক্সটা উপুড় করে দিলুম। মীনা আজ কাস্টার্ড পুডিং বানিয়েছিল। লাম্পো নিশ্চিন্তমনে চেটেপুটে সবটুকু খেলো। আমি চেন ধরে আকর্ষণ করতেই সে একান্ত নির্ভরতায় আমার সঙ্গে সঙ্গে তার নির্বাসন-দণ্ডের অভিশাপ বরণ করতে এগিয়ে চলল। সিগ্‌নালার, হেড-কুলি, এ·এস·এম· আর লরেঞ্জোও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

আমার নির্দেশে বিনা প্রতিবাদে লাম্পো উঠে বসল তার খাঁচায়। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল। ও সামনের দুই থাবায় থুতনিটা রেখে জুল জুল চোখে আমাদের দেখছে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হল। ঠিক তখনি এসে হাজির হল বড়সাহেবের আর্দালী। আমার দিকে একটা মস্ত কার্ডবোর্ড-এর বাক্স বাড়িয়ে ধরে বলল, মেমসাহেব আপনাকে দিতে বললেন।

— কী আছে এতে?

— আমি জানি না স্যার। খুলে দেখুন।

চৌকা কার্ডবোর্ডের বাক্স। লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। খুলে দেখলুম সেটা। ভিতরে একটা বিফস্টেক — কম মশলায় রান্না করা। আর একটি সুদৃশ্য কার্ড। তার এক পিঠে স্টেশন মাস্টারমশায়ের স্ত্রীর নাম, ছাপা হরফে। অপর দিকে: বন্‌-ভয়েজ! লাম্পো!

সকলেই বিস্মিত। লাম্পোকে যে আমরা গোপনে পাচার করছি এ সংবাদটা মেমসাহেব পেলেন কেমন করে?

আমাদের সমবেত কৌতূহলী দৃষ্টিটায় এ·এস·এম· সাহেব লজ্জা পেলেন। বললেন, আমিই ওঁকে জানিয়েছিলাম। উনি সেদিন লাম্পোর কথা জানতে চাইছিলেন। বন্দীদশা লাম্পো মেনে নিয়েছে কি না।

সিগ্‌নালার একটু শ্লেষের সঙ্গে বললে, ওটা লাম্পোকে খেতে না দেওয়াই ভাল। খানদানী বিফস্টেক ওর রোগা পেটে সইবে না!



লরেঞ্জোর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। তাকে প্রশ্ন করি, তুমি কী বল?

লরেঞ্জাত্তি বললে, শেষ কথা বলার অধিকার তোমার। কিন্তু যদি আমার পরামর্শ চাও তাহলে বলি এ স্নেহের দানটি গ্রহণ করা উচিত। ভুলে যেও না এল্‌ভিও! তুমি-আমি যে নির্দয় ব্যবহারটা করছি — তাও বাধ্য হয়েই!

— ঠিকই বলেছ তুমি! — প্যাকেটটা ওর গার্ডের কামরায় নামিয়ে রাখি।

লরেঞ্জো হুইসিল দিল। সবুজ পতাকায় সঙ্কেত করল ড্রাইভারকে। ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। লাম্পো কি বুঝতে পেরেছে কিছু? সে কোনও শব্দ করছে না। জ্বলজ্বল নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু। এত লোক থাকতে শুধু আমার দিকে কেন?

মালগাড়িতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন নেই। একটা কয়লার গুঁড়ো চোখে পড়ায় আমি রুমাল দিয়ে চোখটা রগড়াতে থাকি। একটু পরেই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেল।

তারপর দিগন্তের ঐ শেষ প্রান্তে — সেই যেখানে নীল আকাশ এসে মিতালী পাতায় সবুজ দিগ্বলয়ের সঙ্গে, সেই যেখানে সমান্তরাল রেলের লাইনজোড়া পরস্পরকে চুম্বন করার একটা মিথ্যা কুহক রচনা করে, সেখানে পৌঁছে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তবু রেলগাড়িটা বিলীন হয়ে যাবার পরেও সব কিছু শেষ হল না! কয়লায়-টানা ইঞ্জিন তো! তাই আকাশের ঐ নির্মল নীলিমা আর দিগন্তের ঐ প্রাণবন্ত সবুজাভার উপর ভাসতে থাকে কালো ধোঁয়া। একটা কলঙ্করেখা। বিশ্বাসঘাতকতার মতো কালো!

রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি মীর্না ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্বার খুলে দিয়ে মীনা বললে, লাম্পো?

অনেক-অনেকদিন পরে লাম্পো আমার সঙ্গে ট্রেনে চেপে জংশনে গেছিল। যদিও তার গলায় বক্‌লেস, যদিও আমার হাতে চেন। তবু দীর্ঘদিনের বন্দীদশা থেকে এই আধামুক্তি পেয়ে ট্রেনে চেপে সে কেমন খুশিয়াল হয়ে উঠেছে একথা জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

আমি তখন মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে জুতোর ফিতে খুলছি। নিজের কণ্ঠস্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। নেতিবাচক ঘাড় নাড়ি।

— আবার পালিয়েছে?

সত্য-মিথ্যা এড়িয়ে আমি বলি, ও যে জন্মযাত্রী! স্থির হয়ে থাকবার পাত্র তো নয়!

— কোন ট্রেনে চাপল? মেল বা এক্সপ্রেস নয় তো?

এবারও মিথ্যা বলতে হল না, না! মালগাড়ি!

—ওঃ! তাহলে কালই ফিরে আসবে!

পাঁচ মাস কেটে গেছে তারপর। প্রত্যাশিত সেই 'কাল'টা আসেনি! ইতিমধ্যে শীতকাল এসেছে, চলেও গেছে। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পীচ আর অ্যালমন্ড গাছে পাতা ঝরল, নতুন পাতা এল। এখন তারা ফুলের সাজে নতুন করে সেজেছে। শীতাবসানের প্রথম সোয়ালোপাখি রোদঝলমল



আকাশে ব্যস্ত হয়ে ওড়া-উড়ি করছে — বাসা বানাবার সময় হয়ে এল তাদের।

স্টেশন-রুমে আপ-ডাউন ভাষায় আলাপচারী আছে অব্যাহত। টু-আপ আসে, ফোর-ডাউন ছাড়ে। আর আমার টিকিট কাউন্টারে অজানা-অচেনা যাত্রীরা এসে ফোকর দিয়ে হাজার হাজার লিরার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলে, পীসা দুখানা থার্ডক্লাস, গ্রোস্যেতো দেড়খানা সেকেন্ডক্লাস, রোমা যাবার মেলগাড়িটা কি লেট আসছে?

কাজ যখন থাকে না তখন অকারণেই ঐ নির্দিষ্ট টেবিলটার তলার দিকে আমার নজর পড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমার।

মাঝে মাঝে এখনো লোকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, এই জংশনে একটা আশ্চর্য কুকুর আছে না? লাম্পো?

আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বলি, সে আজকাল এখানে থাকে না।

একদিন রোম-টুরিন ডিলুক্স-গাড়ির হেডকুক আমাকে পাকড়াও করল, লাম্পো তো আপনারই কুকুর? সে গেল কোথায় বলুন তো? অনেক দিন তাকে দেখি না।

একই জবাব জানাতে হয়: সে আজকাল এখানে থাকে না।

— কোথায় থাকে তাহলে? স্টেশনটার নাম জানতে পারলে তাকে…

দুর্ভাগ্য! লাম্পো যে কোথায় থাকে আমি সত্যই জানতুম না। জানলে ঐ হেডকুককে নিশ্চয়ই জানাতুম। আহা! লাম্পো বেচারি হয়তো ক্ষুধায় আধমরা! এই লোকটা তাকে ভাল ভাল খাবার উপহার দিতে উদ্‌গ্রীব। অথচ আমি নিরুপায়!

মীর্না কোন কিছু সন্দেহ করেনি। লাম্পো যে খেয়ালী — একথা সে জানত। প্রথম প্রথম সে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করত, লাম্পো ফিরেছে কিনা, কোথায় গেছে, কবে ফিরবে? আমি ক্রমাগত মিথ্যাভাষণ এড়িয়ে তাকে জবাব দিতুম। ইদানীং সে আর কুকুরটার কথা জানতে চায় না। হয়তো সে এতদিনে ভুলে গেছে লাম্পোর কথা।

ভোলেনি মীনা। শুধু ভোলেনি নয়, সে কিছু একটা আন্দাজ করেছে। আমি লাম্পোর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি সেটা সন্দেহ করেছে কিছুটা। হয়তো আমার ভাবান্তরে, অথবা কী জানি — স্ত্রীলোকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সচেতনতায়! এমন একটা কিছু যে সে ভেবেছে এটা আমি আন্দাজ করেছি ওর ব্যবহারে। ইদানীং সে ভুলেও লাম্পোর কথা বলে না। সে বুঝেছে প্রসঙ্গটা আমার কাছে বেদনাবহ। আর বেদনাটার উৎসমূলে শুধুই 'বিরহ' নয় — তাহলে সেটা আমরা স্বামী-স্ত্রী ভাগ করে সহ্য করতুম — বেদনার উৎসমূলে আছে ওর স্বামীর একটা পাপবোধ। আর সেজন্যই মীনা ও প্রসঙ্গ ভুলেও তোলে না। এমন কি একদিন আমি নিজেই প্রসঙ্গটা তুলেছিলুম একটা কুকুর পুষলে কেমন হয়? মীর্নার একটা····

কথাটা সে আমাকে শেষ করতে দেয়নি। জ্বলন্তদৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে শুধু বলেছিল: না!

আমি কথা বাড়াইনি। 'কেন নয়', সে প্রশ্ন করার হিম্মৎ ছিল না আমার।

ওর চোখের দৃষ্টিতে আমি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখতে পেয়েছিলুম।

এর মাঝে একদিন এক কাণ্ড হল।

মীর্না রাত্রে শোয় আমাদের পাশের ঘরে।

সেদিন শুতে যাবার আগে উঁকি মেরে দেখতে গেলুম মীর্না ঘুমিয়েছে কি না। দরজা একটু ফাঁক করে দেখি মীর্না বসে আছে হাঁটু গেড়ে খাটের উপরে। সামনে ম্যান্টেলপিসে রাখা ভার্জিন মেরীর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলছে, 'ডিয়ার মাদার মেরী! তুমি তো খুব দয়ালু! তুমি লাম্পোকে ভাল রেখ! দেখ, সে ঠিক পথ চিনে যেন আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারে।'

আমার মনে হল মীর্না ছোট্ট পা-দুটি দিয়ে আমার অন্তরের একটা বেদনার স্থল অজান্তে মাড়িয়ে দিয়েছে! চোরের মত পালিয়ে এলুম নিজের শোবার ঘরে! বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে আমি কাঁদতে থাকি। মীনা ঘুমাচ্ছে — তার ঘুমটা না ভেঙে যায়!

হঠাৎ পিঠে একটা নরম হাতের স্পর্শ।

আমি সামলে নেবার চেষ্টা করি। মীনা ফিস ফিস করে আমার কানে কানে বলে, মীর্না জানে যে, তুমিই লাম্পোকে অনেক দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়েছ। কিন্তু সে জন্য সে বাপের উপর রাগ করে নেই। তার বাপি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে...

দুর্দিনে স্বামীই স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়। আর আমি বোকার মতো ওর বুকে মাথা গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠি। মীনা যে জানে, তা জানতুম — কিন্তু ঐটুকু মেয়েটাও...

— তুমি কাল ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল। ও বুঝবে! ও তো বোকা মেয়ে নয়!

সত্যিই ভারী বুদ্ধিমান মেয়ে। পরদিন তার কাছে অকপটে সব কথা স্বীকার করলুম। স্টেশন-মাস্টার মশাইয়ের নির্দেশ! আমি কীভাবে চেন দিয়ে ওকে বেঁধে রেখে পোষ মানাতে চেষ্টা করেছিলুম। পারিনি। কীভাবে লরেঞ্জোর পরামর্শ-মতো আমি লাম্পোকে এমন দূর — অতিদূর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি যেখান থেকে পথ চিনে ফিরে আসা কোনও কুকুরের পক্ষে অসম্ভব। আমার দীর্ঘকাহিনীর শেষদিকে আরও জানালুম, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী লাম্পোকে 'বন-ভয়েজ' শুভেচ্ছা-জড়ানো প্যাকেটে বীফ্-স্টেক্ পাঠিয়েছিলেন। বলতে বলতে আমার গলা ধরে এল। তা হোক বুকের উপর থেকে অনেক-অনেকদিন পরে একটা পাষাণভার নেমে গেল আমার। আত্মজার কাছে মিথ্যাভাষী, অপরাধী হয়ে ছিলুম। সেই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেয়ে আমার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমার পাঁচ বছরের মেয়ে তার ফ্রকের প্রান্ত দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, ছিঃ! কাঁদে না! মা মেরী লাম্পোকে দেখবেন। তিনি যে খুব দয়ালু!

দুর্দিনে স্বামীই স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়, আর মা দেয় ছেলেকে।

মীর্না যে আজ আমার মা!

আজকাল আমিই মীর্নাকে তার নার্সারি স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সকালের



লোকালটা ধরতে যাই। মীর্না তার স্কুলের সাজপোশাক পরে, মাথায় বো বেঁধে তার বাপির হাত ধরে গুটিগুটি হাঁটতে থাকে। সেদিন সকালে স্কুল গেটে তাকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বললে, শোন ড্যাডি! তুমি মন খারাপ কর না। লাম্পো নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবে। শিগগিরই!

হাসতে হাসতে বলি, কী করে জানলি? মা-মেরী বলেছেন?

— না, কাল সন্ধ্যাবেলায় একটা 'ফলিংস্টার' দেখে আমি 'উইশ' করেছিলুম। আর রাতে একজন ইচ্ছাপূরণ পরী আমাকে স্বপ্নের মধ্যে···

ওর গালটা টিপে আমি ট্রেন ধরতে রওনা দিই। আজব এই শিশুদের দুনিয়া। বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভব ওরা বিচার করতে জানে না। আজ সকালেই ওকে পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছি লরেঞ্জো ওকে এমন এক রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে এসেছে যেখান থেকে বারবার ট্রেন বদল করে লাম্পোর পক্ষে ফিরে আসা নিতান্ত অসম্ভব! কিন্তু সেই পার্থিব অবাস্তবতা ও এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারছে, কারণ স্বপ্নের মধ্যে এক ইচ্ছাপূরণ পরী···

লোকাল ট্রেনটা আটটা আটান্নতে জংশনে এসে পৌঁছল। আমার নির্দিষ্ট টিকিট ঘরের কাছে এগিয়ে যেতেই দেখি রীতিমতো একটা জটলা। কোনও অ্যাকসিডেন্ট হল নাকি এই সাত সকালে? আমি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাই।

আমাকে দেখতে পেয়েই সিগ্‌নালার চিক্কুর পারে, এই যে আপনি এসে গেছেন! দেখুন স্যার! কে এসেছে দেখুন?

— কে এসেছে? কী হয়েছে?

ভিড়টা সরে গিয়ে আমাকে পথ করে দেয়।

আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি না। সেই কংক্রিটের বেঞ্চির নিচে শুয়ে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর। না! কুকুর নয়, কুকুরের কঙ্কাল! আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াতে চাইল। অথবা বসতে। পারল না। শুয়ে শুয়েই জুলজুল চোখে আমাকে দেখতে থাকে। সামনের দুটি পায়ে থুতনিটা রেখে। ঠিক যেভাবে তাকে খাঁচার ভিতর শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম পাঁচ মাস আগে। তফাৎ এটুকুই — সেবার ও ছিল নিস্পন্দ নিথর, এবার ওর ল্যাজটা তুরতুর করে নড়ছে!

ওর গায়ে লোম আছে-কি-নেই। পাঁজরাগুলো গোনা যায়। টিকিটের মালাটা ওর গলায় নেই। তার বদলে একটা শক্ত গ্যালভানাইজড তার! এত জোরে সেটা ওর গলায় বাঁধা আছে যে বোধহয় ওর ঢোঁক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। আর সেই লোহার তার থেকে ঝুলছে একটা শক্ত দড়ি — যার ও-প্রান্তটা চিবিয়ে কাটা।

আমি দুহাত বাড়িয়ে সেই জলকাদায় মাখামাখি কুকুরের কঙ্কালটা বুকে তুলে নিয়ে অস্ফুটে ওর কানে-কানে বললুম: লাম্পো! সোনামণি! চাকরি ছাড়তে হয় সো ভি আচ্ছা! তোকে কিছুতেই আর যেতে দেব না! তুই আমায় ক্ষমা কর! এজন্য আমিই দায়ী!



ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক তার হিপ্‌ পকেট থেকে একটা প্লাস বার করে কট করে গ্যালভানাইজড তারটা কেটে দিল। তাতে ভারি আরাম পেল লাম্পো। লক্ষ্য করে দেখি, ঐ তারের ঘর্ষণে বেচারির গলায় অনেকটা কেটে

গেছে। সেখানে একটা ঘা-ও হয়েছে।

গলার বাঁধনটা আলগা হতেই লাম্পো আমার মুখটা জিভ দিয়ে চাটতে থাকে। আমি বাধা দিই না। ইতিমধ্যে ক্যান্টিনের ম্যানেজার এসে পৌঁছল। সে আগেই খবর পেয়েছিল লাম্পোর প্রত্যাবর্তনের কথা। তার হাতে একটা বৌলে ব্র্যান্ডি-মেশানো ঈষদুষ্ণ দুধ। পাত্রটা ওর মুখের কাছে ধরা হল।

ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে বুঝতে কষ্ট হল না যে, ক্ষুধায় সে অত্যন্ত কাতর, কিন্তু বেচারি ঢোক গিলতে পারছে না। হয়তো ওর গলার ভিতরেও কোনও ঘা হয়েছে। তা হোক প্রায় আধ ঘন্টা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সে দুধটুকু খেয়ে নিল। আমার দিকে একবার তার নীল চোখের দৃষ্টি মেলে আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে সংবাদটা বিদ্যুদ্‌গতিতে ছড়িয়ে গেছে। জংশন স্টেশনে যেখানে যে আছে সবাই ছুটে এসেছে। এ· এস· এম· সাহেবকে দেখলাম না শুধু। সেই মর্মে প্রশ্ন করতে কে যেন বললে তিনি গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন ডক্টর গুইলিনোকে ডেকে আনতে।

একটু পরেই এসে গেলেন ওঁরা। কিন্তু গুইলিনো রোগীকে পরীক্ষা করলেন না। ঘুমন্ত লাম্পোকে স্পর্শ না করে কাছ থেকে দেখলেন অনেকক্ষণ। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন, মনে হচ্ছে হরেক-রকমের কম্‌প্লিকেশন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা বিশ্রাম! ও দারুণ ক্লান্ত — মৃত্যুর সঙ্গে যুজছে। আপনারা যা খাইয়েছেন তাই ওর পথ্য — দুধ আর ব্রান্ডি! পরের বার দুধের সঙ্গে এই ট্যাবলেট দুটো মিশিয়ে দেবেন। ও খেতে না চাইলে খাওয়াবেন না। দুপুরের দিকে একটু চিকেন ব্রথ দিতে পারেন। আমি বিকালে এসে ওকে ভাল করে পরীক্ষা করব। এখন ওর সবচেয়ে বড় ওষুধ বিশ্রাম —• ঘুম!

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন এ· এস· এম·-এর নাম ধরে ডাকল।

আমরা সেদিকে তাকাতেই দেখি স্বয়ং স্টেশন মাস্টার! বড় সাহেব! সহকারীকে তিনি নির্দেশ দিলেন পূর্বদিকের মালগাড়িগুলোর শান্টিং আপাতত বন্ধ রাখতে, আর ইঞ্জিন-ড্রাইভারদের নির্দেশ দিতে যেন অহেতুক ভোঁ বাজিয়ে লাম্পোর নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটায়। নির্দেশটা সর্বসমক্ষে জারি করে বড় বড় পা ফেলে বড়সাহেব তাঁর খাস-কামরায় ফিরে গেলেন!

সারা বিশ্বের রেলওয়ের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজিত হল কিনা জানি না, তবে আমাদের সিনিয়ার-মোস্ট স্টাফ বেইলি খুড়ো বললে — পিয়োম্বিনো জংশনে এমন ঘটনা এই প্রথম : একটি সারমেয়র নিদ্রায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই শান্টিং বন্ধ রাখা!

সারাদিনে বারে বারে সবাই এসে ওকে দেখে গেল। ম্যাগাজিন-স্ট্যান্ডের বুড়ি আর তার ছেলেটা স্টল বন্ধ করে সমস্ত দিন লাম্পোকে পাহারা দিল — কেউ যেন কোনমতে তাকে বিরক্ত না করে। অহেতুক চিৎকার-চেঁচামেচি না করে।

সন্ধ্যার আগেই ডক্টর গুইলানো আবার এলেন। সমস্ত দিন বিশ্রাম নিয়ে লাম্পো এ বেলায় একটু সুস্থ বোধ করছে। ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি



জিজ্ঞাসা করলেন, চিকেন ব্রথটা খেতে পেরেছিল?

ছোকরা পাহারাদার বললে, না স্যার! চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

ডক্টর আমার দিকে ফিরে বলেন, আমি দুঃখিত এল্‌ভিও! লাম্পো এখানে পৌছনোর চেষ্টাতেই তাঁর জীবনীশক্তি শেষ করে ফেলেছে। ওর চারটে পায়ের তলাতেই ঘা হয়েছে! ও তাই দাঁড়াতে পারছে না। তাছাড়া ওর অন্ত্রেও একটা আলসার হয়েছে। গলার ভিতরেও। আমার মনে হয় আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই ওর সব যন্ত্রণার অবসান হবে!

আমাদের সকলের চোখই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

এ· এস· এম· বললেন, ওকে কোনও ওষুধ দেবেন না ডক্টর? ওর যন্ত্রণাটা কমাতে?

—নিশ্চয়ই দেব। শুধু যন্ত্রণাটা কমাতে নয়, ওকে নিরাময় করতে। জানি বৃথা চেষ্টা, কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে বলে, আশা ত্যাগ করতে নেই!

জিজ্ঞাসা করি, ডক্টর! রাতে কি ওকে এখানে রেখে যাব?

সিগ্‌নালার বলে, তাতে অসুবিধে নেই। আমরা পালা করে পাহারা দেব।

ডক্টর গুইলিনো বলেন, তার চেয়ে তুমি ওকে সাবধানে কোলে করে বাড়িতেই নিয়ে যাও! বাড়িতে পৌছে ও তোমার স্ত্রীকে দেখলে, মেয়েকে দেখলে আরও খুশী হবে। বুঝলে না? এখানে ফিরে আসবার দুরন্ত বাসনাই ছিল ওর বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্য। তাই তীর্থপ্রান্তে পৌছে ওর একটা মানসিক অবসাদ এসেছে। তোমার মেয়ের হাতে, বউয়ের হাতে আদর খেলে ও আবার বাঁচবার একটা প্রেরণা পাবে। ওর বেঁচে ওঠার প্রচেষ্টা জাগানোই হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ।

উনি এমনভাবে বলছেন যেন লাম্পো একজন চিন্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষ!

তাই স্থির হল। দু-তিনজন আমাকে বাড়ি পৌছে দিতে সঙ্গে এল। মীনা আর মীর্না গাড়ি নিয়ে স্টেশনে এসেছে। ইতিমধ্যে টেলিফোনে তাদের জানানো হয়েছে।

মীর্না ওকে দেখে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। তাও তো বেচারি জানে না যে, লাম্পোর মেয়াদ মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা!

আটচল্লিশ ঘন্টা ছেড়ে বাহাত্তর ঘন্টাও পার হয়ে গেল।

লাম্পো উঠে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু এখন শুয়ে শুয়ে খেতে পারছে!

মীনা বললে, তুমি কাল ওকে জংশনে নিয়ে যেও বরং।

বুঝতে পারি, মীর্নার চোখের সামনে লাম্পোর মৃত্যুটা সে এড়াতে চাইছে। কিন্তু শুধু সেজন্য কি ঐ মরণাপন্ন জন্তুটাকে আমার কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে? প্রসঙ্গটা তুলতেই মীনা বলে, তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। ডক্টর গুইলিনো যা বলেছিলেন তা সত্য, কিন্তু অর্ধসত্য! লাম্পো এখানে এসে আমাদের যত্নে আরাম পেয়েছে কিন্তু সে তার আকাঙ্ক্ষার জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

—কী তা?

—ট্রেনের হুইসিল, ইঞ্জিনের ঘস্‌ঘস্‌, যাত্রীদের আনাগোনা, শান্টিং-এর



শব্দ! এতেই ও অভ্যস্ত। এতেই ওর আনন্দ! ও যে রেলওয়ে ডগ্।

হয়তো মীনার কথাই ঠিক। পরদিন তাক আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম জংশনে।

আবার সবাই তাকে দেখতে এল। ইতিমধ্যে আশপাশের সব কয়টা স্টেশনে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দূর থেকে পর্যন্ত টেলিফোন কল আসছে — লাম্পো কেমন আছে, আজ কী খেয়েছে, ডাক্তার কী বলছেন? আপ-ডাউন গাড়ি যদি পাঁচ মিনিট দাঁড়ায় তবে ড্রাইভার-গার্ডেরা একবার তত্ত্বতালাশ নিয়ে যায় লাম্পোর।

পরদিন লরেঞ্জো এসে হাজির।

মাস দুয়েক তাকে আমি দেখিনি। ইতিমধ্যে সে অবসর নিয়েছে। তার আগে, অর্থাৎ লাম্পো চলে যাওয়ার পর কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক কিছু আলোচনা করেছি আমরা: সিনেমা, সরকার, রাজনীতি, আবহাওয়া। বিশেষ একটি প্রসঙ্গ আমিও তুলিনি; সেও নয়। তাই লাম্পোকে সে সাতসমুদ্র তের নদীর কোন পারে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল সে-কথাটা আমি জানতুম না! ওকে দেখে বলি, হ্যালো লরেঞ্জো! অনেকদিন পরে তুমি কী মনে করে?

—চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে! এ যে অবিশ্বাস্য!

লরেঞ্জো ওর কাছে আসতেই লাম্পো তাকে চিনতে পারল। ল্যাজ নাড়ল। তারপর চোখ বুজে ঘুমোতে থাকে।

লরেঞ্জো বললে, মাই ডিয়ার এল্‌ভিও, আমি তোমাকে যা বলব সে কথা আমাকে কেউ বললে আমি বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এ যে আমার নিজের অভিজ্ঞতা!

লরেঞ্জো যদিও প্রথমে ওকে উত্তরমুখো নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার পরে ফেরার পথেও ওকে নিয়ে আসে। দিন পনের-কুড়ি সে ওকে খাঁচা-বন্দী করে রাখে — বাইরের দৃশ্য দেখতে দেয় না। যাতে সূর্যের আলো বা তারা দেখে সে বুঝতে না পারে কখন কোন দিকে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত নেপল্‌স্-এ পৌঁছে ওর এক সহকর্মীকে খাঁচা সমেত লাম্পোর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। তাকে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা খুলে বলে। ওর সেই বন্ধু ইতালি-চরণের গোড়ালির দিকে 'বারি' শহরের দিকে যাচ্ছিল। এতদিনে বন্দী জীবনে লাম্পো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বার্লেত্তা স্টেশনের কাছাকাছি খাঁচাটা সাফা করবার উপক্রম করতেই লাম্পো চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পালায়। সেটা আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে — রেলপথে কাঁপিগালিয়া থেকে ছশো ছিয়াশি কিলোমিটার দূরত্বে। খবরটা সে লরেঞ্জোকে জানায়। লরেঞ্জো ঐ অঞ্চলের সকলকে বলে লাম্পোর কোন সন্ধান পেলে তাকে জানাতে। কেউ সন্ধান পায়নি। তারপর মাস দেড়েক পরে একজন ইঞ্জিন ড্রাইভার ওকে জানায় যে রেগ্গিও ক্যালাব্রিয়া স্টেশনে সে লাম্পোকে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখেছে। লাম্পোকে সে ভালভাবেই চিনত, ভুল হবার কারণ নেই। ঐ রেগ্গিও ক্যালাব্রিয়া হচ্ছে বার্লেত্তা থেকে বিপরীত দিকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দূরত্বে। দিক্‌ভ্রান্ত লাম্পো পাঁচশ মাইল পাড়ি দিয়েছে এই দেড় মাসে কিন্তু সে



এগিয়ে গেছে লক্ষ্যের বিপরীত মুখে। তাকে শেষ যখন দেখা গেছে তখন এই জংশন স্টেশন থেকে রেলপথে তার দূরত্ব প্রায় বারোশ কিলোমিটার! ঐ জায়গা থেকে এখানে আসতে হলে তাকে চারবার ট্রেন বদল করতে হয়। কিছুটা মিটারগেজে, কিছুটা ব্রডগেজে। লাম্পো কী ভাবে এসেছে — কতটা ট্রেনে, কতটা হেঁটে তার হিসাব নেই। কিন্তু তার যাত্রাপথ তিরেনিয়ান উপকূল ধরে আদ্রিয়াতিক সাগর, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ইতালির চরণের বুড়ো আঙুলের দিকে এবং শেষমেষ উত্তর মুখে!

টাইম-টেবিল যে পড়তে পারে না, এন্‌কোয়ারি অফিসে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না, বিন-টিকিটের কুত্তাকে যেখানে ক্রমাগত ছেই-ছেই দূর-দূর শুনতে হয়, তার পক্ষে এ পথ পাড়ি দেওয়া অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব!

কিন্তু তাই দিয়েছিল লাম্পো! মৃত্যুর পূর্বে তার কঙ্কালসার দেহটা নিয়ে ফিরে এসেছিল মীর্নার কোলে!

ইচ্ছা-পূরণ পরীর শুভেচ্ছা সম্বল করে!

আন্দাজ করা যায়, এর মধ্যে সে একবার বন্দী হয়। কোন একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তির হাতে। যে ওকে শক্ত গ্যালভানাইজ্‌ড্ তারের বক্‌লেস পরিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। যেমন করেই হ'ক, দড়ি কেটে লাম্পো আবার নিজেকে মুক্ত করে। কিন্তু গলা থেকে ঐ টাইট তারটা খুলতে পারে না। ফলে সে ঢোক গিলতে পারেনি। হয়তো খেতেও পারেনি। তবু মরেনি সে!

আশ্চর্য জীবনীশক্তি ওর।

ডাক্তার গুইলিনোর প্রগ্‌নশিস্ তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে লাম্পো চার পায়ে উঠে দাঁড়াল একদিন। এতে বোধকরি সবচেয়ে খুশি হলেন ডাক্তারবাবু নিজেই!

লাম্পোর গায়ে আবার লোম গজালো। এখন সে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে।

এককালে লাম্পোর খাবার আমাকে লিরার বিনিময়ে কিনতে হত। এখন হয় না। রেলওয়ে ক্যান্টিনের ম্যানেজার রীতিমত ঝগড়াই শুরু করে দিল আমার সঙ্গে, আপনি কী বলতে চান মশাই? লাম্পো কি শুধু আপনার? আমাদের কেউ নয়? ও তো কাঁপিগ্‌লিয়া স্টেশনের সম্পত্তি। ও তো আমাদের।

আমি বলি, ঠিক আছে, ঠিক আছে! এতে অত চটছ কেন? না হয় তুমিই ওকে খাইও।

একদিন সকালে ঠিক আটটার সময় আমার বাড়িতে কলিংবেল বাজল।

ডিং-ডং করে নয়: ঘৌ!

লাম্পো এসেছে তার ডিউটি করতে — মীর্নাকে স্কুলে নিয়ে যেতে।

ক্রমশ সে তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে চাইল।

আবার সে এ-ট্রেনে ওঠে, ও-ট্রেন থেকে নামে। আবার তার ভ্রমণ শুরু হল লোকাল প্যাসেঞ্জারে, এক্সপ্রেসে, মেলে! টুরিন-রোম ডিল্যুক্স ট্রেনের হেড কুক ভারি খুশি।



লাম্পোর জীবনে আবার ফিরে এল নববসন্ত!

কিন্তু ঐ!

ইফ স্প্রিং কামস্ ক্যান উইন্টার বি ফার বিহাইন্ড?

'মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর!'

সেই আইনে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি সংখ্যালঘু রেলকর্মচারীরাও নতুন করে ঘোঁট পাকানো শুরু করলেন — বেওয়ারিশ কুকুরকে এভাবে ট্রেনে যাতায়াত করতে দেওয়াটা তো বে-আইনি! সে যদি কাউকে কামড়ে দেয় তাহলে কে দায়ী হবে? তুমি? তা-বড় তা-বড় অফিসার্সদের সেই সার্কুলারটাতো তামাদি হয়ে যায়নি!

আবার একদিন আমার ডাক পড়ল বড়সাহেবের ঘরে। তবে এবার আমাকে একা যেতে হল না, আমরা সদলবলে হাজির হলুম বড়সাহেবের কামরায়। জনা বিশ-পঁচিশ।

বড়সাহেব — আগেই বলেছি, রাশভারী মানুষ, কথা বলেন কম। এত বড় ডেপুটেশান দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, এ কি! আপনারা এসেছেন কেন? আমি শুধু বুকিং ক্লার্ককে ডেকেছি!

ইউনিয়নের মুখপাত্র বললে, লাম্পো ওঁর একার নয় স্যার! আপনার যা বলবার আছে তা আমাদের সামনেই বলতে হবে।

বড়-সাহেব গর্জে ওঠেন, না! আমি যে লাম্পোর প্রসঙ্গে ওঁকে ডেকেছি তার কোনও প্রমাণ নেই! আমার যা বলবার তা ওঁকে জনান্তিকেই বলব। ইচ্ছা হলে উনি তা এ ঘরের বাইরে গিয়ে তোমাদের জানাতে পারেন। যাও তোমরা।

ইউনিয়নের পাণ্ডা বললে, ঠিক আছে স্যার! আমরাও ছেড়ে কথা বলব না!

পাঁচ মিনিট পরে আমি যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম, ওরা জানতে চাইল কী ব্যাপার?

বললুম, ব্যাপার কী তা জানি না। বড়সাহেব শুধু বললেন, তাঁর মেমসাহেব আমার সঙ্গে জনান্তিকে কী একটা আলোচনা করতে চান। আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাঙলোতে যেতে বলেছেন!

—বাংলোতে যেতে বলেছেন? মানে? অফিসের কাজ বাঙলোতে কেন?

—তা তো জানি না। অফিসের কথাই যে বলবেন, তাও জানাননি।

—অফিসের কথা ছাড়া আর কী কথা? তুমি মহাজন নও যে, টাকা ধার চাইবেন; ব্যাচিলার নও যে, মেয়ের জন্য সৃটার খুঁজছেন! তাহলে বাঙলোতে কেন?

—বললাম তো, জানি না। মেমসাহেব নাকি কিছু কথা বলবেন।

— তাঁর আবার কী বলার থাকতে পারে?

— তা জানি না ভাই।

মেমসাহেব প্রস্তাবটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত!

রেল-বোর্ডের বড় কর্তাদের অসীম ক্ষমতা! হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে



না। স্টেশন মাস্টারমশাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী! লাম্পোর প্রতি তাঁর যতই সহানুভূতি থাক...

আমি বাধা দিয়ে বলি, মাদাম! আপনি যা বলছেন তা বুঝতে আমার কোনই অসুবিধে হচ্ছে না। বস্তুত নতুন কথা আপনি কিছুই বলেননি। শুধু একটি কথাই বলব — এই কথাগুলো আমি আমার 'বস্'-এর মুখ থেকে শুনলেই বেশি খুশি হতুম।

উনি হেসে বললে, মসিয়ঁ বালের্তোনি! তুমি আমার কথা বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছ না! বস্তুত তোমার ভুল হচ্ছে এজন্য যে, তুমি আমার সবটা কথা এখনো শোননি। আমি বলতে চাই — রেল বোর্ডের বড়কর্তাদের অসীম ক্ষমতা, কিন্তু তার উপরেও একটি অথরিটি আছে! আমাদের তার দ্বারস্থ হতে হবে।

—রেলওয়ে মিনিস্টার?

— না! তারও উপরে!

আমি আর হালে পানি পাই না।

— 'ভক্স পপুলি!'

— 'ভক্স পপুলি?'

— হ্যাঁ, জনগণ! শোন! আমার এক কাজিন-ব্রাদার আছে যে ইতালীর সর্ববিখ্যাত সংবাদপত্রের চিফ এডিটর। তাকে আমি আমার সমস্যার কথা জানিয়েছি। ও একজন বিখ্যাত সংবাদদাতাকে আগামী শুক্রবার পাঠিয়ে দিচ্ছে। লাম্পোর ঐ অবিশ্বাস্য অভিযানটা সচিত্র আট কলমব্যাপী শিরোনামা সমেত প্রকাশ করব আমরা। জনগণকে আমরা জানিয়ে দেব এমন একটি কুকুরের স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে রেল বোর্ড! তার প্রতিক্রিয়াটা কী হয় আমরা দেখব। এ ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা চাই!

আমি সলজ্জে বলি, মাদাম, একটু আগে আমি যা বলেছি সেজন্য লজ্জিত। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

মেম-সাহেব বলেন, ও সব বাজে সেন্টিমেন্টের কথা বাদ দাও! তুমি লরেঞ্জোকে বল একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করতে, সে কোথায় তাকে ছেড়েছে। তার বন্ধু — যার হেপাজত থেকে লাম্পো বার্তেলা স্টেশান থেকে পালায় তারও স্টেটমেন্ট চাই! আর যে ড্রাইভার ওকে রেগ্গিও ক্যালাব্রিয়াতে দেখেছে...

— ঠিক আছে! বুঝেছি! আমি এখনি টেলিফোনে যোগাযোগ করছি। সংবাদপত্রের রিপোর্টার ভদ্রলোক এসে পড়ার আগেই সব কিছু যোগাড় করে ফেলব আমি।

মেমসাহেব বললেন, সবই যোগাড় করতে পারবে; কিন্তু জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সবচেয়ে যেটার প্রয়োজন তা আজ আর আমি যোগাড় করতে পারব না! সেটা আমাদের নাগালের বাইরে আজ!

— কিসের কথা বলছেন ম্যাডাম?

— লাম্পোর প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তের সেই কঙ্কালসার মুমূর্ষ চেহারার ফটো!



আমি বলি, তাও পাবেন। ও মারা যাবে ভেবে মীনা তার অনেকগুলো ফটো তুলেছিল। ভালই উঠেছিল ছবিগুলো!

আগুন ছুটিয়ে লিখলেন সাংবাদিক ভদ্রলোক: 'এ শতাব্দীর ওডিসি'!

প্রথম আবির্ভাব থেকে সাম্প্রতিকতম সংবাদ। পাঁচ-সাতটি ছবি। কয়েকটি 'মেকবেলিভ' ছবিও সাজিয়ে তুলতে হল: টিকিটের মালা গলায় লাম্পো, টুরিন-রোমা ডিলুক্স ট্রেনের ডাইনিং কার থেকে নিক্ষিপ্ত প্যাকেট সেকেন্ড স্লিপের ফিল্ডারের মতো সে কী ভাবে লাফ দিয়ে ধরে, সংখ্যালঘিষ্ঠ আইনরক্ষকদের দেখলে সে কি ভাবে সীটের নিচে লুকোয় — সব কিছু। উপসংহারটি ছিল তীব্র শ্লেষে ভরা: 'রেলওয়ে আইন যে অমোঘ, এ কথা কে না মানবে? কিন্তু 'আইন' কাকে বলি? যার বনিয়াদে আছে 'মিলিয়ান-টু-ওয়ান চান্সের' ব্যতিক্রম! সূর্য যে পূবদিকে উদয় হবে এটা আইন নয় — একটা প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। কারণ 'এক্সেপশান' দিয়ে সে 'রুল প্রুভড্' হয়নি। রেলওয়ে রিফ্রেশ্‌মেন্ট রুমে ডিনার সারলে বিল মেটাতে হয় — এটা আইন! কারণ রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার অথবা রেলমন্ত্রী ঐ 'মিলিয়ান-টু ওয়ান' ব্যতিক্রমের বনিয়াদে এ আইনটা বাঁচিয়ে রেখেছেন! সেক্ষেত্রে বিল হাতে বয় আসে না, আসে বিগলিত-বয়ান ম্যানেজার, জানতে: স্যারের অসুবিধা হয়নি তো কিছু?

'লাম্পো তেমনি এক দুর্লভ ব্যতিক্রম! সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার রেলপথে এমন কুকুর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি বলে! গোটা ইতালির গর্ব এই দুর্লভ প্রতিভাটিকে রেলের আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন আপনারাই — এই পত্রিকার অগণিত পাঠক-পাঠিকা, যদি আপনারা প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারেন! যদি আপনারা গর্জে উঠে বলতে পারেন: মুক্ত প্রাণী কম্যুটার লাম্পোর অবাধ ভ্রমণের অধিকার হরণের অধিকার আমরা কাউকে দেব না!'

সেই ভাবেই গর্জে উঠল ইতালির সাধারণ মানুষ। ডাক্তার-মোক্তার-এঞ্জিনিয়ার-মেহনতি মজদুর! সম্পাদককে লেখা চিঠিপত্রের কলম-এ। দু-তিন হপ্তা চলল তার জের!

দিন-পাঁচেক পরে আবার ডাক পড়ল বড়সাহেবের ঘরে।

— ওহে! বড় বিপদে পড়া গেল দেখছি তোমার ঐ লাম্পোকে নিয়ে!

— কেন স্যার? আবার কি হল?

— সেক্রেটারি-ব্রডকাস্টিং এই মাত্র টেলিফোন করেছিলেন। রেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ওঁরা লাম্পোর উপর একটি ডকুমেন্টারি ফিলম তুলতে চান। সাতই নভেম্বর টিমটা আসবে ছবি তুলতে। সব দায়-দায়িত্ব তোমার। বুঝলে?

আমি তো আনন্দে বিগলিত। বলি, এতে বিপদের কী দেখলেন স্যার?

ওষ্ঠপ্রান্তে নয়, চোখের তারায় ওঁর খুশিয়াল মনের প্রতিবিম্ব পড়ল। গম্ভীর হয়ে বললেন, এসব বে-আইনি ব্যাপারের ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলা কি ঠিক? যা হোক, সব ব্যবস্থা করে ফেল।



পাঁচই নভেম্বর উনিশ শ তিপান্ন। সকাল নয়টায় টি-ভি ইউনিটটি রোম থেকে

এসে পৌছবে। আমি সকলকে সতর্ক করে দিলুম — তোমরা দেখ, ও হতভাগা না কোনও ট্রেনে উঠে পিট্টান দেয়!

সবাই খুশিতে ডগমগ! সবাই প্রতিশ্রুতি দিল।

নভেম্বরের পয়লা তারিখ থেকেই লাম্পো নজরবন্দী!

কিন্তু ঐ!

'আমারে বাঁধবি তোরা, সেই বাঁধন কি তোদের আছে?'

চৌঠা নভেম্বর রাত্রি থেকেই লাম্পো নিরুদ্দেশ!

পাঁচ তারিখ সকালে ওঁরা যথারীতি এলেন। আমরা কি বলে ক্ষমা চাইব তা স্থির করে উঠতে পারি না। ওরা যদি ফিল্ম না তুলে ফিরে যায় তাহলে অনেক টাকা ক্ষতি হবে। হয়তো 'শো-কজ' নোটিশ জারি হবে! কিন্তু এটা কি আমাদের ডিউটির এক্তিয়ারভুক্ত? রেলওয়ে আইন কী বলে এ ক্ষেত্রে?

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটি মাত্র অক্ষরে। সেই ক-বর্গের চতুর্থ ধ্বনিটা ঔ-কার যোগে!

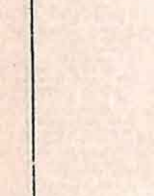
ভীড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ফিল্মের হিরো স্বয়ং — ঘৌ!

1958 সালে সরকারি ব্যয়ে নির্মিত ছবি যার ইংরাজি নাম 'LAMPO,THE TRAVELLING DOG' যদি ভারত সরকার আনিয়ে দেখান তাহলে আমাদেরও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হতে পারে। টেলিভিশানে দর্শকের দরবারে 'ভক্স পপুলি' একটু চেষ্টা করে দেখুন না!

ছবিটা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লাম্পোর মালিক সেই অখ্যাত কাঁপিগলিয়া জংশনের টিকিটবাবু সানফ্রান্সিকো থেকে অভিনন্দন পেয়েছিলেন, বাফেলো থেকে এয়ার-মেলে এসেছিল মার্কিনী উপহারঃ এক প্যাকেট বিস্কুট!

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। অটোমেটিক দরজাটা খুলে যায়। যাত্রীরা নামে। যাত্রীরা ওঠে। ঠেলাগাড়ি নিয়ে কুলিরা ইতালিয়ান ভাষায় — 'সামালকে ভাইসাব' হাঁকাড় পাড়তে-পাড়তে চলেছে। খাবারের ট্রলি নিয়ে ছোকরা হকার হাঁক পাড়ছে। খবরের কাগজের হকারও। স্টেশনে নানাবিধ শব্দের হরেকরকম্বা। লাম্পো এতে অভ্যস্ত, লাম্পোর এতেই আনন্দ। সে একদৃষ্টে সব কিছু দেখছে, শুনছে। আমি একটু নিশ্বাস নিতে টিকিট ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। পিছন থেকে কে যেন বললে, শুনছেন? লেগহর্ণ যাবার ট্রেন কখন পাব বলতে পারেন?

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি এক বৃদ্ধ। বয়স পঁচাত্তরেরও বেশি। গায়ে একটা বেঢপ ঢিলে-ঢালা জামা। হয় সেকেন্ড-হ্যান্ড কেনা অথবা উপহার পাওয়া। মাথায় একটা টোকা জাতীয় টুপি। এক মুখ বড়্ভ দাড়ি। বললুম, ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মে পাবেন। বিকাল পাঁচটায়। তার মানে পাক্কা দু-ঘন্টা পরে।



—এঃ! কী আতান্তরে পড়লুম বলুন তো! অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে তিন-তিনটে স্টপেজ পার হয়ে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি লেগ্হর্ণে থাকেন?,

— না, থাকি রোমা-তে। দিন-কয়েকের জন্য লেগহর্ণে যাচ্ছি এক বন্ধুর

কাছে। সে ওখানকার কারখানার মজদুর। আচ্ছা, একটু খাবার জল কোথায় পাব বলতে পারেন?

আমি 'ড্রিঙ্কস্ কর্ণার' দোকানটা দেখিয়ে দিই।

— আঃ! ও তো ইরেটেড-ওয়াটার। পয়সা দিয়ে পান করলে তো বিয়রই কিনতাম। আমি সাদা জলের কথা বলছি। প্লেন ওয়াটার।

কেমন যেন করুণা হল। বৃদ্ধকে বলি, ঠিক আছে, আসুন, বিয়ার খাব দুজনে। আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। আমিই খাওয়াব।

বৃদ্ধ বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ভিক্ষা নিই না।

— ভিক্ষা বলছেন কেন একে? একজন ইতালিয়ান কি দ্বিতীয় আর একজনকে ভালবেসে ড্রিংস্ অফার করতে পারে না?

— পারে। একশবার পারে! কিন্তু দ্বিতীয়জন সেটা গ্রহণ করতে পারে তখনই যখন তৃতীয় একজন অপরিচিতকে ড্রিংস অফার করার মতো লিরা তার জেব-এ থাকে।

কথাটা শেষ করেই বৃদ্ধর নজরে পড়ে স্টেশনের ও প্রান্তে পানীয় জলের স্ট্যান্ডটা। সেদিকে এক পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলিরেখাঙ্কিত তর্জনীটা বাড়িয়ে বলেন, ঐ কুকুরটা···

— হ্যাঁ, ওই সেই বিখ্যাত লাম্পো! কাঁপিগলিয়া স্টেশনের গর্ব।

— লাম্পো! ওর নাম লাম্পো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। যার কথা খবরের কাগজে পড়েছেন।

— না, পড়িনি। আমি খবরের কাগজ পড়তে পারি না।

জানি না, বৃদ্ধ কী বলতে চান। উনি দৃষ্টিশক্তিবিহীন, অথবা আনপড়। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলি, তবে কি টি·ভি·-তে দেখেছেন?

— টি·ভি·! মানে টেলিভিশন? সে তো বড়লোকদের জন্য!

— তবে লাম্পোর কথা কার কাছে শুনেছেন?

— লাম্পোর কথা শুনিনি, আর তাছাড়া লাম্পো নয়; ওর নাম তো বাঘেরি!

এই প্রথম আমার মনে হল ভদ্রলোক ওভার-ক্যারেড হয়েছেন ঘুমিয়ে পড়ার জন্য নয়, বিকৃতমস্তিষ্ক বলে। কথার কথা হিসাবে শুধু বললুম, কে বলল ওর নাম বাঘেরি?

— আমি!

—ও!

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কী বুঝলেন কী জানি। বললেন, বিশ্বাস করছেন না?

স্বীকার করতে হল সত্যটা। বললুম, না, করছি না।

এই প্রথম উনি হাসলেন। বললেন, বেশ বাজি ধরুন — এক বোতল বিয়ার! আমি প্রমাণ দেব!

দেখি না কৌতুকটা কতদূর গড়ায়। বললুম, বাজি ধরছেন, কিন্তু আপনার জেব-এ তো এক বোতল বিয়ার কেনার পয়সা নেই!

— সেটা আমার বিবেচ্য! আমার এক বোতল বিয়ারের ভারি প্রয়োজন



এখন! কী, রাজি?

বললুম, রাজি!

ইতিমধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। লাম্পো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ শিস্ দিয়ে ডাকলেন: বাঘেরি!

আমি কোনক্রমে হাসি চাপি। ক্ষণিকের জন্য। কারণ পরমুহূর্তেই দেখি, লাম্পো চকিত হয়ে ওঁর দিকে তাকালো। ওর ল্যাজ নড়ছে না, শুধু কান দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ তার দিকে একপা এগিয়ে গিয়ে বললেন, কী রে হতভাগা! বেপ্পোকে চিনতে পারছিস না? বাঘেরি?

লাম্পোর ভাবান্তর হল। কান দুটো বারে বারে উঠছে আর নামছে। এগিয়ে এল সে। বৃদ্ধকে প্রদক্ষিণ করল বার কয়েক। শুঁকল। বার বার। তারপর আমাকে স্তম্ভিত করে সে ঝাঁপ দিয়ে উঠতে চাইল বৃদ্ধের কোলে। এখন তার ল্যাজ ঘন-ঘন নড়ছে!

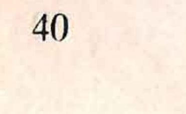
বৃদ্ধ ওকে দুই থাপ্পড় মারলেন! আদরের চাপড়। বললেন, বাঘেরি! ঐ ভদ্রলোককে বলে দে — তোর নাম 'লাম্পো' নয়, 'বাঘেরি'। নাহলে তোর ফোতো-কাপ্তেন বেপ্পো বিয়ার খাবে কি করে?

বাজি হেরেছি এতে সন্দেহ নেই।

দুজনে দু বোতল বিয়ার নিয়ে বসেছি আমার ঘরে। মাঝে মাঝে ফোঁকর দিয়ে হাজার লিরার নোট সমেত হাত বেরিয়ে আসছে টিকিটের ধান্দায়। টিকিট বেচছি আর শুনছি বৃদ্ধের গল্প। লাম্পো — না কি 'বাঘেরি' বলব এখন থেকে? — আরাম করে শুয়ে আছে বৃদ্ধের কোলে।

বৃদ্ধের পিতৃদত্ত নাম একটা নিশ্চই ছিল। ফুটপাথে মানুষ হওয়া বেজন্মারও বেশ গালভরা একটা 'ভালো নাম' থাকতে বাধা নেই, আর যেহেতু বাপের ঠিক নেই তাই মায়ের পদবিটা। বৃদ্ধেরও নিশ্চিত এককালে তা ছিল। কিন্তু গত পঞ্চাশ ষাট বছর সেই নামটা শোনা হয়নি বলে ওঁর তা মনে নেই। বাপ কে তা তো জানেনই না, মা ছিল সুন্দরী। আর্টিস্টদের মডেল। সেই মাকেও হারিয়েছেন শৈশবে। বস্তির পাঁচজনের দয়ায় অকালমৃত্যুর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনি। নিজের নামটা সই করতে পারেন শুধু, মানে ডাকনামটা: বেপ্পো।

লেখাপড়া না শিখলে কি হয়, ছবি আঁকায় দারুণ দড়। এটাও স্কুলে শেখেননি। শিখেছেন ফুটপাথে। ইতালি দেশটার যত্রতত্র ফুটপাথে আর্টিস্ট। এক বোতল বিয়ারের বদলে এমন খানদানি পেন-অ্যান্ড-ইংক পোর্ট্রেট বানিয়ে দেবে যে তোমার চোখ নাটা-নাটা! তেমনি ফুটপাথি গুরুর কাছেই শিখেছেন বিদ্যেটা। সেই ফুটপাথি গুরুই ওঁকে বলেছিলেন, এই যে তোর ছবি আঁকার দারুণ হাত, এটা কার কৃতিত্ব জানিস? তোরও নয়, আমারও নয়। তোর মা ছিল আর্টিস্টদের ন্যূড মডেল!



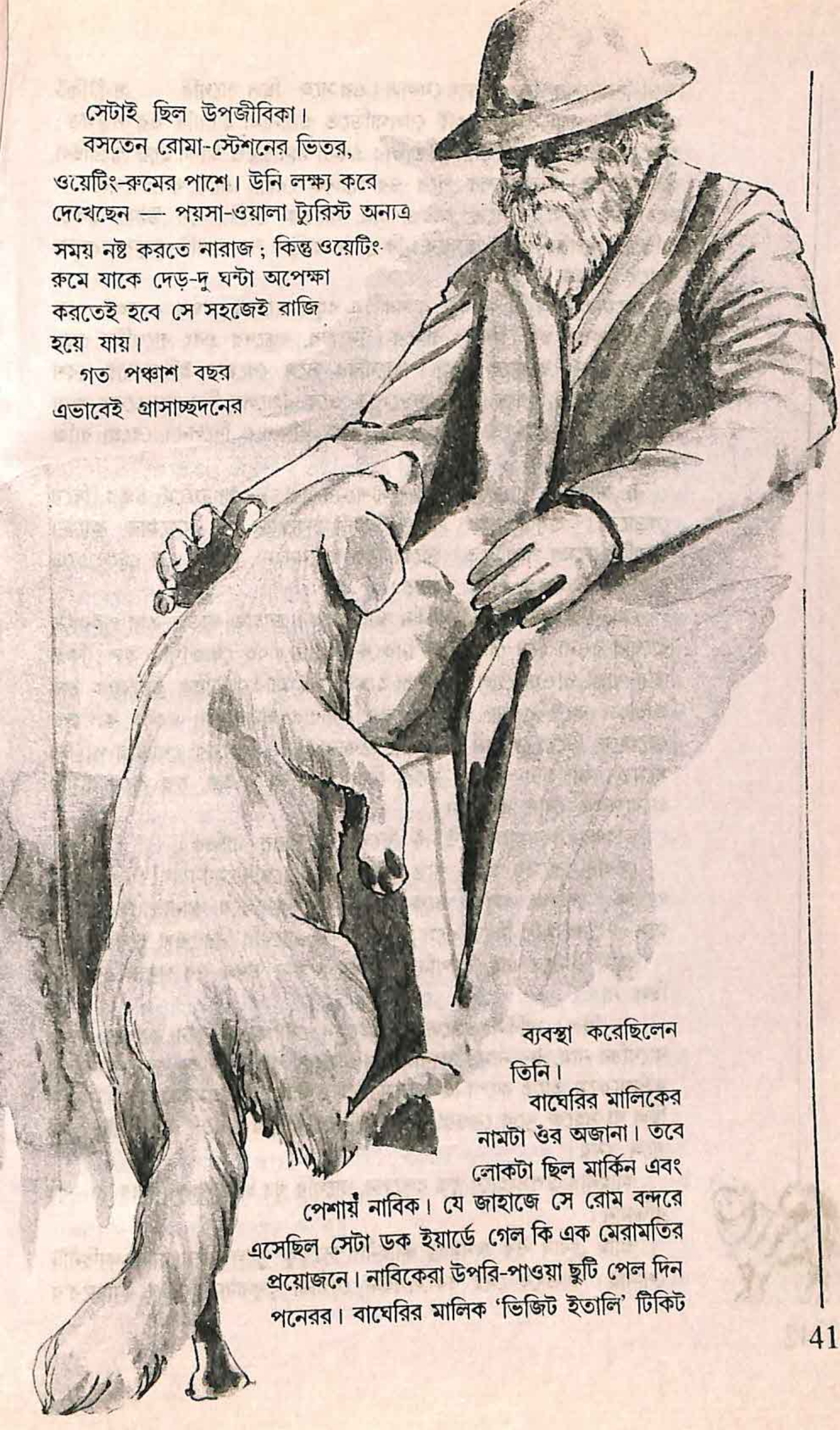
বেপ্পো বলতেন কৃতিত্বটা তবে কি মায়ের?

— দূর হতভাগা! তোর বাপের! 'সারনেম'টা তো তোকে দিতে পারেনি, তাই দিয়ে গেছে এলেমটা!

সেটাই ছিল উপজীবিকা।

বসতেন রোমা-স্টেশনের ভিতর, ওয়েটিং-রুমের পাশে। উনি লক্ষ্য করে দেখেছেন — পয়সা-ওয়ালা ট্যুরিস্ট অন্যত্র সময় নষ্ট করতে নারাজ ; কিন্তু ওয়েটিং-রুমে যাকে দেড়-দু ঘন্টা অপেক্ষা করতেই হবে সে সহজেই রাজি হয়ে যায়।

গত পঞ্চাশ বছর এভাবেই গ্রাসাচ্ছদনের



ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

বাঘেরির মালিকের নামটা ওঁর অজানা। তবে লোকটা ছিল মার্কিন এবং পেশায় নাবিক। যে জাহাজে সে রোম বন্দরে এসেছিল সেটা ডক ইয়ার্ডে গেল কি এক মেরামতির প্রয়োজনে। নাবিকেরা উপরি-পাওয়া ছুটি পেল দিন পনেরর। বাঘেরির মালিক 'ভিজিট ইতালি' টিকিট

কিনে দিনদশেক দেশটা চষে ফেলল। ওর সঙ্গে ছিল বাঘেরি — স-টিকিট বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার। তাই রেলগাড়িতে ওঠানামা ইত্যাদি ওর সড়গড় ; আর কে জানে হয়তো গোটা ইতালির একটা মানচিত্রও আঁকা হয়ে গিয়েছিল ওর মস্তিষ্কে। দিন দশেক পরে ওর মালিক রোমে এসে খবর পেল — জাহাজটা জলে ভাসতে আরও দিন সাতেক দেরি। সে উঠল একটা বাড়িতে। পেয়িং গেস্ট হিসাবে। কিন্তু সে বাড়ির ল্যান্ডলেডি কুকুর বরদাস্ত করতে নারাজ।

বেপ্পোর সঙ্গে ঐ মার্কিন নাবিকটির বন্ধুত্ব হয়েছে প্রথম থেকেই। সে ভদ্রলোকেরও ছবি আঁকার বাতিক। নিজের, বন্ধুদের এবং বাঘেরির স্কেচ আঁকিয়েছেন বেপ্পোকে দিয়ে। বাঘেরির সঙ্গে বেপ্পোর ইতিমধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেছে। তাই ভদ্রলোক ওকে বললেন দিন সাতেকের জন্য কুকুরটার দায়িত্ব নিতে। বেশ মোটা রকম দক্ষিণাও দিলেন। বেপ্পো রাজি হয়ে গেলেন।

ঐ সাতদিন বাঘেরি রোম স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে চক্কর দিয়ে বেড়াতো। শুধু খাবার সময় এসে উপস্থিত হত বেপ্পোর কাছে। ওয়েটিং-রুমের পাশটিতে। বেপ্পো ঠিক জানেন না, হয়তো সে ট্রেনে চড়ে কাছাকাছি চক্করও দিয়ে আসত।

মোটকথা যেদিন সেই মার্কিন ভদ্রলোকের জাহাজ ছাড়ল তার পূর্বরাত্রে বাঘেরি রওনা হয়ে গেছে এক নিরুদ্দেশযাত্রায়। বহু খোঁজাখুঁজি হল ; কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়েই সেই মার্কিন নাবিক ভদ্রলোক তাঁর জাহাজে করে রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় কী একটা কাগজও বেপ্পোকে দিয়ে গেলেন — তাঁর ঠিকানা এবং কুকুরের পেডিগ্রি-পরিচয় সমেত। কাগজটা পড়বার মতো বিদ্যা ছিল না বৃদ্ধের, যত্ন করে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

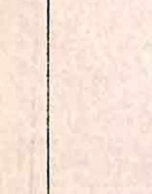
তারপর বছরখানেক উনিই ছিলেন বাঘেরির মালিক।

সেবার রোমেও প্রচণ্ড শীত পড়ে। উনি ব্রঙ্কোনিমোনিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রেলের বাবুরা ওঁকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত করে। মাস-দেড়েক পরে ফিরে এসে উনি দেখেন, বাঘেরি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

আমি জানতে চাই, আপনি যখন ওকে পান তখন ওর গলায় বক্‌লেস ছিল না ?

— ছিল। মার্কিন ভদ্রলোকটি ছিলেন সৌখিন। একটা রুপোর পাতে বাঘেরির নাম, ওঁর নাম-ঠিকানা লিখে চামড়ার বক্‌লেসে আটকে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে রুপো ছিল অনেকটাই। আর সেটা এমনভাবে আটকানো ছিল যা সহজে খুলে নেওয়া যায়। তাই রুপোটুকুর লোভে বক্‌লেসটা কেউ খুলে নেয়।

কাহিনীর উপসংহারে বৃদ্ধ বললেন, বাঘেরি খুব লক্ষ্মী কুকুর আর ভা—রি বুদ্ধিমান।



আমি এবার ওঁর অসমাপ্ত কাহিনীর সূত্রটুকু তুলে নিয়ে বাকি কাহিনীটা শোনাই। কীভাবে সেই বক্‌লেসহীন বেগানা কুকুরটাকে 'ডগ ক্যাচারে'র

তাড়া করে, কেমন করে লরেঞ্জোর দৌলতে সে আমার কাছে এসে পৌছায়। এবং তার অবিশ্বাস্য ওডিসি।

বৃদ্ধ কিন্তু আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল না। হয় ইতালির ম্যাপ সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা নেই, অথবা বারোশ' কিলোমিটার দূরত্ব থেকে একটি কুকুরের পথ চিনে চিনে ফিরে আসাটা যে অলৌকিক পর্যায়ের ঘটনা, এটা বুঝবার মতো শিক্ষার অভাব! সংক্ষেপে বললেন, তা তো হতেই পারে! বাঘেরি কি বোকা কুকুর?

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলি, আর দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার ট্রেনটা এসে পড়বে। এবার আপনি উঠুন।

উনি খালি বোতলটা আমার টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, বিয়ারটা আমার উপার্জন। ভিক্ষা নয়! বাজি হেরে খাইয়েছ তুমি। ঠিক কিনা?

আমি বলি, নিশ্চিত! ভিক্ষা হতে যাবে কেন?

— ঠিক কথা! জীবনের এই পৌনে চার-কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে বেপ্পো কখনও কারও কাছে হাত পাতেনি! ঈশ্বর করুণাময় — তিনি আমাকে অরফান অবস্থায় ফুটপাথে ছেড়ে দিলেও মেরে ফেলেননি — তিনি আমাকে আনপড় বানিয়েও নিজের উপার্জনে বাঁচতে দিয়েছেন! গর্ব করে বলার মতো বেপ্পোর কিছুই নেই — তবু বল ভাই, একটা কথা সে মাথা খাড়া রেখে বলতে পারে: জীবনে বেপ্পো কখনও কারও কাছে হাত পাতেনি! ঠিক কিনা?

আমি বৃদ্ধের হাত দুটি তুলে নিয়ে বলি: সে-কথা একশবার!

পরের কথাটা বলতে বৃদ্ধের চোখদুটি অশ্রু-সজল হয়ে উঠল। বলি-বলি করেও কথাটা বলতে পারলেন না উনি। আমি বলি, আর কিছু বলবেন?

উপরে-নিচে মাথা ঝাঁকিয়ে উনি ইঙ্গিতে জানালেন — হ্যাঁ!

— কী? বলুন?

— আজ সেই বেপ্পো তোমার কাছে হাত পাতছে। ভিক্ষা চাইছে! দেবে?

আমি নিঃশব্দে হিপ্-পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করি। উনি আমার হাতটা চেপে ধরে বলেন, না, না, না! তা নয়!

— তবে?

— বাঘেরিকে! আর কটা দিনই বা বাঁচব আমি? বল? একটা সঙ্গী না হলে...

মীনার কথা, মীর্নার কথা মনে পড়ল না আমার। বললুম, ও যদি যেতে চায়!

— শ্যিওর! ও যদি না চায়, তবে নিশ্চয় নয়!

লাম্পো আপত্তি করলো না আদৌ! বৃদ্ধের পায়ে পায়ে চলে গেল এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। গাড়িটা এল। দাঁড়াল। বৃদ্ধ উঠে পড়লেন। বললেন, কী রে বাঘেরি? আসবি আমার সঙ্গে?

লাম্পো লাফ দিয়ে উঠল ট্রেনে। খোলা দরজার ওপারে তার বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল। সেই সামনের থাবার উপর থুতনিটা রেখে। জুল-জুল

নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললুম, লাম্পো! তাহলে সত্যিই চল্‌লি এবার?

ও ঘোঁ করল না। ল্যাজটা বার কয়েক নাড়ল শুধু।

কাচের অটোমেটিক দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্রেনটা ছাড়ল।

বাড়ি ফিরে আসতেই মীর্না বললে, লাম্পো?

আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললুম, তোকে একটা গল্প শোনাব মামণি।

মীনা ধমক দেয়, সারাদিন তেতে-পুড়ে এলে, এখনি গল্প কিসের? না, না, অত আদর দিয়ে মেয়ের মাথাটা খেও না তুমি।

আমি বলি, না মীনা। গল্পটা এখনই বলতে চাই। তুমিও শোন। গল্পটা শেষ না করে আমিও শান্তি পাব না। আশ্চর্য কাহিনী!

আদ্যোপান্ত গল্পটা শুনিয়ে আমি ওদের প্রশ্ন করি, কী বলছ? আমি ঠিক করিনি?

মীনা কিছু বলবার অবকাশ পেল না। তার আগেই মীর্না বলে উঠল, ঠিকই করেছ বাপি! আহা বেপ্পো বেচারির তো কেউ নেই। লাম্পোই ওর দেখভাল করুক।

— তোমার কষ্ট হবে না মামণি?

— কষ্ট কেন হবে? লাম্পো তো আবার ফিরে আসবে!

মীনা চোখের ইঙ্গিতে আমাকে বারণ করে।

এ বিদায় যে চির-বিদায় বোকা মেয়েটা তা বোঝেনি। থাক! সেটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করার এখনই কী দরকার? ভুলের স্বর্গেই বাস করুক ও!

ভুলের নরকে কিন্তু আমরাই দগ্ধাচ্ছিলুম এতদিন।

কারণ বছর না ঘুরতে সত্যই ফিরে এল লাম্পো। রোমের স্টেশন-স্টাফের কাছে খোঁজ নিতেই জানা গেল — 'বেপ্পো-দ্য-আর্টিস্ট'কে তারা অনেকেই চিনত। লোকটা ইদানীং চোখেও ভাল দেখতে পেত না। অথচ ভিক্ষাজীবী হতে সে নারাজ। বস্তুত অনাহারেই মারা গেছে সে। বার্ধক্যজনিত কারণও বলা যেতে পারে। বেপ্পোর মৃত্যুর পরেই লাম্পো ফিরে এল কাঁপিগলিয়া জংশনে।

মীর্না শুধু বললে, দেখলে তো? আমি ঠিকই বলেছিলুম! লাম্পো একদিন না একদিন ফিরে আসবেই!

মীনা বলে, এতদিনে বোঝা গেল ভিউ পয়েন্টে গেলে কেন ওর ভাবান্তর হত!

— কেন বলতো?

— হয়তো ঐ নাবিক ভদ্রলোকের ডিউটি পড়ত আপার ডেক-এ। হয়তো লাম্পো — মানে বাঘেরি সেই আপার ডেক থেকে সারাটা দিন নিষ্পলকনেত্রে সমুদ্রকে দেখত। সমুদ্রের সে রূপ সী-বীচ থেকে দেখা যায় না। তাকে দেখতে হলে সমুদ্র সমতল থেকে শতখানেক ফুট উঁচুতে উঠতে



হয় — দিগন্তবিলীন লবণাম্বুরাশির অশান্ত প্রশান্তি!

সাতটা বছর কেটে গেছে তারপর।

সাতটা শীত আর সাতটা বসন্ত।

অনেক অনেক কিছু বদলে গেছে ইতিমধ্যে। রেল-কোম্পানি থার্ড ক্লাস বগি তুলে দিয়েছে — শুধু ফার্স্ট আর সেকেন্ড। লোকো-শেডটা সম্প্রসারিত হয়েছে। সাইডিঙ লাইন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। লোয়ার-ক্লাস ওয়েটিং রুমে ফ্যান এসেছে। ম্যাগাজিন স্টলের সেই বুড়ি মারা গেছেন, এখন তাঁর ছেলে বসে সেই স্টলটায়। আমি এ·এস·এম· পদে উন্নীত হয়েছি। কানের পাশে জুলপিতে সাদা চক্‌খড়ি দিয়ে লেখা হয়েছে: সাত বছর কেটে গেছে লাম্পোর প্রথম আগমন মুহূর্ত থেকে। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের উত্তর প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ওয়াটার টাওয়ার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে মীর্নার। এখন সে বারো বছরের বেণীদোলানো কিশোরী। জানে 'ফলিং স্টার' আসলে 'মিটিয়রাইট' — মাধ্যাকর্ষণের পাল্লায় পড়া উল্কাপিণ্ড। পার্থিব আবহাওয়ার ঘর্ষণে জ্বলে ওঠা ওটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা — তার কাছে 'উইশ' করা ছেলেমানুষী।

না! সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে লাম্পোর। বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছে সে। ইদানীং সে ইতিউতি চক্কর মারতে যায় না আদৌ। চুপচাপ সারাদিন পড়ে থাকে আমার টেবিলের তলায়। এমন কি বেলা দুটো চল্লিশের রোম-টুরিন ডিল্যুক্স মেলটাও অ্যাটেন্ড করতে যায় না। হেড-কুক প্রত্যহ একটি প্যাকেট পাঠিয়ে দেয় আমার ঘরে। লাম্পো তার সমস্ত শক্তি জমিয়ে রাখে রাত নয়টার লোকাল ধরে কোনক্রমে পিয়োম্বিনো যাওয়ার এবং সকাল বেলার লোকাল ধরে এখানে ফিরে আসার জন্য। মীর্না, বলাবাহুল্য একা-একাই তার স্কুলে যায়।

তারিখটা ভুলিনি। ভোলা যায় না বলেই: বাইশে জুন উনিশ শ একষট্টি!

আমার ডিউটি খতম হল। কাউন্টার বন্ধ করবার আগেই লাম্পো উঠে পড়ল। আজকাল আর আমার পায়ে-পায়ে হাঁটতে পারে না। একটু পিছিয়ে পড়ে। তাই আমার উঠবার উপক্রম হলে সে আগে-ভাগেই রওনা হয়ে যায় — চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে। দিন তিনেক আগে সে নিজে নিজে ট্রেনে উঠতেও পারেনি। আমিই ওকে কোলে করে তুলেছিলাম। তাই ওর এই আগেভাগে রওনা হওয়াটা আমার পছন্দ নয়। কী জানি কখন পড়ে যায়। ঘর তালাবন্ধ করে আমিও চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে রওনা দিই।

ইতালির জুন মাসের এই তৃতীয় সপ্তাহে রাত পৌনে নয়টাতেও পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে লেগে থাকে বিদায়ী সূর্যের শেষ আভা। স্টেশনের আলো এখনও জ্বলে ওঠেনি। দূর থেকেই নজরে এল লোকাল ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

হঠাৎ একটা হৈচৈ। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক থেকেই শব্দটা আসছে। দ্রুতপদে সেদিকে এগিয়ে যাই। নজর হল সিগনালার লোকটা ছুটতে ছুটতে আমার দিকে আসছে। জিজ্ঞাসা করি, কী হয়েছে?

লোকটা দু'হাতে মুখটা ঢাকা দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, লাম্পো কাটা পড়েছে স্যার!



আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ি। কাটা পড়েছে! বেঁচে আছে তো? এক-পা অগ্রসর হতেই দ্বিতীয় একজন সহকর্মী আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, যেও না!

— যাব না! কেন?

— সে দৃশ্য দেখা যায় না!

কে একজন বললে, বড়-সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, আকাশিয়া গাছের তলায় ওকে কবর দিতে। উনি নিজে আসতে পারবেন না! মানে, পারছেন না!

ভিড় কাটিয়ে আমি ট্রেনটার দিকে এগিয়ে যাই। আমিও পারব না ওকে ঐ অবস্থায় দেখতে! কী হবে? হয়তো দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে সে। এমন সময় কেন ও হতভাগা লাইন ক্রস করতে গেল?

কে একজন বলল, না, না লাইন ক্রস করতে যায়নি। প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্ত বরাবর হেঁটেই আসছিল সে। হঠাৎ তার পিছনের পা-টা দুমড়ে যায়। আজকাল প্রায়ই এমন হত। পায়ে জোর পায় না বেচারি! ও ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। পড়ে যায় লাইনে। ঠিক তখনই ঢুকছিল ট্রেনটা। ড্রাইভারের কোন দোষ নেই। সে বেচারি···

বাকিটা শুনিনি। দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাই। বাঁ-দিকের জটলার দিকে তাকাই না। সেখানে অনেকে ভিড় করে আছে। মাঝখানে পড়ে আছে সাদা মতো কী একটা! রক্তের একটা ধারা! হেড-পোর্টার বললে, মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যেই কেউ কাটা পড়েছে!

সিগনালার বললে, তাই তো পড়েছে! ও তো আমাদেরই একজন!

রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে ড্রাইভার ইঞ্জিনরুমে উঠে যায়। উপায় নেই। সে হুকুমের চাকর। ট্রেন কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

লোকালটা পিয়োম্বিনোতে এসে পৌঁছল।

মীনা আর মীর্না আমাকে রিসিভ করতে এসেছে। ওদের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি ইতিমধ্যে টেলিফোনে দুঃসংবাদটা কেউ ওদের জানিয়েছে। মীর্নার চোখ দুটো পাকা আপেলের মতো লাল। আমার চোখে-চোখে তাকাতে পারছে না। মীনা এসে আমার হাত ধরল। আমরা চলতে শুরু করেছি এমন সময় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিন ড্রাইভার। মাথার টুপিটা খুলে মীনাকে একটা অভিবাদন করে বললে, আমি··· কী বলব··· মাদাম··· বিশ্বাস করুন···

মীনা ওর হাত টেনে নিয়ে কী একটা বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু!

লোকটা আমার দিকে ফিরে বলল, স্যার!···

ওর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললুম, তুমি ক্লান্ত আজ। যাও বাড়ি যাও। বিশ্রাম কর। লাম্পো বস্তুত জীবনের শেষ সীমায়···



কথাটা শেষ করতে পারি না।

মীর্না আমার হাত ধরে আকর্ষণ করে। বলে, তুমিও ভয়ানক ক্লান্ত বাপি। চল, বাড়ি চল।

আমি বললুম, কাল সকালে একটা মস্ত বড় ফুলের ব্যোকে নিয়ে···

— কালকের কথা কালকে হবে। এস দিকিনি এখন!

আমরা তিনজনে পায়ে পায়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে আসি। মীনা এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটছে। আমাদের দুজনের অবস্থা দেখে মীর্না আশ্চর্যভাবে সামলে নিল নিজেকে। আমাদের মাঝখানে এসে দু-হাতে দুজনের দুটি হাত ধরে হাঁটতে থাকে।

প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করার সময় পিয়োম্বিনোর এ·এস·এম· এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু একটা কথা বলবার আগেই মীর্না বলে ওঠে, প্লিজ, স্যার। সমবেদনা কালকের জন্য মুলতুবি রাখুন!

এ·এস·এম· বুঝলেন। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সামলে নিলেন নিজেকে। মাথার টুপিটা খুলে অভিবাদন করলেন শুধু!

এতক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্ল্যাটফর্মে আলো জ্বলে উঠেছে। রেলওয়ের এলাকাটা পার হয়ে আমরা এগিয়ে যাই পার্কিং জোনের দিকে। যেখানে রাখা আছে আমাদের গাড়িটা। হঠাৎ বড় রকমের একটা উল্কাপাত হল।

মীর্না আমাকে বললে, তুমি কিছু উইশ করলে না বাপি?

বুঝতে পারি সে প্রসঙ্গটা বদলাতে চায়। ম্লান হেসে বলি, ওটা তো একটা মিটিওরাইট!

— সো হোয়াট? সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে 'উইশ-করার' পোয়েটিক বিউটির কী সম্পর্ক?

এবার ওর চোখে চোখ রেখে বলি, এখন আর কী উইশ করব রে মা-মণি? অসম্ভব তো সম্ভব হবে না?

— কেন হবে না? মনে নেই পিনোক্কিও ছবির সেই অস্কার-বিজয়ী গানটা ঃ

"When you wish upon a star,
Makes no difference who you are
Whatever your heart desires
Would come to you"!

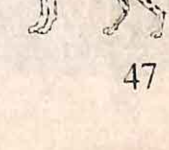
তারার পানে চাইবি যখন
চাইবি রে তোর প্রাণখুলে!
তুই কে? — সেটা তুচ্ছ তখন
যাস্‌নে যেন গান ভুলে!
তারার কাছে হাত পেতেছে যে, সে
পৌঁছে গেছে সব পেয়েছির দেশে॥

হঠাৎ ও এত প্রগল্‌ভ হয়ে পড়ল কেন? এই বেদনাঘন মুহূর্ত 'পিনোক্কিও' 'অস্কার' কি প্রাসঙ্গিক? আমি বলি, তুই উইশ করেছিস?

— আলবাৎ!

— কী?

ও হাসতে হাসতে বললে, স্বর্গে রেলওয়ে লাইন আছে কি না জানি না,

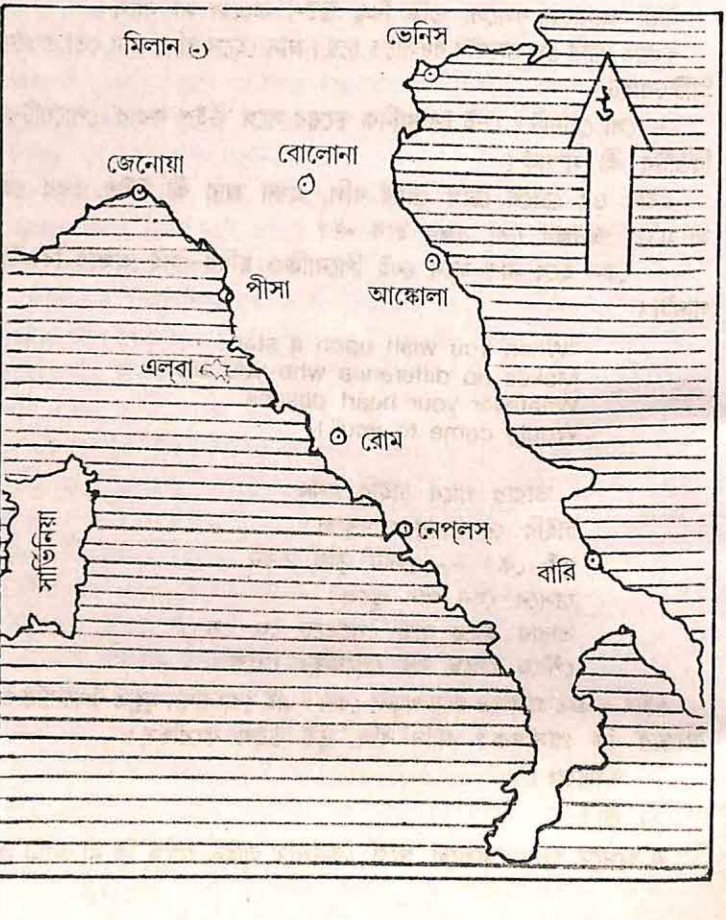


প্রার্থনা করেছি — থাকলে, লাম্পো যেন তার কম্যুটার চরিত্রটা অব্যাহত রাখতে পারে — আজকের দিনে এটাই আমার প্রার্থনা।

একটা গাড়ি পার্কিং জোন থেকে বেরিয়ে গেল। তার হেড-লাইটের আলোকপুচ্ছ সমস্ত এলাকাটাকে মুহূর্তের জন্য আলোকিত করল। সেই ক্ষণিক আলোয় খণ্ডমুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার বারো বছর বয়সের মা-মণির মুখটা। হাসতে হাসতে সে কথা বলছে বটে — কিন্তু তার দু-গালে দুটি বিগলিত ধারা।

হঠাৎ অনুভব করলুম — আমি যতটা ভেবেছি, আমার মীর্না, আমার মা-মণি, তার চেয়েও অনেক, অনেক বড় হয়ে গেছে। ফ্রক দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেবার বয়েস পার হয়েছে বলে এখন মা তার বাচ্চাকে ভোলাচ্ছে আনবান কথার জাল বুনে। ওর বুড়ো ছেলেটা যে বড় সেন্টিমেন্টাল — অল্পেই ভেঙে পড়ে! তাই এই অবান্তর 'অস্কার' প্রসঙ্গ, এই স্বর্গীয় রেললাইনের হাস্যকর উল্লেখ!

ওকে সান্ত্বনা দিতে আমি হো-হো করে হেসে উঠি! যদিও সেই মুহূর্তটিতে হু-হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল আমার!





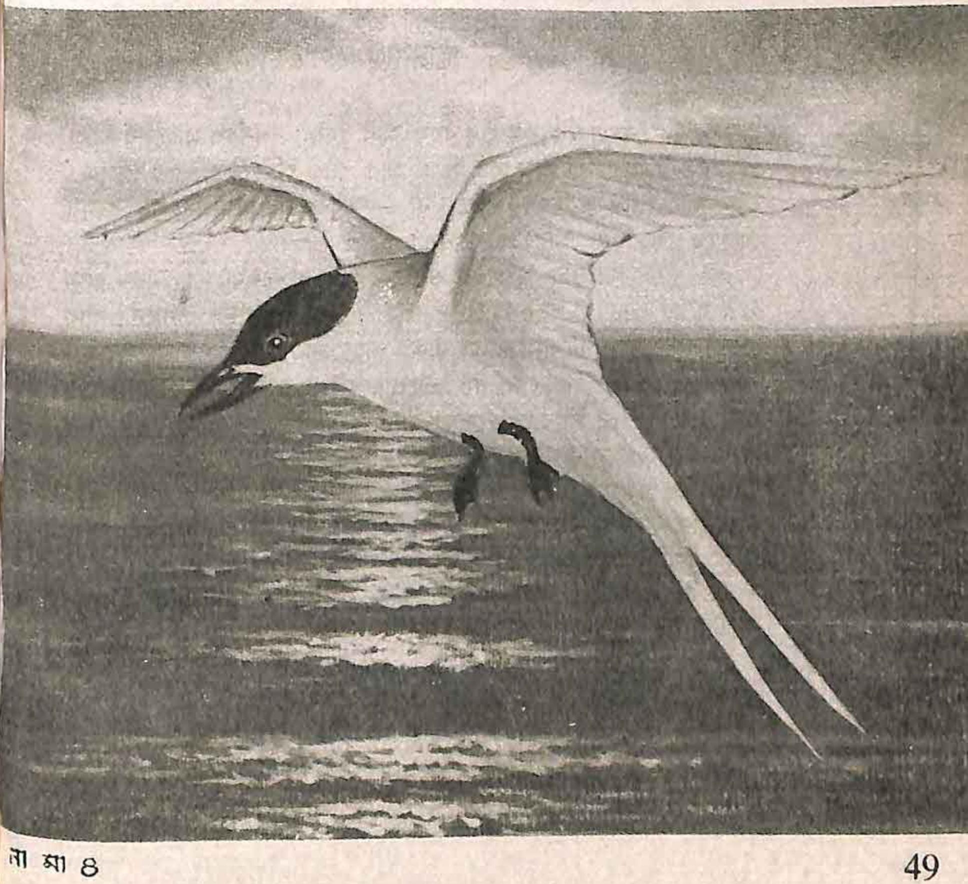
দিগন্তপ্রিয়

'দিগন্তপ্রিয়' কাহিনীর উপাদান বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা। তার ভিতর বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য — রীডার্স ডাইজেস্টে প্রকাশিত Jermy Lucas-এর লেখা The Longest Flight এবং Jack Cope-এর রচিত The Boy & the Swallow (Nov' 85) এ ছাড়া তথ্য সংগ্রহ করেছি National Geographic-এ প্রকাশিত (Aug' 79) Mysteries of Migration ; লেখক Allan C. Fisher Jv.

নীরন্ধ্র অমারাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। পুব-আকাশে একটা আলোর আভাস। তারাগুলো টুপ-টুপ করে ডুবে যাচ্ছে সেই আলোর বন্যায়।

ওর মনে হল আজই একটা কিছু হবে।

সন্ধ্যে রাত্রেই সেটা টের পেয়েছিল। ওর পেট-কোঁচড়ের তলায় যে



নীলচে সাদা নুড়িটুকু আছে তাতে একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ অনুভব করেছিল। সারারাত তাই ও ঘুমাতে পারেনি, ঢুলেছে শুধু। ওর সঙ্গী — ষোলো বছরের জীবনসঙ্গী ভোর রাতে বাসা ছেড়ে বার হয়ে গেছে। এখন ও একাই — না! একা নয়, ওর পেটের নিচে ওমে-ওমে আছে আরও একজন!

হ্যাঁ, একটিই! ওদের একবারে একটিমাত্র ডিম হয়, পেঙ্গুইনের মতো।

ঠিক তখনই ফিরে এল দৃঢ়পক্ষ। ওর সঙ্গী। মাপে ফেনশুভ্রার মতোই — ঠোঁটের ডগা থেকে লেজের শেষপ্রান্ত চল্লিশ সেন্টিমিটার, মানে ইঞ্চি-দশেক। তার ভিতর লেজটাই আধা-আধি। ফিঙে বা সোয়ালোর মতো সেটা দুভাগ করা। ঠোঁটে সিঁদুর-রঙা লিপ্‌স্টিক, পায়ে টুকটুকে আলতা পরানো। নরম তুলতুলে দেহটা দুধ-সাদা, শুধু মাথার উপর একটা বাহারে কালো মখমলের টুপি।

দৃঢ়পক্ষ ভোর রাতে গিয়েছিল মাছের সন্ধানে। খেয়েছে। মুখে করে নিয়েও এসেছে একটা আধমরা স্কুইড। সঙ্গিনীর সামনে সেটা নামিয়ে রাখে। ফেনশুভ্রা উঠে এল, তারিয়ে-তারিয়ে সেটাকে খেতে শুরু করে। গিন্নি উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্তা বসে যায় 'তা' দিতে।

ওদের পালা করে তা দিতে হয়। উপায় নেই। বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্যের চেয়ে দশ-পনের ডিগ্রি নিচে। হবে না? কালটা যদিও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, স্থানটা আটাত্তর ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। গ্রীনল্যান্ডের উত্তর-সীমানায়।

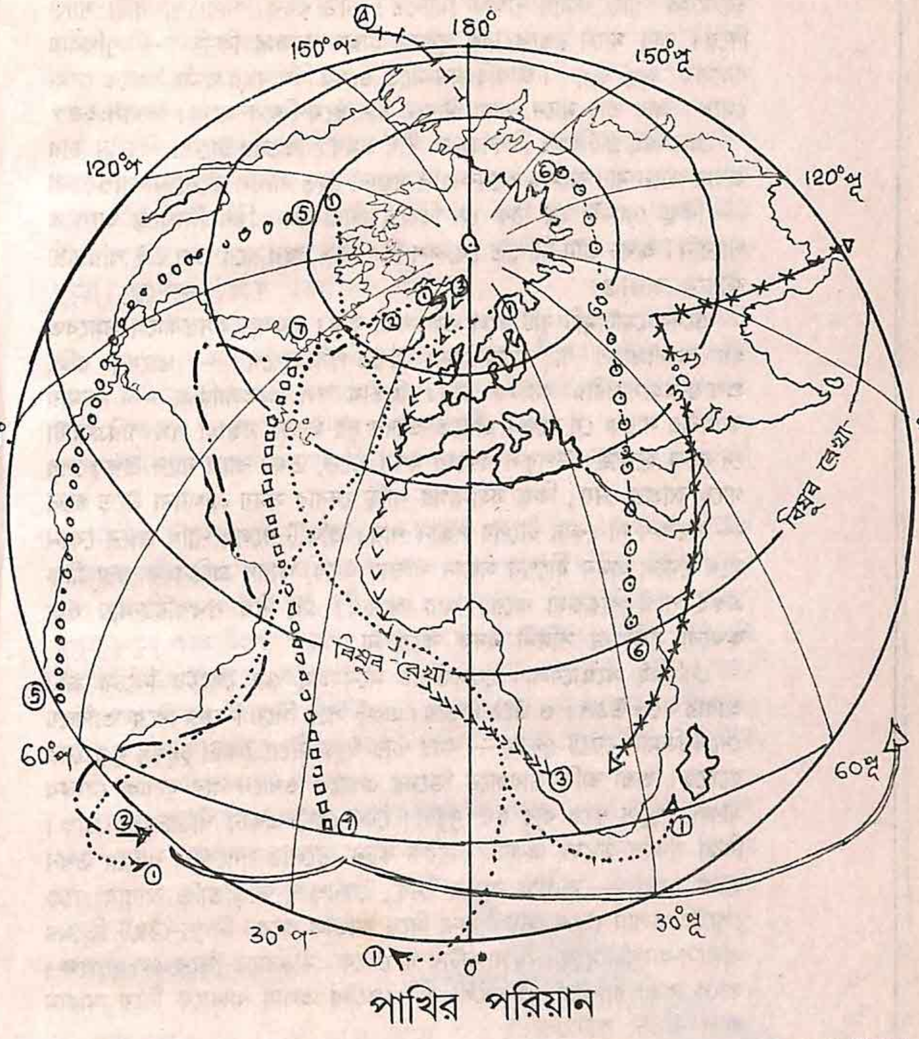
দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত শুধু বরফ আর বরফ। দশ-বিশ মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই। সাদা-ভালুক, সীল আর মেরু-হরিণদের খাশ তালুক। পাইন-ফার পর্যন্ত এ দিগড়ে ভেড়ে না — সবুজাভার ক্ষীণ চিহ্নটুকু বজায় রেখেছে কিছু মস্‌ আর লাইকেন্‌স্‌।

এই তুষারাবৃত মেরু-অঞ্চলেই ওদের বার্ষিক বাসরশয্যা। দশ-বিশ লক্ষ বছর ধরে। আঠারো বছর আগে দৃঢ়পক্ষ নিজেও জন্মেছিল এখানে। আর ষোলো বছর ধরে বারে বারে এই একই পাহাড়ের একই ফোকরে পেতেছে তার বাসর শয্যা। শুধু বাসা নয়, ভালোবাসাটাও ওদের একমুখী! ষোলো বছর আগে বিয়ে করেছিল ফেনশুভ্রাকে। তারপর ষোলোটি বছর ধরে তারসঙ্গেই এখানে কাটিয়ে গেছে বরফ ঠাণ্ডা ষোলটি গ্রীষ্মাবকাশ।

ভুগোল বইতে নামটা খুঁজে পেতে পারেন — ব্যাফিন বে! তার পশ্চিমে কানাডার এক্তিয়ারভুক্ত ব্যাফিন-দ্বীপ, পূবে গ্রীনল্যান্ড। ঘন নীল বরফ-গলা সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে গ্র্যানাইট পাহাড়। তার গায়ে মৌ-কোষের মতো ছোট ছোট ফোকর। প্রতিটি ফোকরে ওদের একজোড়া স্বজাতি — আর্টিক টার্ন।

আজব চিড়িয়া!

জলচর, স্থলচর, নভোচর — যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে পরিযায়ক হিসাবে নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানাধিকারী! অন্য কোন জীব যে তার রেকর্ড কোন দিন স্পর্শ করবে তার আশঙ্কা কম! কারণ এ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী



পাখির পরিযান

1. আর্টিক টার্ন ....
2. আর্টিক স্কুয়া —·—·—·
3. সোয়ালো >>>>>>>>>>>
4. গোল্ডেন প্লভার ++++++++
5. প্লভার ++++++++++
6. সাইবেরিয়ান ওয়ার্বলার -⊙-⊙-⊙
7. গ্রেট শীয়ারওয়াটার ▫▫▫▫
8. লেসার কাককু ******

হচ্ছে পক্ষীকূলের শিয়ারওয়াটার। বছরে সে সর্বোচ্চ দশ হাজার কি· মি· যায়। আর্টিক টার্ন-এর বিচরণ ক্ষেত্র সে তুলনায় ত্রিশ হাজার কি·মি· পর্যন্ত! ওদের জন্ম উত্তর মেরুবলয়ের কাছে-পিঠে; আর শীতাবকাশ কাটাতে অনেকেই পাড়ি জমায় দক্ষিণ মেরুতে! প্রতি বছর! সারা পৃথিবীটা পাড়ি দিয়ে। তার মানে বছরে ত্রিশ দুকুনে চল্লিশ হাজার কি·মি· — পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ গুণ ! জীববিজ্ঞান-মতে ওদের ত্রিশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে। আর তার মানে, সারা জীবনে চাঁদ ছুঁয়ে ফিরে আসা! বিশ্বাস হয়?

কেন এই ক্লান্তিকর বিপদজনক দীর্ঘ ভ্রমণ? কিসের টানে? বিজ্ঞান তার জবাব জানে না। অনেক অনেকগুলি সম্ভাব্য হেতু দাখিল করেছেন পণ্ডিতেরা — কিন্তু কোনটা যে ঠিক সে বিষয়ে জীববিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অথচ এটা নিশ্চিত যে, দশ-বিশ লক্ষ বছর ধরে ওরা এই পরিযায়ী জীবনে অভ্যস্ত।

ওদের মোটামুটি দুটি দলে ভাগ করা যায়। একদল বসন্তকালে সমবেত হয় আলাস্কাতে বা আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে — তাদের বলি, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় আর্টিক টার্ন। দ্বিতীয় দল অতলান্তিক — আমার কাহিনীর নায়ক যে দলে। ছবিতে ওদের দুই দলের সম্ভাব্য পথ-পরিক্রমাটা দেখানো হয়েছে। উপকূল বরাবর যখন ওড়ে, তখন বারে বারে উপকূলের গাছে আশ্রয় নেয়; কিন্তু মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় একটানা উড়ে চলে — যতক্ষণ না কোন দ্বীপের সন্ধান পায়। প্রতিটি দলের পাখি জানে কোন মুখে গেলে এমন দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যাবে, কারণ প্রতিবছর ওরা ঠিক একই পথে পরিক্রমা করে! আর আশ্চর্য! এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ওরা কখনো সঙ্গী বা সঙ্গিনী বদল করে না!

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। ফেনশুভ্রার মনে হল ওর পেটের নিচের ওটা আবার নড়ে উঠল। ও উঠে দাঁড়ায়। একটু সরে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে ডিমটা ফেটে গেছে — আর তাঁর ফাঁক দিয়ে একটা চুন্নুমুন্নু মুণ্ডু বের হয়েছে। শুভ্রা অতি সাবধানে ডিমের এখানে ওখানে বার-দুয়েক ঠোকর মারল। পুটুস্ করে বার হয় দুষ্টুটা! যেন ছোট্ট একটা পাউডারের পাফ্। কিম্বা পঞ্চাশ গ্রামের একটি 'বোরিক কটন' তুলোর প্যাকেট। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা — দৃঢ়পক্ষ বাসায় নেই; ফেনশুভ্রা তাড়াতাড়ি আবার ওকে পেটের তলায় টেনে নেয়। ডানা দিয়ে আড়াল করে। নিপুণ-ঠোঁটে ডিমের নাল্‌সে-অংশটা মুছে নেয় বাচ্চাটার গা থেকে। মাঝরাতে ফিরে এল দৃঢ়পক্ষ। তাকে শুভ্রা ব্যাপারটা জানালো না। পেটের তলায় বাচ্চাকে নিয়ে আরাম করে রাতটা কাটালো।

ভোররাতে যথারীতি শোনা গেল — কী-অ! কী-অ! ক্ঈ-অ!

কমনখুড়োর নিত্যনৈমিত্তিক আহ্বান। ভোর রাতে বুড়োটা আসে দৃঢ়পক্ষকে ডেকে তুলতে। কমনখুড়োর অনেক বয়স। সে আর্টিক-টার্ন নয়। টার্নই, তবে সাধারণ টার্ন। ওরা গোটা পৃথিবী পাড়ি দেয় না। তবে ওরাও পরিযায়ী। আজ ছয়বছর সে আছে দৃঢ়পক্ষের সঙ্গে। কীভাবে ভাব হয়েছিল তা দুজনেই ভুলে গেছে; কিন্তু প্রতিবছরই সে ভাইপো আর তার বউ-এর

সঙ্গে গ্রীষ্মান্তে দক্ষিণপানে যায়। ওর দৌড় বিষুবরেখার কাছ বরাবর। সেখানে তাকে পৌঁছে দিয়ে ওরা কর্তা-গিন্নি চলে যায় দক্ষিণ মেরুর দিকে। আর ফেরার পথে — আশ্চর্য, ঠিক চিনে নেয় যে জলাটার কাছে কমনখুড়ো শীতকালীন অস্থায়ী বাসা বেঁধেছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে এই গ্রীনল্যান্ডের জনমানবহীন প্রান্তরে। কমনখুড়োর বয়স অনেক, প্রজনন-ক্ষমতা নেই। তাই তার সঙ্গিনীও নেই এখন। নিতান্ত অভ্যাসবশে সে এই দম্পতির সহগমন করে।

খুড়োর ডাক শুনে দৃঢ়পক্ষের ঘুম ভেঙে যায়। বাসা ছাড়বার উপক্রম করতেই শুভ্রা ওকে একটা ঠোকর মারল। দৃঢ়পক্ষ একটু অবাক হল — এর মানে কী? গিন্নির দিকে নজর করতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। শুভ্রা একটু সরে বসেছে, আর তার পেটের তলা থেকে পুট্‌পুট্‌ করে তাকিয়ে আছে দুষ্টুটা। দৃঢ়পক্ষ ডেকে উঠল — কীঈ-অ!

খুড়ো বাইরে চক্রাকারে পাক খাচ্ছিল। আকাশে। এ ডাক শুনে ঘনিয়ে এল। বুঝল — বাসার ভিতরে কিছু একটা ঘটেছে! কী আর ঘটবে? বাচ্চাটা নিশ্চয় ডিম ফুটে বার হয়ে এসেছে! খুড়ো বাসার ভিতরে এল। ঘন অন্ধকার, তবুও দেখতে পেল বাচ্চাটাকে। সেও খুশি হল।

সেদিন সূর্যোদয়ের আগেই ফিরে এল দৃঢ়পক্ষ। তার মুখে ছোট্ট একটা মাছ!

মায়ের গায়ের ওমে খোকন এতক্ষণে বেশ সুস্থ হয়েছে। ডিমের তরল-অংশটা গা থেকে শুকিয়েও গেছে। এতক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। বার দুই তার ছোট্ট ডানা দুটি নেড়ে দেখেছে। কিন্তু হাঁটতে গেলেই ঢুপুস্‌-ঢুপুস্‌ করে উল্টে পড়ছে। শুভ্রা ওকে টেনে তুলছে না — বাচ্চাটা নিজেই উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর বাসার ইতিউতি ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করছে। শুভ্রা শুধু বাসার সামনের দিকটা তার দেহ দিয়ে আড়াল করে রেখেছে; যাতে খোকন না বাইরে বেরিয়ে যায়। এখনো সে উড়তে শেখেনি। সেদিকে খাড়া খাদ সমুদ্রতলের উপর।

দৃঢ়পক্ষের ঠোঁট থেকে মরা মাছটা টেনে নিল শুভ্রা। খেল না কিন্তু। তার পিঠ থেকে একটুকরো মাংস খুবলে নিয়ে ছোট-ছোট টুকরো বানালো। তারপর নিপুণ ঠোঁটে বাড়িয়ে ধরল খোকনের দিকে।

বুদ্ধুর বেহুদ্দটা তবুও বোঝে না।

শুভ্রা তখন ওর মুখের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দিল ছোট্ট মাংসের টুকরোটা। এতক্ষণে বুঝল। কোঁৎ করে গিলে ফেলল। মাংসের স্বাদ পেতেই চঞ্চল হয়ে উঠল বাচ্চাটা।



তারপর নিজেই কুটুর কুটুর করে খেতে শুরু করল!

সপ্তাহ-দুয়েকের মধ্যেই বাচ্চাটার চেহারায় দারুণ পরিবর্তন হল। জন্মের সময় ওর পিঠে, মাথায় ছিল কালো ছোপ-ছোপ দাগ। লেজ প্রায় ছিলই না। দেখে চেনাই যাচ্ছিল না — বেটা আর্টিক টার্ন-এর বাচ্চা। এ কয়দিনে চেহারাটা বেশ বদলেছে। পিঠের ছিটে-ফোঁটা দাগগুলো মিলিয়ে গেছে, মাথায় ফুটে উঠতে শুরু করেছে প্রকৃতিদত্ত টুপিটার আভাস।

আজকাল এক-আধটু উড়তেও পারছে। প্রথম-প্রথম তার ভারী আপত্তি ছিল গতর নাড়ানোর ব্যাপারে। কী দরকার ওসব ফালতু হুজ্জোতের? বাপি-ই তো রোজ একটা করে মাছ নিয়ে আসতে পারে মুখে করে? আর মায়ের কী-ই বা এমন কাজ? সে পারে না ছোট-ছোট টুকরো বানিয়ে ওর মুখের কাছে কাগের-দলা, বগের দলা বাড়িয়ে ধরতে?

শুভ্রা পাত্তাই দেয় না। খোকনের আগেও সে আটবার মা হয়েছে। জানে, এসব আদিখ্যেতা একদম বরদাস্ত করতে নেই। প্রতিবারই এক ব্যাপার! খোকনকে ঘাড়ে ধরে বাধ্য করা! 'বাবা-বাছা, একটু গতর নাড়াও না কেন লক্ষ্মিটি?' — এসব বললে আর শুনবে না। গ্রীনল্যান্ডের গ্রীষ্মকাল ক্ষণস্থায়ী — একবার ডুব মারলে সূয্যিঠাকুর ছয়মাসের জন্য না-পাত্তা। সূয্যিঠাকুর সমুদ্রস্নানের উদ্যোগ করার আগেই ওদের রওনা হতে হবে। তার আগে তো খোকনকে তৈরী করে নিতে হবে? দৈহিক এবং মানসিক। প্রথমবারের যাত্রাটাই সবচেয়ে বিপদজনক। দেখেছে তো? ওর নিজেরই আটটা ছানা-পোনার মধ্যে গোটা তিনেক খোয়া গেছে প্রথম পরিযানে। শত্রু কি কম? সী-গাল, স্কুয়া, ফ্যালকন! ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র! দৈহিক ক্লান্তি তো আছেই!

একদিন অনাহারে থেকেই খোকন মতটা পালটানো! সে উড়তে রাজী! নিজেই যাবে মাছ ধরতে 'ক্ষীরনদী' নয়, নর্থ সীর কূলে! দৃঢ়পক্ষ আর শুভ্রা ওর দুদিকে গিয়ে বসল। আর আচমকা কমনখুড়ো দিল এক ঠেলা।

'— কীক্' করে একটা চিৎকার করে উঠেছিল খোকন, খাড়া পড়তে পড়তে। তারপর ওর নিজের অজান্তেই খুলে গেল ছোট্ট দুটি ডানা। আর পড়ছে না। ভাসছে! নিচে — অনেক নিচে নীল সমুদ্রের উপর সাদা ফেনা; উপরে গাঢ় নীল আকাশ! তার মাঝখানে একমুঠো মুক্ত প্রাণ! কী আনন্দ!

বাবা-মা আর দাদু ক্রমাগত ওকে ঘিরে ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে। জোরে, আরও জোরে ডানা-জোড়া নাড়ছে খোকন — কিন্তু ওদের মতো স্থির হয়ে বাতাসে ভাসতে পারছে না — গ্লাইডিংটা এখনো অভ্যাস হয়নি। তা প্রথমদিনেই কি সবটা হয়? বেশ একটা চক্কর দিয়ে ওরা চারজনে বাসায় ফিরে এল।

ঐ প্রথম দিনটাই। তারপর ওর ভয় ভেঙে গেল। কারণে-অকারণে দৃঢ়পক্ষ খোকনকে নিয়ে আকাশে ওড়ে। দূরে — আরও দূরে উড়ে যায়। উপরে আরও উপরে — যেন আকাশটাকে ছুঁয়ে আসবে। এ খেলায় খোকনও মজা পায়। সে এখনো জানে না — এটা খেলা নয় আদৌ। বাপ তাকে জীবনের পাঠ দিচ্ছে। সামনেই ওর পরীক্ষা। আর সে পরীক্ষায় ফেল

হওয়া মানে মুছে যাওয়া দুনিয়া থেকে।

আরও হপ্তাখানেক পরে মাঝরাতে আকাশে দেখা দিল সাত-রঙা বিদ্যুতের ঝিলিক। হ্যাঁ, সপ্তবর্ণা-বিদ্যুৎ!

খোকন অবাক হয়ে গেল। ওটা কী?

কী — তা ওর বাপিও জানে না, শুধু জানে, ঐটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক ইঙ্গিত — এবার রওনা হতে হবে!

: অরোরা বোরিয়ালিস্!

গ্রীনল্যান্ডের ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্ম এবার শেষ হয়ে এল!

গ্র্যানাইট পাহাড়ের খোপে-খোপে এখন চঞ্চলতা। রোজই এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে শোনা যায়: 'কী-আহ্! কী-আহ্!' ওরা একে একে রওনা হয়ে পড়ছে — চলেছে আপাতত বিষুবরেখার দিকে, দখিন পানে। যাবার আগে ওরা ডাক দিয়ে যায় — যারা এখনো যাত্রা শুরু করেনি তাদের শেষ-সঙ্কেত দিয়ে যায়: কী-আ! কী-আ!

— এস, তোমরাও এস! আর দেরী কর না!

মরাল বা ফ্লেমিংগোর মতো ওরা এক দলে কয়েক শ বা কয়েক হাজার থাকে না। এক-একটি ছোট দলে চার থেকে ছয় জন। কিন্তু এ-দল ও-দলের মধ্যে দূরত্ব কয়েকশ মিটার। যেন কেদারবদ্রীর তীর্থযাত্রী। এ-দলে ও-দলে দেখা হলেই হাঁক পাড়ে: জয় বদ্রীবিশাল!

ওদের ভাষায়: কী-আ! কী-আ!

শুভ্রা ইতিপূর্বে এমন সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে বার-আষ্টেক রওনা হয়েছে। সে জানে, প্রথম যাত্রাটাই সবচেয়ে বিপদজনক, সবচেয়ে মারাত্মক। শুভ্রার তিনটি সন্তান খোয়া গেছে এই প্রথম অভিযানেই। বাকি পাঁচটির কে যে কোথায় আছে — জানে না। দেখলেও চিনতে পারবে না, আজ। জীবনের প্রথম বছরটাই ওরা শুধু বাপ-মায়ের। তার পরেরগুলো তারা প্রজাতির।

ওরা সাবালক হয় দ্বিতীয় বছরে। তাই বাপ-মায়ের ডানা-ধরে পৃথিবীটা পাড়ি দেয় দেড়-বার। প্রথমবার যাতায়াত, আর দ্বিতীয়বার একপিঠে শুধু যাওয়া।

ফেরার পথে সে আর বাপ-মায়ের নয়, প্রজাতির। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সহযাত্রী। বাপ-মা দোষ ধরে না: 'আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর।'

দ্বিতীয়বার দক্ষিণ-গোলার্ধে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে এসে ওরা জীবনসাথী বেছে নেয় — ঐ একবারই। ওদের ধর্মে 'ব্যভিচার' বা 'বিবাহবিচ্ছেদ' না-মঞ্জুর। ধর্ম বলতে 'জীবনধর্ম'। ওদের বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য, আমৃত্যু।

কিন্তু আমার কথাটা খেয়াল করেছেন তো? আমি 'শীতাবকাশ' বলিনি কিন্তু। এটাই হচ্ছে আর্টিক টার্ন-এর দু-নম্বর বিশ্বরেকর্ড। পনের বিশ বছর ওরা বাঁচে; কিন্তু জানে না — 'শীতকাল' কাকে বলে।

'শীত'কে চেনে। 'শীতকাল' নয়। ওরা আইসবার্গ দেখেছে, আর্টিক সীল দেখেছে, অ্যান্টার্টিক পেঙ্গুইন দেখেছে! অরোরা বোরিয়ালিস্ আর অরোরা অস্ট্রালিস্ দুটোই দেখে বছর-বছর, যা জীবনে মাত্র এক-একবার দেখেছিলেন অ্যামুন্ডসন বা স্কট — যা দেখে না অন্য কোন জীব (এটা ওদের তিন-নম্বর



বিশ্বরেকর্ড) — কিন্তু 'শীতকাল' চেনে না! সূয্যিঠাকুর যখন কর্কটক্রান্তি পাড়ায় ওরা তখন উত্তর-গোলার্ধে ; আর যেই তিনি বিষুববলয় পাড়ি দিয়ে মকরক্রান্তি-রেখা-মুখো, অমনি ওরাও রওনা দেয় দক্ষিণ-গোলার্ধে !

শীতকাল ওদের নাগাল পায় না।

খুড়ো একদিন বললে, কী — আহ্?

দৃঢ়পক্ষ বুঝল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তারও নজর হয়েছে। মাঝে-মাঝে সমুদ্রের ঢেউ সূয্যিঠাকুরকে ভিজিয়ে দিতে চাইছে। সূয্যি তো ডোবে না, যখন ওরা বাসরশয্যা পাততে এদেশে আসে। আকাশেই পাক মারে দিগবলয়ের কাছাকাছি। এবার সে ডুববে — একটানা ছয়মাসের জন্য। তার আগেই রওনা দিতে হবে। ওরা তিনজনে তৈরী হয়ে নিল। তিনজনেরই বসন্তকালীন নতুন পালক গজিয়েছে। আশ্চর্য! খোকনকে এই জটিল অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে হল না। সে নিজে থেকেই সম্‌ঝে নিল। ওর ছোট্ট মস্তিষ্কে অন্তর্লীন জেনেটিক-কোডে, পলিপেপ্টিড্-শৃঙ্খলের বিন্যাসছন্দে অমোঘ-নির্দেশটা খোদাই করা আছে; জন্মগত সংস্কার।

যেতে হবে দখিন-পানে!

সে বিষুবরেখা চেনে না, দেখেনি দক্ষিণমেরু — কিন্তু নির্দেশটা অমোঘ! দক্ষিণদিকটা চেনে!

তাই বাপের ডাক শুনেই সে একপায়ে খাড়া!

ভোর-ভোর রওনা হয়ে পড়ল ওরা চারজন। সেটা ঘোর অমাবস্যা তিথি। অমাবস্যা তিথিটাই কেন বেছে নিল? তা আপনারা কেমন করে বুঝবেন? সে এক জটিল গণিতজ্যোতিষের অঙ্ক! ওরা জানে!

যারা এখনও গড়িমসি করছে — গ্র্যানাইট মৌ-কোষের সেই অলস-বাসিন্দাদের অভ্যাসবশে জানান দিয়ে গেল; আমরা রওনা দিলাম কিন্তু: কী — আহ্!

গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণ চরণমূলে পৌঁছাতে সময় লাগল পুরো দুই সপ্তাহ। এটা জানা ছিল দৃঢ়পক্ষের। আর তাই ও রওনা দিয়েছে ঘোর অমাবস্যায়। এবার যেতে হবে পুবমুখো — নর্থসী পাড়ি দিতে। ভরা পূর্ণিমায়। খোকন এতদিনে সাবালক — ভয় নেই কিছু। আর তাছাড়া নর্থসীর কোথায় কোথায় আছে ছোট ছোট দ্বীপ তা ওরা তিনজনেই ভালো রকম জানে। একটানা পাড়ি দিতে হবে না।

অচিরেই ওরা এসে উপনীত হল স্কটল্যান্ডের উত্তর সীমানায়। আইসল্যান্ড, জেটল্যান্ড, অর্কনেতে বিশ্রাম নিতে নিতে। দিনের বেলাতেই উড়েছে বেশি, সূর্যাস্ত হলেও ভয় নেই — রাতগুলো পূর্ণিমায় কাছাকাছি।

এখন আর আপাতত সমুদ্র নেই। ডাঙায়-ডাঙায়। গোটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জটা পাড়ি দিতে হবে। চেস্টারফিল্ডের কাছাকাছি বিজন প্রান্তরের মাঝখানে একটা পরিত্যক্ত গথিক-গীর্জা ফেনশুভ্রার ভারী পছন্দসই হল্টিং স্টেশন। প্রতিবারেই যাতায়াতের পথে ওরা ঐ গীর্জার ঘণ্টাঘরে দু-একটা রাত কাটিয়ে যায়। জনবসতি নেই সেখানে। দুধারে যোজনবিস্তৃত



ড্যাফোডিল আর সূর্যমুখী বছরের এসময় ফুলে-ফুলে ভরা থাকে। এবার সেখানে পৌঁছে দৃঢ়পক্ষ কেমন যেন থমকে গেল। গোটা ভূগোলটাই পাল্টে গেছে। সেই তৃণাচ্ছাদিত ঘনসবুজ কার্পেটটা গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফুলের চিহ্নমাত্র নেই! তার বদলে ইট-কাঠ আর কংক্রিটের চাংক। গড়ে উঠেছে একটা কারখানা। এক বছরের মধ্যেই! নির্মেঘ নীল আকাশটার কপালে চিম্‌নির কালো ধোঁয়ার কলঙ্করেখা। পাখির কাকলীস্তব্ধ; তার বদলে যান্ত্রিক বিকট শব্দ!

তবে চার্চটা আছে। ওরা চারজনে সেই সুউচ্চ ঘণ্টাঘরের কুলুঙ্গিতে আশ্রয় নিল।

এলাকাটা আমূল বদলে গেছে। পরিচিত দিক্‌চিহ্নগুলি না-পাত্তা। সেই প্রকাণ্ড বড় এল্‌ম্ গাছটা নেই, দিঘীটা বুঁজিয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে-ওখানে শুধু বাড়ি আর বাড়ি! ওভারহেড ওয়াটার-টাওয়ার আর হাই-টেনশন লাইনের স্টীল পাইলন!

দৃঢ়পক্ষ স্থির করল — এখানে দু-চারদিন থেকে যাবে। নূতন দিক্‌চিহ্নগুলি স্মৃতিপটের ক্যানভাসে এঁকে নিতে হবে। না হলে ফেরার পথে রাস্তা গুলিয়ে যাবে। চিহ্নিত পথরেখা খুঁজে পাবে না।

তাছাড়া খোকনেরও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন। বয়স অনুপাতে একটানা অনেকটা উড়ে এসেছে। তাকে গীর্জার ঘণ্টাঘরে রেখে ওরা সকাল-বিকাল শহরটা টহল দিয়ে ফেরে। সব কিছু চিনে নেয়। বাসায় ফিরে আসার সময় ঠোঁটে করে নিয়ে আসে মরা-মাছ অথবা ব্যাঙ। ধেড়ে-খোকা তাতে মহা খুশি! গতর না নাড়িয়ে কাগের-দলা, বগের-দলা খাওয়ায় তার খুবই আগ্রহ!

তারপর একদিন!



ওরা বাসায় ফিরে এসে দেখে ঘণ্টাঘরটা খালি!

তখন সন্ধ্যা হব-হব। ওরা প্রথমে ভেবেছিল একনাগাড়ে বসে থাকতে থাকতে খোকন বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল — তাই বিকাল নাগাদ কাছে-পিঠে কোথাও চরতে গেছে; এখনি ফিরবে। ফিরল না। সারাটা রাত! উৎকণ্ঠিত তিন পরিযায়ী তামাম রাত গায়ে-গা ঠেকিয়ে জেগে বসে রইল।

ভোরের আলো না ফুটতেই খুড়ো-ভাইপো খুঁজতে বার হল। ফেনশুভ্রা নিশ্চুপ বসে রইল ঘণ্টাঘরে। ইতিমধ্যে যদি খোকন ফিরে আসে। এল না। সারাটা দিন ব্যর্থ অন্বেষণ করে সন্ধ্যাবেলায় দুই ক্লান্ত বিহঙ্গ ফিরে এল বাসায়।

দৃঢ়পক্ষ চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না সন্তানহারা জননীর দিকে। সে সারা দিন মুখে কুটোটি কাটেনি!

পরের দিন ফেনশুভ্রা নিজেও বার হল ওদের সঙ্গে। সে দিনটাও ওরা খোঁজাখুঁজি করল। খোকনের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেতে পারে সে? কেনই বা যাবে? গেলেও ফিরে আসবে তো? আসছে না কেন? তবে কি…

আর ভাবতে পারে না শুভ্রা!

তৃতীয়দিনে ঘটল একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা।

ফেনশুভ্রাই তার জন্য দায়ী। সে কেন নির্বোধের মতো…

না! ভুল হল! দায়ী ফেনশুভ্রা নয়, দায়ী তার মাতৃস্নেহ!

পার্বত্য নদীটাতে বাঁধ দিয়ে রূপায়িত হয়েছে একটা নতুন জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা। তাই শহরের কয়েক কিলোমিটার উত্তরে দেখা দিয়েছে একটা কৃত্রিম হ্রদ। অনেক পাখি এসে জুটেছে সেখানে — পিন্‌টেল, টীল, স্যান্ড-পাইপার, স্নাইপ, হাঁস। হঠাৎ ওদের নজর হল সেখানে বন্দুকঘাড়ে দুই শিকারী স্নাইপ শিকার করছে। 'বন্দুক' জিনিসটা যে কী, তা ওরা তিনজনেই ভালরকম চেনে — সারা পৃথিবী ঘোরে তো! সূর্যালোকে বন্দুকের নলটা চিক্‌চিক করে ওঠামাত্র কমন খুড়ো ডেকে উঠ্‌ল: কী-কী-কির্‌রে…

এ ডাক সব জাতের পাখিই চেনে — বিপদসূচক সাবধানবাণী!

দৃঢ়পক্ষও যেন প্রতিধ্বনি করে ওরে: কির্‌রে! কির্‌রে!

এক ঝাঁক হুইস্‌লিং টীল সে ডাক শুনে উঠে পড়ল আকাশে। দৃঢ়পক্ষ আর তার খুড়ো দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে উঠে গেল আকাশে। সোজা সূর্যের দিকে। ওরা জানে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বন্দুকের টিপ্‌ করা শক্ত!

কিন্তু কী-জানি-কেন খণ্ডমুহূর্তের জন্য সবকিছু ভুল হয়ে গেল ফেনশুভ্রার। আত্মরক্ষার জৈবিক প্রেরণাকে গ্রাস করল ওর মাতৃহৃদয়। ঐ দুজন শিকারীর পিছন-পিছন আসছিল একজন। তার হাতে দড়ি দিয়ে ঝোলানো এক গাদা মরা স্নাইপ! খুড়োর সাবধানবাণীটা ও ঠিকই শুনেছে; কিন্তু সদ্য-সন্তানহারার হঠাৎ মনে হল — ঐ স্নিপেট-গুচ্ছের মধ্যে রয়েছে ওর খোকনসোনা!

না ভেবেচিন্তেই ডানা দুটি বন্ধ করেছে ফেনশুভ্রা।

সোজা নেমে এসেছে ঐ মরা-পাখিগুলোর দিকে।



শব্দটা সে শোনেনি — বন্দুকের শব্দটা। কারণ শব্দতরঙ্গের চেয়েও দ্রুতবেগে ওর দিকে ছুটে এসেছিল এক ঝাঁক ছর্‌রা। ফেনশুভ্রার পতনোন্মুখ দেহটা খণ্ডমুহূর্তের জন্য মাঝ-আকাশে স্থির হয়ে গেল — নিচের দিক থেকে গুলিটার প্রত্যাঘাতে। পরমুহূর্তেই সে সামিল হল ঐ মরাপাখিদের দলে।

তখন ওর দেহে প্রাণ নেই!

থাকলেও সে খুঁজে পেত না খোকনকে, কারণ ঐ মৃতদেহের স্তূপে সে ছিল না আদৌ।

শিকারীর বন্ধু ওকে তুলে নিল হাতে। বললে, অহেতুক এটাকে মারলে বব্‌। পাখিটা আর্টিক টার্ন! ওর মাংস খাওয়া যায় না।

বন্ধু বল্‌লে, সেটা বড় কথা নয় জিম। তুমি আমার টিপটা অ্যাপ্রিশিয়েট করলে না?

তা বটে!

পুরো সাতটা দিন কোন উচ্চবাচ্য করল না খুড়ো। সে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে। দুনিয়াদারীর অনেক ঘাটে জল খেয়েছে সে। সন্তান-হারানোর দুঃখ, সঙ্গিনী-হারানোর বেদনাটা বোঝে। দৃঢ়পক্ষ চুপচাপ বসে থাকে ঘণ্টাঘরে। খাদ্য-অন্বেষণে যেতে চায় না — দখিনপানে রওনা দেবার লক্ষণ নেই। শুধু ঘণ্টাঘরের নির্জনতায় সে বসে থাকে দক্ষিণদিকে মুখ করে। সেটা সজ্ঞানে নয় — জন্মগত সংস্কার! ওদের উপবেশন ভঙ্গিমা দেখেই স্বজাতীয়রা বুঝে নেয় কোনটা উত্তর দিক, কোনটা দক্ষিণ। এখন, এই এপ্রিল-মে মাসে সে বসে দক্ষিণমুখো হয়ে; আবার অক্টোবর-নভেম্বরে ওকে দেখা যাবে উত্তরমুখো হয়ে বসতে। যখন সে দক্ষিণ-গোলার্ধ থেকে চলতে থাকে গ্রীনল্যান্ডের দিকে।

খুড়োই মাঝে-মাঝে দু-একটা মাছ নিয়ে আসে। ফেলে দেয় ভাইপোর সামনে। দৃঢ়পক্ষ কখনো তাতে ঠোকর মারে, কখনো উদাসীন হয়ে বসেই থাকে। ইতিমধ্যে আট-দশ ঝাঁক আর্টিক টার্ন এসে আশ্রয় নিয়েছে ঐ ঘণ্টাঘরের কুলুঙ্গিতে। তারা এক রাত বিশ্রাম নিয়েই আবার রওনা হয়। ওদের ডাক দেয় — কী-আহ্‌! কী আহ্‌!

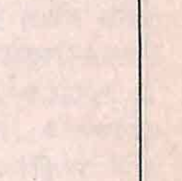
— চল, যাবে না? দখিনপানে?

দৃঢ়পক্ষ জবাব দেয় না।

খুড়ো কী বলবে, কী করবে, স্থির করে উঠ্‌তে পারে না। ঐ ডাক অমোঘ — যাত্রার আহ্বান; কিন্তু এতদিনের সঙ্গী ঐ দুর্মনস্য হতভাগ্যকে ফেলেও দিতে পারে না।

আরও দিন চারেক পরে খুড়ো ওর কর্ণমূলে অস্ফুট কূজন করল: কী-আহ?

তার মধ্যে কতটা সান্ত্বনা, কতটা আহ্বান আর কতটাই বা এ দুনিয়ার অনিত্যতা সম্বন্ধে মোহ-মুদ্গর — তা খুড়ো নিজেই জানে না। তার শব্দভাণ্ডার সীমিত — সাবধান বাণী, আনন্দের অভিব্যক্তি, আহ্বান, সাড়া দেওয়া, দাম্পত্য-কূজন। যদিও খুড়ো ভিন্ন প্রজাতির কিন্তু ওরা একই 'গণ'-এর। ফলে পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে।



পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে খুড়ো দেখে তার ভাইপো নিজে থেকেই বাসা ছেড়ে গেছে। সারাটি দিন বুড়ো অপেক্ষা করল। দৃঢ়পক্ষ ফিরে এল না। কী জানি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে? আত্মঘাতী হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? তবে একটা কথা পরিষ্কার: খুড়োকে সে মুক্তি দিয়ে গেছে।

খুড়ো এখন নিজের পথ নিজে চিনে নিক।

তাই নেবে সে। উপায় কী?

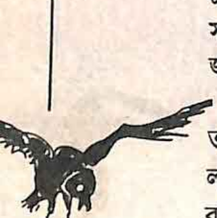
হঠাৎ ওদের চেঁচামেচি শুনে ব্রেক কষল জেমস্। কীসের এত চীৎকার চেঁচামেচি। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ায়। ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখে এবার। বোঝা গেল কাণ্ডটা:

ইলেকট্রিক তারে একটা ছোট্ট সোয়ালো পাখির কী করে যেন পা আটকে গেছে! নিচের দিকে মাথা করে ঝুলছে — কিন্তু বেঁচে আছে পাখিটা। আর তাকে ঘিরে বিশ-ত্রিশটা পাখি তারস্বরে চিল্লাচ্ছে।

জেম্‌স্ স্কুলে যাচ্ছিল। ঘটনাটা ঘটেছে ওদের দোরগোড়ায় — বাড়ির সামনেই। রাস্তার ওপাশে বহু উঁচু দিয়ে চলে গেছে ইলেকট্রিক হাইটেনশন লাইন। অনেক দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের মাঝখানে স্টীলের পাইলন। পাখিটা ঝুলছে প্রায় তে-তলা বাড়ির উচ্চতায়। মই লাগিয়েও তার নাগাল পাওয়া যাবে না! তাছাড়া — জেম্‌স্ জানে — ঐ তার ছুঁলেই মৃত্যু! কিন্তু আশ্চর্য! পাখিটা মরেনি কেন? শক্ খেল না কেন? বেঁচে আছে সেটা। মাঝে মাঝে ডানা ঝট্‌কান দিচ্ছে। আর তাকে ঘিরে এক ঝাঁক পাখি কল-কোলাহল জুড়েছে। তারা যেন সমস্বরে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল জেম্‌সের। বছর দশ-বারো বয়স তার। কিছু করার নেই। আবার সাইকেলে উঠে প্যাডেল চালালো। হাতঘড়িটা দেখল একবার — নাঃ! দেরী হয়নি কিছু।

সারাদিন ক্লাস করতে করতে বারে বারেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। আড়াই-তিন-তলা বাড়ির সমান উঁচুতে একটা ছোট্ট সোয়ালো পাখি তারে আটকে গেছে — শক্ খেয়ে মরেনি; কিন্তু মৃত্যু তার অবধারিত, যদি না কোনক্রমে তার ঐ পা-খানা ছাড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু তা ওর ক্ষমতার বাইরে। না হলে অনেক আগেই নিজে নিজে সে মুক্তি পেত। ওকে ঘিরে সারাদিন যারা প্রতিবাদ জানিয়েছে তারাও মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায়নি। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তারাও ওকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ফেলে যে-যার পথে চলে যাবে একে একে। রিসেস্ পিরিয়ডে জেমস্ দেখা করল ব্রাদার মর্লোর সঙ্গে। তিনি ওদের বিজ্ঞানের ক্লাস নেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলল; জানতে চাইল — কেন ঐ সোয়ালো পাখিটা শক্ খেয়ে মরেনি।

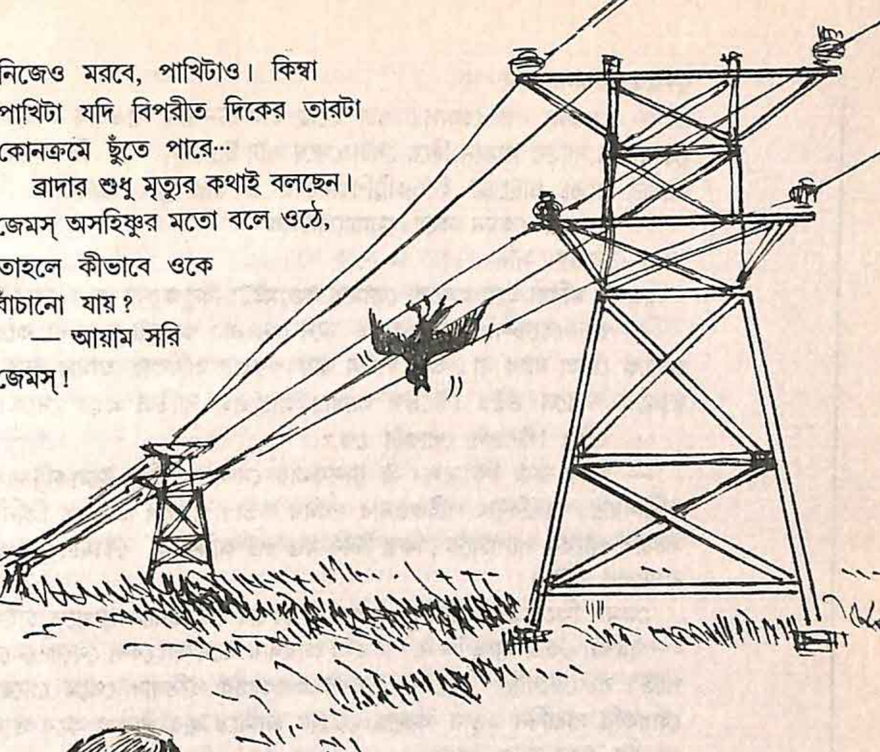


ব্রাদার মর্লো দুর্ভাগা পাখিটার প্রতি সমবেদনা জানালেন; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটাও বুঝিয়ে দিলেন — যেহেতু পাখিটার পা ভূ-স্পর্শ করেনি তাই সে লাইনে পজেটিভ-নেগেটিভ যে-চার্জই থাক তা ঐ হতভাগ্যের দেহ দিয়ে বাহিত হয়নি। ওকে যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে কেউ বাঁচাতে যায়, তাহলে সে

নিজেও মরবে, পাখিটাও। কিম্বা পাখিটা যদি বিপরীত দিকের তারটা কোনক্রমে ছুঁতে পারে...

ব্রাদার শুধু মৃত্যুর কথাই বলছেন। জেমস্ অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে, তাহলে কীভাবে ওকে বাঁচানো যায়?

— আয়াম সরি জেমস্!





তুমি আমি কিছুই করতে পারব না। এ কাজ একমাত্র করতে পারে কোন দক্ষ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, যার কাছে বড় মই আছে, ঐ কাজের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে।

স্কুল থেকে জেমস্ বাড়ি ফিরল না। সোজা এসে হাজির হল আঙ্কল স্যামের দোকানে। ওদের বাড়িতে বিজলি বাতির কোন কাজ থাকলে, ইলেকট্রিক লাইন ফিউজ হয়ে গেলে মায়ের নির্দেশে সে স্যামখুড়োর কাছে আসে। এ অঞ্চলের একজন দক্ষ ইলেকট্রিকাল মিস্ত্রি স্যাম-খুড়ো।

সব কথা শুনে স্যাম বললে, আয়াম এক্সট্রীমলি সরি জেমস্! আমার দ্বারা এ কাজ হবে না!

— কেন হবে না? তুমি তো দেখনি সেটা কত উচুতে

ঝুলছে। তোমার মই···

— সেজন্য নয় জেমস্! ওটা হচ্ছে হাই-টেনশান পাওয়ার লাইন। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেটা গেছে ওটা ইলেভন্ কে· ভি·লাইন। আমার মতো প্রাইভেট ইলেকট্রিশিয়ানদের ও তার ছুঁতে নেই।

— তাহলে কেমন করে সোয়ালোটাকে···

— আয়াম সরি!

জেমস্ মরিয়া হয়ে বললে, তোমার বড় মইটা কিছুক্ষণের জন্য দেবে?

— গুড হেভেন্স! অমন কথাও মনে এন না! কারেন্ট অফ্ না করে ওটাকে ছোঁয়া যাবে না। আর লাইন অফ্ করবার অধিকার আমার নেই। জানতে পারলে ডক্টর স্টিভেন্স আমার লাইসেন্স বাতিল করে দেবে!

— ডক্টর স্টিভেন্স লোকটা কে?

— ডক্টর জর্জ স্টিভেন্স। ঐ ট্রান্সফর্মার স্টেশনের চীফ ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার। জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার সর্বময় কর্তা। পারলে একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন পাখিটাকে; কিন্তু তিনি মস্ত বড় অফিসার, তোমার-আমার নাগালের বাইরে।

জেমস্ ফিরে এল বাড়িতে। ঢুকল না কিন্তু। সে প্রথমে দেখতে চাইল — পাখিটা বেঁচে আছে কি না। চিহ্নিত জায়গায় এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। যা ভেবেছিল তাই — পাখির কলকণ্ঠের প্রতিবাদ থেমে গেছে। বোধকরি সারাদিন মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ জানিয়ে হার স্বীকার করে তারা যে-যার পথে চলে গেছে।

হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়ায় আর একটি জিনিসে দৃষ্টি আটকে গেল ওর। একটা মরা ফ্যালকন্। প্রকাণ্ড পাখিটা। কিন্তু জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। একসার পিঁপড়ে ঘিরে ফেলেছে মৃতদেহটা — পরখ করে দেখতে সবটাই পুড়ে ছাই হয়েছে কি না।

জেমস্ বুঝতে পারে দুর্ঘটনাটা কী জাতের হয়েছিল। সোয়ালোটাকে তাড়া করেছিল ঐ মৃত্যুদূত বাজপাখিটা। বেচারি সোয়ালো! দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাবার সময় তারের বাধাটা তার নজরে পড়েনি। হয়তো তারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়েছে ঐ পোর্সেলিন কাপটার উপর। তারপর যে গ্যালভানাইজড্ তারে পোর্সেলিনের কাপের সঙ্গে মূল কারেন্টবাহী হাই-টেনশান তার জড়ানো, তারই একটা লুপে বেমক্কা আটকে গেছে তার পা। আর বাজপাখিটা হয়তো তার দু-ডানা দিয়ে দু-দিকের তার স্পর্শ করে ফেলেছিল; অথবা হয়তো সজোরে এসে ধাক্কা খেয়েছিল স্টীল পাইলনের কোন লোহার গায়ে। মুহূর্তমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তার। পশ্চাদ্ধাবনকারী মৃত; কিন্তু সোয়ালো বেচারি আটক পড়েছে নতুন বন্ধনে — মৃত্যু আলিঙ্গনে।

পাখিটা মরেনি কিন্তু। এখনো মাঝে-মাঝে ধড়ফড় করছে। পাখা সাবটাচ্ছে! বাঁচবার কী প্রাণান্তকর প্রয়াস!

হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল ওর। এক জোড়া পাখি হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এল। না, সোয়ালো না — কী পাখি তা ও জানে না।

লেজটা সোয়ালোর মতই দু-ভাগ করা। কিন্তু এদের মাথায় একটা করে কালো মখমলের টুপি। একটা পাখি — মনে হল সেটা মাদী — কাছে ভিড়ল না — দূর থেকেই পাক খেতে থাকে আর চিৎকার করতে থাকে : কী-কী-কির্‌রে!

যেন বলছে, সাবধান! ওর কাছে যেও না!

দ্বিতীয় পাখিটা অকুতোভয় এসে বসল ঐ তারের উপর। তারপর মুখটা নিচু করে যেন মৃত্যুপথযাত্রীকে চুম্বন করল। না — চুম্বন নয়, ওর মুখে ছিল কী একটা খাদ্যদ্রব্য — রুটির টুকরো অথবা মরা কোন জীবজন্তু — সেটাই সে বাড়িয়ে ধরল উদ্বন্ধনে মৃতপ্রায় ঐ পাখিটার দিকে!

আশ্চর্য! উপরে পা, নিচে মাথা — তবু পাখিটা সেই খাদ্যদ্রব্যটা খেয়ে ফেলল।

দুটি চোখ জলে ভরে এল জেমস্-এর।

ব্রাদার মর্লো বলেছেন, আয়াম সরি। স্যামখুড়োও বলেছে, আয়াম সরি। কিন্তু ঐ আজীব চিড়িয়া মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই তার কর্তব্য সমাপন করেনি।

জেমস্-এর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বাড়িতে ঢুকে গেল সে। মা এখনো অফিস থেকে ফেরেনি। জেমস্ জানে, তার খাবার মা সাজিয়ে রেখে গেছে হট-কেসে, দুধ রাখা আছে ফ্রীজে। কিন্তু কিছুই মুখে রুচল না তার। অন্য দিন আহারাদি সেরে সে খেলতে যায়। আজ তাও ইচ্ছে করল না। ও বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে।

শির-পা হয়ে পাখিটা ঝুলছে। মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে।

মা যখন ফিরে এল তখনো অন্ধকার হয়নি।

— কী রে? আজ খেলতে যাসনি? একি! খাবারটাও খাস্‌নি দেখছি। শরীর ঠিক আছে তো? দেখি, কাছে আয় দেখি!

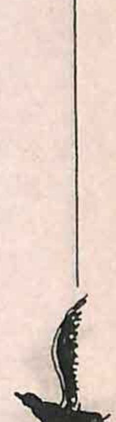
জেমস্ আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে দু-হাতে মুখ ঢাকে।

— কী হয়েছে রে? স্কুলে কেউ কিছু বলেছে?

— ন্‌নো! লুক অ্যাট দ্যাট!

মাও দেখল। কাবার্ড খুলে বার করে আনলো একটা জোরালো বাইনোকুলার। মায়ে-পোয়ে বার হয়ে এল বাইরে। বাইনোকুলারে এবার পাখিটাকে ভালো করে দেখল জেমস্। না, ওটা সোয়ালো নয়; এরও মাথায় ঐ মখমলের কালো টুপি। ঠোঁট আর পা দুটি টুকটুকে লাল! কী-পাখি তা ও জানে না।



মায়েরও দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা, বললে, আয়াম···

— ডোন্ট সে দ্যাট! — গর্জে উঠল জেমস্!

— কী? কী বলতে বারণ করছিস!

— ডোন্ট সে — 'আয়াম সরি'!

— কেন? কেন এ-কথা বলছিস্ খোকন?

জেমস্ তার সারাদিনের অভিজ্ঞতা সবিস্তারে শোনায়। মা বললে, কিন্তু ওঁরা তো কেউই অন্যায় কথা বলেননি কিছু। এ একটা নিয়তি। আমরা কী করতে পারি?

তা বটে! জেমস্ বুঝল!

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে ছুটে চলে এল জানলার ধারে। দেখে, তার মা আগেই এসেছে সেখানে। পর্দা সরিয়ে দেখছে পাখিটাকে, চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে।

আশ্চর্য ওর জীবনীশক্তি! এখনো মরেনি।

মা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল বাইনোকুলারটা। জেমস্ সেটা হাত বাড়িয়ে নিল না। এ দৃশ্য দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখবার আগ্রহ নেই ওর। অস্ফুটে প্রশ্ন করে, মম্! আমরা কি কিছুতেই ওকে মুক্ত করতে পারি না?

মম্ অনেকক্ষণ জবাব দিল না। তারপর জেমস্-এর চোখে চোখ রেখে বললে, ওকে মুক্ত করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে খোকন, কিন্তু আর এক অর্থে ওকে 'মুক্তি' দিতে পারি।

চোখ দুটো চক্চক্ করে ওঠে জেম্স্-এর। সাগ্রহে জানতে চায় — কী-ভাবে?

— তোর ড্যাডের বন্দুকটা দিয়ে ওর যন্ত্রণার…

ড্যাড! আশ্চর্য! কতদিন পর মাম্মি আজ ড্যাডের প্রসঙ্গ তুলল। ড্যাড বিবাহ-বিচ্ছেদ করে চলে যাবার পর এ বাড়িতে ঐ প্রসঙ্গ আর আলোচিত হয় না। জেমস্ বুঝতে পারে — তার মাম্মিও কী পরিমাণ বিচলিত। যে নাম উচ্চারণ করার নয়, তাই বলে বসেছে!

মা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর ও মনস্থির করলো।

নাঃ! একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে।

স্কুলের দিকে গেল না। এগারো কিলোমিটার বাইসাইক্ল চালিয়ে চলে এল ট্রান্সফর্মার-স্টেশনে। আঙ্কল স্যাম বলেছিল — এখানেই সেই ভদ্রলোকের অফিস — ডক্টর জর্জ স্টিভেন্স। চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। পাখিটাকে মুক্ত করার ক্ষমতা একমাত্র যাঁর এক্তিয়ার।

সমস্ত এলাকাটা কাঁটা-তার আর উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে প্রকাণ্ড গেট। পাশেই দ্বাররক্ষকের গুম্‌টি। জেমস্ এগিয়ে গেল সেদিকে। দেখল দ্বাররক্ষক একজনের সঙ্গে কথা বলছে। অপরের কথোপকথন আড়াল থেকে শুনবার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না; কিন্তু বাধ্য হয়ে শুনতে হল। আগের লোকটা ভিতরে ঢুকতে চায়, আর দ্বারোয়ান তাকে বাধা দিচ্ছে — বলছে ভিতরে যেতে হলে 'পার্মিট পাস' করিয়ে আনতে হবে। অনেক তর্ক-বিতর্ক করে ভদ্রলোক বিদায় হলেন। দ্বাররক্ষক ওর দিকে ফিরে বললে, ইয়েস?



জেমস্ সপ্রতিভের মতো বলে বসল, আঙ্কল জর্জ কি অফিসে আছেন?

— আঙ্কল জর্জ! কে তিনি?

জেমস্ অমায়িক হাসল, বলল, আশ্চর্য! তুমি আঙ্কল জর্জিকে চেন না? ডক্টর জর্জ স্টিভেন্স! চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার!

— আই সী! তিনি তোমার আঙ্কল! কী নাম তোমার?

— জেমস্ কনওয়ে!

লোকটা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলল। তারপর বলে, না, উনি একটু বেরিয়েছেন। এখনি ফিরবেন। কোন মেসেজ আছে?

জেমস্ হাসতে হাসতেই বলে, ব্যাপারটা পার্সোনাল!

— আই সী!

পুনরায় টেলিফোনে ডক্টর স্টিভেন্সের একান্ত সচিবের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে বললে, ঠিক আছে। ভিতরে যাও। ঐ দোতলা বড় বাড়িটা। সাইকেলটা এখানেই থাক।

দ্বারোয়ানের কাছে সাইকেল জিম্বা করে জেমস্ ভিতরে ঢুকল। দোতলা বাড়িটার কাছে গিয়ে পৌঁছাতেই একটি ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, তুমিই জেমস্!

— ইয়েস ম্যাডাম!

— এখানে এসে বস। স্যার তোমার কোন সম্পর্কে আঙ্কল হন?

জেমস্ সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চট্ করে বললে, ওটা কী? অমন লাল-সবুজ আলো জ্বলছে কেন?

ভদ্রমহিলা ওকে বুঝিয়ে দিতে থাকেন ব্যাপারটা।

একটু পরেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

একজন রাশভারী ভদ্রলোক গটগট করে অফিস ঘরে ঢুকে গেলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, য়ু মে গো নাউ। বেশিক্ষণ গল্প কর না। স্যারের এখন অনেক কাজ।

— আই নো! থ্যাঙ্কু!

পর্দা সরিয়ে জেমস্ প্রবেশের অনুমতি চাইল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক চশমাটা কপাল তুলে বললেন, কে? কী চাও?

গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল জেমস্। বললে, আমার নাম জেমস্ কনওয়ে। এখানকার স্কুলে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে পড়ি। একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি স্যার!

— বিপদ! কী বিপদ? এখানে এলে কেমন করে?

পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন সেই ভদ্রমহিলা। সবিস্ময়ে বলেন, আপনি একে চেনেন না স্যার?

— আই ডোন্ট থিংক সো!

— স্ট্রেঞ্জ! অথচ ও এসে বলেছে, আঙ্কল জর্জির সঙ্গে দেখা করতে চায়!

— তাই বলেছ? —— জানতে চান রাশভারী অফিসার!

— আয়াম সরি, ইয়েস! না হলে ওরা আমাকে ঢুকতে দিত না স্যার। কিন্তু আমাকে যে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে!

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। রাগ করলেন না। বলেন, সীট ডাউন! বল,



কী তোমার সেই মর্মান্তিক প্রয়োজন,যে জন্য মিথ্যা পরিচয়ে এই প্রটেকটেড্ এলাকায় এভাবে ঢুকে পড়েছ?

জেমস্ বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক নিশ্বাসে বলে যায় তার সমস্যার কথা! উপসংহারে বলে, আঙ্কল স্যাম বলেছে — একমাত্র আপনিই পারেন ঐ সোয়ালোটাকে বাঁচাতে। আপনার কি করুণা হবে না স্যার?

ডক্টর স্টিভেন্স বলেন, টেক য়োর সীট, মাস্টার কনওয়ে। তোমাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলার আছে। তার আগে বল, তোমার বাবা কি জানেন, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে মিথ্যা পরিচয়ে দেখা করতে এসেছে?

জেমস্ মাথা নিচু করে বললে, আমার মা একজন স্বামীত্যক্তা। বাবার প্রশ্ন ওঠে না। না, মম্ জানে না আমি এভাবে আপনার কাছে এসেছি।

— আই সী! তোমাদের বাড়িটা কোথায়? ওখানে যে লাইনটা গেছে...

জেমস্ নিজের ঠিকানাটা জানালো, এবং ঐ সঙ্গে বলল, আঙ্কল স্যাম বলেছে, ওটা ইলেভ্‌ন্ কে.ভি. হাইটেন্সন লাইন।

— আমিও তাই আশঙ্কা করেছি। শোন জেমস্। তুমি যা চাইছ, তা হবার নয়। ঐ মেন লাইন থেকে অনেক অনেক শহরে, কয়লাখনিতে ইলেকট্রিক্যাল লাইন গেছে। দশ মিনিটের জন্যও যদি আমি কারেন্ট বন্ধ করি তাহলে কী সর্বনাশ হবে ভেবে দেখেছ? হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে বাতি নিভে যাবে, কয়লা খনির কেজ হয়তো মাঝ পথে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলতে থাকবে... না, তা হয় না জেমস্। আয়াস সরি! ... শোন! এটা ঐ সোয়ালোটার নিয়তি। একটা অ্যাকসিডেন্ট! বাট দিস্ ইজ্ লাইফ!

কোথাও কিছু নেই ছিলে-খোলা ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠল জেমস্। অস্ফুটে গর্জন করে উঠল, নো! দিস্ ইজ — 'ডেথ'!

— জেমস্! প্লীজ হিয়ার মি...

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জেমস্ বলে ওঠে, কী শুনব? আয়াম টায়ার্ড অফ দ্যাট — 'আয়াম সরি'।... 'আয়াম রিয়্যালি সরি'! ...'আয়াম এক্সট্রীমলি সরি'... 'আয়াম অ'ফুলি সরি'...

ডক্টর স্টিভেন্স বোধহয় এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না! কীভাবে ঐ মর্মাহত নাবালকটিকে শান্ত করবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

— টেল মি ডক্টর স্টিভেন্স! তোমার যদি আমার বয়সী একটা ছেলে থাকত, আর সে যদি ঐভাবে শূন্যে ঝুলত, তাহলে তুমি দায়িত্ব এড়িয়ে বলতে পারতে... 'দিস ইজ লাইফ'! পারতে আমাকে ফেলে পালাতে? আই মীন, আমার বয়সী তোমার ছেলেকে ফেলে পালাতে?

ডক্টর স্টিভেন্স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। টেবিলটা পার হয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু তার নাগাল পান না। জেমস্ বলে, বোধহয় পারতে! অ্যাট লিস্ট আমার ড্যাড সেটা পেরেছিল!

যে-কথা সর্বসমক্ষে বলার নয় এবার ও নিজেই সেটা বলে ফেলেছে! ছি-ছি-ছি!

পরমুহূর্তেই সে ঝড়ের বেগে বার হয়ে যায় ঘর থেকে!

ক্লাস-পালানোর কথা মাকে বলেনি। সে যা হবার হবে; তার চেয়েও বড়

অপরাধ হয়েছে অতবড় একজন অফিসারের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করে আসা। মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সংরক্ষিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করা। মা কি জানতে পারবে? কোন সূত্রে?

রাত দশটার সময় ওদের দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। এতরাত্রে কে এল? জেমস্ আর তার মা পাশাপাশি খাটে শোয়। ডিনার সেরে ও শুয়ে পড়েছিল। মম্ কী একটা বই পড়ছিল টেবল্ ল্যাম্প জ্বেলে। বললে, তুই কম্বলের তলা থেকে উঠিস না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমি দেখছি।

মা উঠে গেল। সদর দরজা খুলে দেখে একজন অজানা লোক। সে বললে, গুডঈভনিং ম্যাডাম, এই ঠিকানায় কি মাস্টার জেমস্ কনওয়ে থাকে?

মম্ আতঙ্কতাড়িত কণ্ঠে প্রতিপ্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে আসছেন? কেন খুঁজছেন ওকে?

জেমস্ ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে সদরের কাছে। দেখে দরজার ওপাশে একজন নয়, দুজন ব্যক্তি। তাদের পরনে ওভার-অল, হাতে চামড়ার দস্তানা. মাথায় টুপি, টুপির সামনে টর্চ — যেমন থাকে কয়লাখনির শ্রমিকদের। বলে, আমারই নাম জেমস্ কনওয়ে? কী চান?

সামনের লোকটা বললে, গুড-ঈভনিং মাস্টার কনওয়ে। তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। গরম জামাকাপড় পরে বাইরে আসতে হবে। আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে কোন তার থেকে সেই 'ডি-ড্যাস্-ডি' কাম ভি·আই·পি· সোয়ালোটা ঝুলছে।

— আপনারা কি ট্রান্সফর্মার স্টেশন থেকে আসছেন? — জানতে চায় জেমস্।

— ইয়েস স্যার! বড়-সাহেবের হুকুম হয়েছে রাত এগারোটা সাত থেকে এগারোটা বারো পর্যন্ত ঐ ইলেভন্ কে·ভি· লাইনটা ডেড থাকবে। আপনারা আজ টি·ভি--তে সান্ধ্য লোকাল নিউজ শোনেননি? একটি ভি·আই·পি--কাম 'ডি-ড্যাস-ডি' সোয়ালোর খাতিরে পাঁচ মিনিটের জন্য সমস্ত চেস্টারফিল্ড শায়ারটা অন্ধকারে ডুবে যাবে! কাইন্ডলি তৈরী হয়ে নিন, স্যার!

মধ্যরাত্রে এই ডিউটির হুকুম পেয়ে লোকটা নিশ্চয় ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। তাই জেমস্কে অকারণ 'স্যার, স্যার' করে ব্যঙ্গ করছে। কিন্তু সেসব দিকে ওর নজরই নেই। ওর ইচ্ছে করছিল ঘরময় একটু তুর্কি নাচন নেচে নিতে!

মা বলে, কী ব্যাপার? আমি তো···

— ফিরে এসে বলব! দাঁড়াও, আগে সোয়ালোটাকে বাঁচাতে হবে। আর আধঘণ্টা মাত্র সময় আছে।

ওরা এসেছে যে গাড়িটা ড্রাইভ করে তার সঙ্গেই আছে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ফোল্ডিং মই। জেমস্-এর নির্দেশে গাড়িটাকে ঐ তারের ঠিক নিচে পার্ক-করল দক্ষ ড্রাইভার। ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজতে দশ। বোতাম টিপতেই ফোল্ডিং মইটা ভাঁজ খুলে উঠে গেল উপড়ে। ইলেকট্রিক

মিস্ত্রি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। তার বাঁ-কাঁধে যন্ত্রপাতির বাক্সটা, হাতে তারকাটা সাঁড়াশি।

জেমস্ নিচে থেকে বলে, লুক হিয়ার আঙ্কল! এগারোটো সাত মিনিটে কারেন্ট অফ্ হবার কথা; কিন্তু ওদের ঘড়িটা যদি ফাস্ট থাকে।

সিঁড়ির মাথা থেকে মিস্ত্রি হেসে ওঠে। বলে, কারেন্ট অফ্ হল কি না তা ঘড়ি দেখে বুঝতে হবে না। সারা চত্বরটা আঁধার হয়ে যাবে। রাস্তার সব বাতি নিবে যাবে। আর ঠিক সাড়ে চার মিনিট পরে গাড়িতে অটোমেটিক ইলেকট্রিক ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠবে। আমার শক্ খাবার ভয় নেই। কিন্তু সবটাই হয়তো বেকার হচ্ছে মাস্টার কনওয়ে — পাখিটা আর বেঁচে নেই!

বেঁচে নেই!

এ আশঙ্কার কথাটা ওর মনে ছিল না। কথা ফোটে না ওর। সত্যিই তো — সেটাতো দেখা হয়নি আজ বিকালে!

লোকটা বোতাম টিপে তার হেলমেটের জোরালো বাতিটা জ্বালল। অত তীব্র আলোতেও পাখিটার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। একটুও নড়ল না সেটা। দু-চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে জেমস্-এর। সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

ঠিক তখনই নিভে গেল গোটা চত্বরটার বিজলি বাতি। ঘনান্ধকারে ডুবে গেল সারাটা রাজ্য। জেমস্ আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। মৃতদেহটা হাত পেতে নিতে। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে সে ফিরে এল বাড়িতে। ডোর-বেলটা টিপল। শব্দ হল না কোন।

পরমুহূর্তেই জ্বলে উঠল সব বাতি।

একটু পরে মিস্ত্রিটা নিজেই এসে উপস্থিত। বললে, মনে হয় এখনো মরেনি। বুকটা ওঠা-নামা করছে। দেখুন, বাঁচাতে পারেন কিনা!

মরেনি? এখনো আশা আছে? জেমস্ ছুটে আসে। বলে, থ্যাঙ্কু আঙ্কল!

ইলেকট্রিশিয়ান বললে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও বেঁচে উঠবে। যীসাস্ আছেন না উপরে? আই কংগ্র্যাচুলেট য়ু মাস্টার কনওয়ে ফর য়োর ডগেড টেনাসিটি! গুড-নাইট!

আশ্চর্য জীবনীশক্তি সোয়ালোটার।

অবশ্য ওরা মায়ে-পোয়ে শুশ্রূষাও করছে সারা রাত ধরে। ঘড়ি ধরে মম্ ওকে আই-ড্রপারে করে খাইয়েছে ব্র্যান্ডি মেশানো দুধ। প্রথম-প্রথম তাও খেতে পারছিল না — বেশির ভাগই ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। তারপর ফায়ার-প্লেসের উত্তাপে, মায়ের পরিচর্যায় আর দুধ-মেশানো ব্র্যান্ডির প্রভাবে রাত একটা নাগাদ পাখিটা চোখ মেলে তাকালো!

পূব আকাশে যখন ফর্সা হয়ে আসছে তখন সেটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, পারল না।

ঘটনাচক্রে সেটা রবিবার। মম চার্চে যাবে। জেমস্‌ও যায় মায়ের সঙ্গে। আজ সে যাবে না। পাখিটাকে দেখভাল করার জন্য একজনকে থাকতে হবে তো? মা ব্রেকফাস্ট বানাতে গেল। ঠিক তখনই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। মা ধরল সেটা। ও-প্রান্তবাসী জানতে চাইলেন, এখানে কি

মাস্টার জেমস্ কনওয়ে থাকে ?

— হ্যাঁ, থাকে। আছে। আপনি কে বলছেন ?

— আঙ্কল জর্জি।

— আঙ্কল জর্জি ? কার আঙ্কল ?

— জেমস্-এর। আপনি কি ওর মা ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক…

— আমার নাম জর্জ স্টিভেন্স। আমি জেমসের মেটার্নাল আঙ্কল, মানে, আপনি আমার ছোট বোন।

জেমস্-এর মা একেবারে আকাশ থেকে পড়ে।

ইতিমধ্যে জেমস্ উঠে এসেছে। মায়ের হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বলে : এ মিলিয়ান থ্যাংস স্যার!

— স্যার ? স্যার কে ? আয়াম আঙ্কল জর্জি স্পিকিং…

— বুঝেছি, বুঝেছি! আপনি কালরাত্রে যে…

— বাদ দাও ওসব কথা! সোয়ালোটা কি উড়ে গেছে ?

— নো স্যার! আই মীন — নো আঙ্কল! কিন্তু পাখিটা খুব অসুস্থ! আর ওটা বোধহয় সোয়ালো নয় — অন্য কোন পাখি…

— কি করে বুঝলে ?

জেমস্ পাখিটার বর্ণনা দিল। বলল, ও বোধহয় বাঁচবে না! আয়াম সরি টু সে দ্যাট !

— ডোন্ট টেল মি দ্যাট!

— কী ? কী বলব না ?

— আয়াম টায়ার্ড অফ সাচ্ এক্সক্লামেসন্স! — 'আয়াম সরি'… 'আয়াম এক্সট্রেমলি সরি'… 'আয়াম অ-ফুলি সরি'! বুঝলে ? ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ! ও বাঁচবে, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। ওর যত্ন নিও ঠিক মত।

— থ্যাঙ্কু আঙ্কল! নিশ্চয় যত্ন নেব।

টেলিফোনের লাইনটা ছাড়তেই মা ঘনিয়ে আসে, এবার বল দেখি — কী করে কী হল ? আঙ্কল জর্জিটা কে ? আমার দাদা হয় বলল, আর আমিই চিনি না ?

পাখিটা ওর দারুণ পোষ মানল। প্রথম-প্রথম পাখিটা ভয় পেত — জেমস্‌কে, তার মাকে। কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যেই সে চিনে নিল ওদের। ভয় ভাঙল। ইতিমধ্যে মা ওর জন্যে একটা খাঁচাও কিনে এনেছে। জেমস্ সকাল বিকেল ওকে নিজে হাতে খাওয়ায় — রুটি, ডিম, বিস্কুট। ক্রমে তাগদ ফিরে পেল ; কিন্তু উড়ে যায় না, খাঁচার দরজা খোলা পেলেও।

ইতিমধ্যে আঙ্কল জর্জিকে টেলিফোন করে জানিয়েছে — তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে। পাখিটা পোষ মেনেছে আর ভাল হয়ে গেছে।

তারপর দিন-সাতেক পরে ওর কী-যেন ভাবান্তর হল। কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল পাখিটা। সারাদিন কিছু খেল না। কী যে ওর অস্বস্তি, কোথায় ব্যথা বোঝা যায় না — দিনরাত ঝিম মেরে বসে থাকে। সব চেয়ে



আশঙ্কার কথা — ও কিছু খাচ্ছে না।

মায়ে-পোয়ের সংসারে এখন পাখিটাই হয়েছে কেন্দ্রবিন্দু। মা অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে, জেমস্‌ও স্কুল কামাই করছে। কিন্তু সেবা-শুশ্রূষায় পাখিটার কোন উন্নতি হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে এক অচেনা ভদ্রলোক এসে হাজির। ডোরবেল বাজতে মা সদর খুলে দিয়ে দেখে একটা পোর্টম্যান্টো-ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই অপরিচিত ভদ্রলোক। মাথা থেকে টুপিটা খুলে অভিবাদন করে বলেন, মাদাম কনওয়ে নিশ্চয়?

— হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...

— না, আপনি আমাকে চেনেন না, আমার নাম বিল জোন্স, ডক্টর বিল জোন্স। আমি একজন পশুচিকিৎসক। আপনার বাড়িতে একটি সোয়ালো পাখি...

— হ্যাঁ, তাই, কিন্তু আপনি কেমন করে খবর পেলেন?

— জর্জি আমার বন্ধু, আই মীন ডক্টর জর্জ স্টিভেন্স। সেই আমাকে পাঠিয়েছে। ফী-জ দিতে হবে না আপনাকে। আমি একবার পাখিটাকে দেখতে চাই। জর্জি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে টেলিফোনে খবরটা শুনে।

— থ্যাঙ্কু! আসুন ভিতরে এসে বসুন।

জেমস্‌ও কৃতজ্ঞতা জানালো। খাঁচায় করে পাখিটাকে নিয়ে এল ওঁর কাছে।

উনি খাঁচা খুলে সেটাকে বার করে আনলেন। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। ওর ডানার নিচে একটা ইন্‌জেকশান দিলেন। জানতে চাইলেন, ওকে কী খেতে দেওয়া হচ্ছে?

— রুটি, বিস্কুট, কেক...

— সেটাই ভুল হচ্ছে। ওকে ছোট মাছ খেতে দিন। প্রথমে দু-একদিন হাফ-বয়েল্ড, আনসল্টেড। পরে কাঁচা মাছ।

জেমস্ জানতে চায়, ডায়েটটা বদলালেই কি ও ক্রমশ আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে?

— না, তা যাবে না, মাস্টার কনওয়ে। ও স্বাভাবিক হবে ওর স্বাভাবিক পরিবেশে। ওটা কী পাখি জান?

— না! কী?

— ও কোন দিকে মুখ করে বসে আছে বলতো?

— দক্ষিণ দিকে।

— হ্যাঁ, এবার ওর খাঁচাটাকে এক শ আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দাও দিকি।

জেমস্ আদেশমতো খাঁচাটাকে এক শ আশি ডিগ্রি পাক খাওয়ালো। পাখিটা কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালো। মুখ ফিরিয়ে আবার দক্ষিণমুখো হয়ে বসল।

ডক্টর জোন্স বলেন, ও একটি জীবন্ত কম্পাস। ও যদি 'ফল' পর্যন্ত বাঁচে তাহলে সেপ্টেম্বর মাসে দেখবে ও বারে বারে উত্তরমুখী হয়ে বসছে! কারণ ও সোয়ালো নয় আদপে — ও হচ্ছে আর্টিক টার্ন পরিযায়ী পক্ষিকূলের সম্রাট!



ঐ আজব চিড়িয়ার বিষয়ে উনি এর পর অনেক কথাই বলে গেলেন। জেমস্ আর তা মা অবাক হয়ে শুনল। উপসংহারে ডক্টর জোন্স বললেন, এটি পুরুষ পাখি, আমার ধারণা ওর বয়স এক বছরের কম। ও বাবা মায়ের সঙ্গে দক্ষিণ-গোলার্ধে যাচ্ছিল। ভার্জিন ভয়েজ! যে কোনভাবেই হ'ক দলছুট হয়ে ঐ বাজপাখিটার খপ্পরে পড়ে। বাকি ইতিহাস তো জানই।

সুতরাং ও স্বাভাবিক হবে তখনই, যখন ও নিজের যাত্রাপথে আবার যেতে পারবে। ও যে কোথায় যাবে তা জানি না। হয়তো আফ্রিকার দক্ষিণে ম্যাডাগাসকার, অথবা হয়তো সটান দক্ষিণ মেরু।

জেমস্-এর মা অবাক হয়ে বলেন, দক্ষিণ মেরু? ঐ অতটুকু পাখি?

— হ্যাঁ, তাই ওরা যায়। এও যেতে পারে, যদি আপনারা ওকে মুক্তি দেন। দেবেন?

মায়ে-ছেলেয় দৃষ্টি বিনিময় হল। মিসেস কন্ওয়ে বলেন, আর্টিক টার্নটা আমার নয়, ডক্টর জোন্স। ওটার মালিক জেমস্।

ডক্টর জোন্স তার দিকে ফিরে তাকালেন।

মাথাটা নিচু হয়ে গেল জেমসের। বেচারি জবাব দিতে পারল না।

— কী নাম রেখেছ ওর? — ডক্টর জোন্স জানতে চান।

— নাম এখনো দেওয়া হয়নি কিছু।

— মে আই সাজেস্ট আ নেম? — ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে ডক্টর জোন্স জানতে চান।

— আল বি ডিলাইটেড! বলুন? কী নাম?

— প্রিজনার! বন্দী!

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জেমস। বলে ন্‌নো! একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই ওকে ছেড়ে দেব আমি। ওর নাম 'বন্দী' নয়, ওর নাম — 'দিগন্তপ্রিয়'!

ডক্টর জোন্স হাতটা বাড়িয়ে দেন করমর্দনের উদ্দেশ্যে।

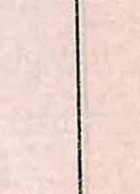
মিসেস কন্ওয়ে বলেন, কত দিন পরে ও এই দীর্ঘযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে বলে মনে হয়?

— ধরুন দিন-সাতেক। ওকে এই ভিটামিনটাও খাওয়াবেন। মুক্তি পেলেও ও সোজা দক্ষিণমুখো যাবে না। প্রথমে দিন তিন-চার ও বাবা-মাকে খুঁজবে। না পেলে অন্য কোনও দলের সঙ্গে যাত্রা করবে। হয়তো বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ব্রিডিং সীজন-এ স্কটল্যান্ড বা গ্রীনল্যান্ডে!

মিসেস কনওয়ে বলেন, তা কি কখনো সম্ভব? অতদূর দেশের বাসা কি কেউ খুঁজে পায়?

তখন ডক্টর জোন্স এ জাতীয় পরিযায়ী পক্ষীর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আরও কিছু শোনালেন।

কীভাবে ওরা পথ চেনে, বাসা খুঁজে পায় তার হদিস বিজ্ঞান আজও পায়নি — সূর্যের 'অ্যাজিমাথ', নক্ষত্রনিচয়ের অবস্থান, পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি, মাধ্যাকর্ষণের টান ইত্যাদির হিসাব ওদের ঠোঁটাগ্রে! সূর্য যখন সম্পূর্ণ মেঘের আড়ালে তখনো সূর্যের নির্ভুল অবস্থান ওরা টের পায়, কারণ 'বেগনিপারের



আলো'র সঙ্কেত ওরা অনুভব করতে পারে, যা পারে না মানুষনামক দ্বিপদীজীব। কুলায়-এর অবস্থান সম্বন্ধে ওদের এমন কিছু অনুভূতি আছে, যা মানুষের বিচারে 'অতীন্দ্রিয়'! পরিযায়ী পাখির পায়ে অতি হাল্কা অ্যালুমিনিয়ামের নম্বর-দেওয়া আংটি পরিয়ে পক্ষিবিজ্ঞানীরা এ তথ্য নিঃসংশয়ে জেনেছেন। দু-দুটি বাস্তব উদাহরণ দিলেন ডক্টর জোন্স:

একটি শিয়ারওয়াটার পাখিকে তার বাসা থেকে এয়ারোপ্লেনে করে এমন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় যেটা ওর স্বাভাবিক পরিক্রমা-পথ থেকে 930 মাইল (আকাশপথের দূরত্ব) ডাঙার এবং 3,700 মাইল সমুদ্রপথের দূরত্বে। সেই অজানা দেশে পাখিটিকে মুক্তি দেওয়ার পর সে অনায়াসে নিজের বাসায় ফিরে আসে। অপর একটি ঐ পাখিকে ইংলন্ডের বাসা থেকে তুলে নিয়ে আমেরিকার বোস্টনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দূরত্বটা 3,200 মাইল এবং সেটা পুব-পশ্চিমে, অর্থাৎ ওর স্বাভাবিক পরিযায়ী-পথের (উত্তর-দক্ষিণ) সঙ্গে সমকোণে। পাখিটা মুক্তি পাওয়ামাত্র সিধে উড়ে যায় পূব-মুখো! বারো দিন, বারো ঘন্টা, ত্রিশ মিনিটে সে বাসায় ফিরে আসে নিরাপদে।

উপসংহারে উনি বললেন, সুতরাং 'দিগন্তপ্রিয়' যে পথ চিনে-চিনে যেতে পারবে এটা আশা করা অন্যায় হবে না, কী বল?

জেমস্ সহাস্যে বললে, আমেন!

কমন-টার্ন গান গাইতে পারে না।

পারলে, ও এখন গাইত: হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।

দৃঢ়পক্ষ নিরুদ্দেশ যাত্রা করার পরে কমনখুড়ো সেই গীর্জার ঘণ্টাঘরের কুলুঙ্গিটা ত্যাগ করেনি। ও স্থির করেছে দখিনপানে আর যাবে না।

সঙ্গীসাথীরা একে-একে সবাই বিদায় নিয়েছে। ও নিজে প্রকৃতির ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছে নতুন প্রজন্মে। ওর সন্তান-সন্ততি এখন কোথায় তা ও জানে না। জানবার আগ্রহও নেই। কেমন যেন একটা জীবনবিমুখ অনীহায়, নির্বেদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে কমনখুড়ো। ইতিমধ্যে বিশ-ত্রিশটা অভিযাত্রীদল এসেছে, ঘণ্টাঘরে রাত্রিবাস করে দখিনপানে রওনা দিয়েছে। যাবার সময় প্রত্যাশিত সঙ্কেত জানিয়ে গেছে: কী-আ, কী-আহ্!

ওর অন্তরের সেই দিগন্তপ্রেমী রক্তটা ছল্‌কে ওঠেনি।

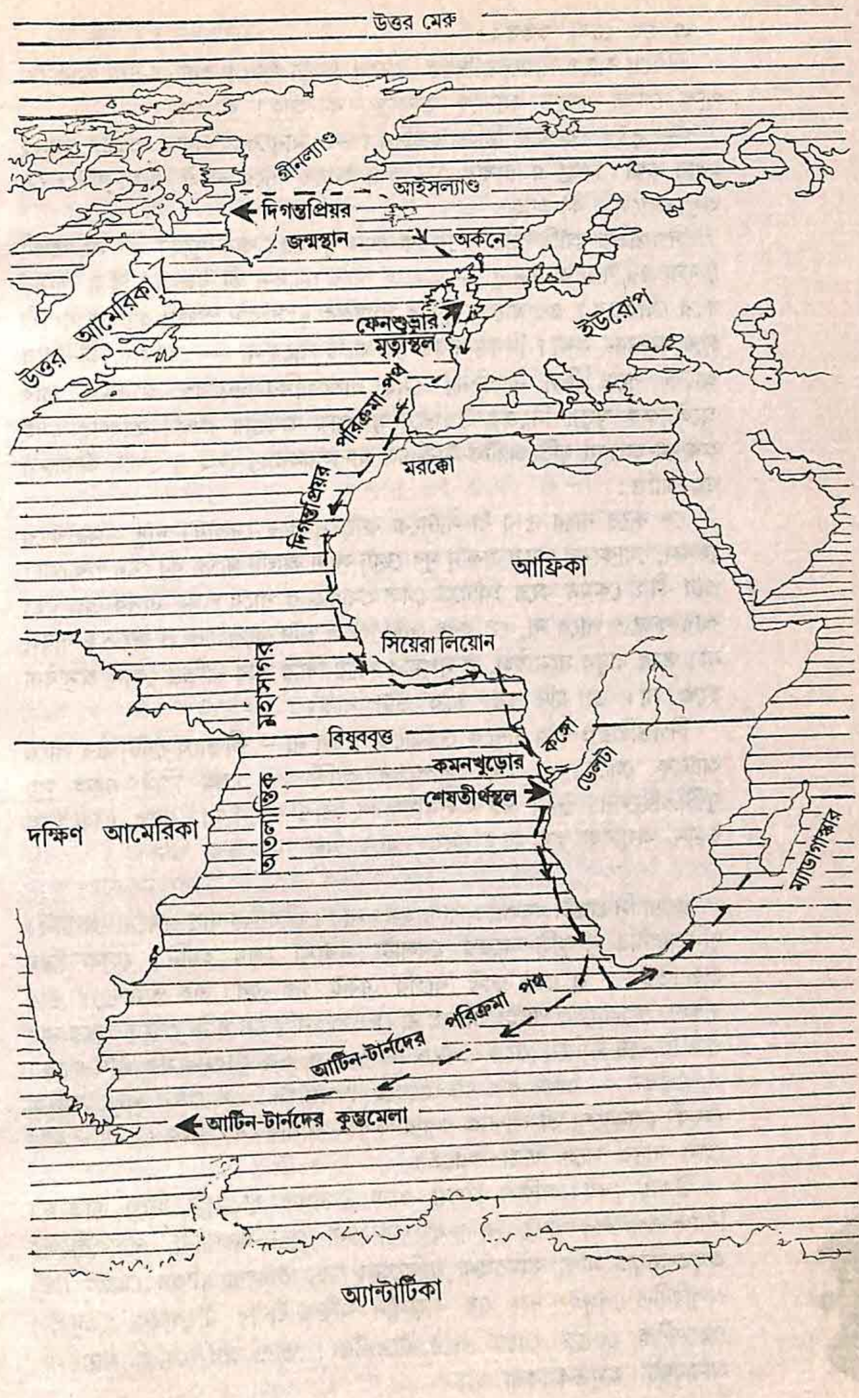
কী হবে? কী লাভ? এই তো বেশ!

ইংল্যান্ডের জানুয়ারীর শীত ওর সহ্য হবে না? তাতে কী? প্রজনন অন্তে শামাপোকার দল যখন আগুনে ঝাঁপ মারে তখন কি তারা বোঝে না — প্রদীপশিখার উত্তাপ তাদের সহ্য হবে না? জীবনের দায় তো প্রকৃতির ঋণটুকু শোধ করে দিতে। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যে অযাচিত আশীর্বাদ পেয়েছিল — এই প্রকৃতিরাজ্যে আনন্দের ভোজে সামিল হবার — তা কি ও কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দেয়নি?

— কী-আহ্! কী-আহ্!

জাগরস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে বুড়ো!




উত্তর মেরু
গ্রীনল্যাণ্ড
আইসল্যাণ্ড
দিগন্তপ্রিয়র
জন্মস্থান
অর্কনে
উত্তর আমেরিকা
ফেনশুভ্রার
মৃত্যুস্থল
ইউরোপ
দিগন্তপ্রিয়র পরিক্রমা-পথ
মরক্কো
আফ্রিকা
সিয়েরা লিয়োন
আতলান্তিক মহাসাগর
বিষুববৃত্ত
কঙ্গো
ডেল্টা
কমনখুড়োর
শেষতীর্থস্থল
দক্ষিণ আমেরিকা
ম্যাডাগাস্কার
আর্টিন-টার্নদের পরিক্রমা পথ
আর্টিন-টার্নদের কুম্ভমেলা
অ্যান্টার্টিকা

এ যে চেনা কণ্ঠস্বর!

এগিয়ে আসে সামনের দিকে। দেখে একটা পুঁচকে আর্টিক-টার্ন আকাশে পাক খেতে খেতে আনন্দে ডাকছে: কী-আহ্! কী-আহ্!

— তুই! কোথায় ছিলি এতদিন? — মানুষের ভাষায় প্রশ্নটা এমনই হবার কথা। কিন্তু এ ভাষায় তো কথা বলতে পারে না ঐ না-মানুষটা। সে শুধু বললে: কী-আহ্?

দিগন্তপ্রিয় আঁতিপাঁতি করে কি-যেন খুঁজছে। কমনখুড়ো — না, এখন থেকে ওর নাম কমনদাদু — বুঝতে পারে খোকন কী খুঁজছে। কিন্তু কেমন করে বোঝাবে? ওর মায়ের মৃত্যুর মর্মান্তিক দুঃসংবাদ অথবা বাপের বিবাগী হয়ে যাওয়ার কথা? দিগন্তপ্রিয়ও বোঝাতে পারে না — কোথায়, কী-ভাবে আটক পড়ে ছিল এতদিন। সেই বাজপাখির ভয়াবহ আক্রমণ, তার অলৌকিক মৃত্যু, নিজের উদ্বন্ধনে মৃতপ্রায় অবস্থার কথা! তারপর সেই অজানা-অচেনা দুটি আর্টিক-টার্ন-এর খাদ্যসরবরাহ, সেই দু-পেয়ে জীবদের যত্ন-আত্তি!

সে বারে বারে তার বাঁ-পাটাকে বাড়িয়ে ধরে দেখায়। দাদু লক্ষ্য করে দেখল, খোকনের পায়ে একটা খুব ছোট্ট সাদা আংটি মতো কী যেন পরানো। ওটা কী? কেমন করে আটকে গেল খোকনের পায়ে? — এসব প্রশ্ন তো আর করতে পারে না, সে বরং চেষ্টা করল ওটা খুলে ফেলে দিতে। পারল না। তবে দাদুর মনে হল, ঐ নূপুরটা পায়ে দিয়ে তার নাতির কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তা যদি হয়, তবে ওটা থাক।

দিগন্তপ্রিয়ও তার দাদুকে বোঝাতে পারল না— কীভাবে সেটা ওর পায়ে আটকে গেছে। এ সেই দুপেয়ের কীর্তি — সেই যিনি ওকে সূচ ফুটিয়েছিলেন। কেন এই অলঙ্কারধারণ, তাও জানে না। তবে এতে তার কোন অসুবিধা হয় না। সেও মেনে নিল — থাক ওটা!

বুড়ো সিদ্ধান্তটা বদলাতে বাধ্য হল। নাঃ! জীবনের দায় এখনো মেটেনি! দুনিয়াদারীর দু-কুড়ি-সাতের খেলাটা এখনো শেষ হয়নি। হোক ভিন্ন প্রজাতির — ও তো একই 'বর্গের' একই 'গণ'-এর। এই অনাথকে তার দক্ষিণ- গোলার্ধের পথটা চিনিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে মুক্তি পেতে পারে না। পথ চিনিয়ে-চিনিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে হবে ওর জীবনধর্মের তীর্থপ্রান্তে।

খোকন — এখন যার নাম হয়েছে 'দিগন্তপ্রিয়', সে মেনে নিল। মনকে সে কী বোঝালো তা আন্দাজ করার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু সে রাজি হয়ে গেল দাদুর সঙ্গে যাত্রা করতে।

উপায় নেই! দক্ষিণ দিগন্ত ওকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে ডাকছে! নিরক্ষ-অঞ্চলের সেই না-দেখা, না-চেনা গহন-অরণ্যানী, প্রবালদ্বীপের অযুত-নিযুত মাথা ঝামরানো নারিকেল-গাছ, তারপর দক্ষিণ মেরুর সেই অপরিচিত পেঙ্গুইন দল ওর অন্তর্লীন মস্তিষ্ক-বীণায় মীড়গমক তোলে! জেনেটিক কোডে বেজে ওঠে টরে-টক্কা! তার অর্থ বোঝা যায় না; আকর্ষণটা অনুভব করা যায়!



অমোঘ সে আকর্ষণ!

দাদু আর নাতি একদিন রওনা দিল দক্ষিণ-মুখো!

সমস্যাটা দেখা দিল কঙ্গো ডেল্টায় পৌঁছে। অতলান্তিকের পুবপারে, আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে কঙ্গো নদীর মোহনা মাত্র পাঁচ ডিগ্রি দক্ষিণ-গোলার্ধে । এটাই হচ্ছে কমনখুড়োর শীতাবকাশ — দক্ষিণগোলার্ধে যা আইন মোতাবেক গ্রীষ্মাবকাশ। প্রতি বছর এখানে তাকে পৌঁছে দিয়েই দৃঢ়পক্ষ তার বউকে নিয়ে আরও দক্ষিণে চলে যেত। এবার এই জটিল তত্ত্বটা দাদু কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না তার নাতিকে।

ইতিমধ্যে ওরা প্রায় আট হাজার কিলোমিটার উড়ে এসেছে তাদের সেই গ্রীনল্যান্ডের গ্র্যানাইট আবাস ছেড়ে। পার হয়েছে বে-অফ বিস্কে, পর্তুগাল, মরক্কো, মরিটানিয়া, সেনেগাল, সিয়েরা লিয়োন। বরাবর এসেছে সমুদ্র-উপকূল ধরে। লাইবেরিয়া পার হয়ে অনেকটা আসতে হয়েছে পুবমুখো — লাইগার-ডেলটার দিকে। অবশেষে এই কঙ্গো বদ্বীপ।

দাদু অনেক আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছিল — এখানেই সে থাকবে পুরো চার-পূর্ণিমা ; যতদিন না খোকন (ওর 'দিগন্তপ্রিয়' নামটা দাদু জানে না) ফিরে আসে উত্তরায়ণে। কিন্তু বোকাটা কিছুতেই সে-কথা বোঝে না। ক্রমাগত দাদুকে খোঁচায়, চল! দখিনপানে চল! — কী-আহ্! কী-আহ্!

দক্ষিণগামী আর্টিক-টার্ন দলের সঙ্গে খোকনকে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তারা খোকনকে অভ্যাসবশে ডেকে গেছে প্রজাতিগত কানুন মেনে। কর্ণপাত করেনি দিগন্তপ্রিয়।

খুড়ো তখন তার ভাইপোর প্যাঁচটা কষল!

দৃঢ়পক্ষ যেমন খুড়োকে ত্যাগ করে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করেছিল, সেভাবেই একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ও জানত — খোকন যখন ওকে খুঁজে পাবে না, তখন বাধ্য হয়ে অন্য কোনও দলের সঙ্গে দখিনপানে যেতে বাধ্য হবে। না গিয়ে তার উপায় নেই। প্রজাতিগত চৌম্বক-আকর্ষণের টান যে অমোঘ!

উত্তমাশা অন্তরীপে উপনীত হয়ে আবার এক নতুন সমস্যা।

দাদু নিরুদ্দেশ হবার পর যে দলটার সঙ্গে ও আফ্রিকার দক্ষিণ অংশটা পাড়ি দিয়েছে তারা ঘটনাচক্রে 'ম্যাডাগাস্কারিয়ান আর্টিক টার্ন'। অর্থাৎ উত্তমাশা-অন্তরীপ অতিক্রমণে তাদের পুবমুখো যাবার কথা। কিন্তু কী জানি কেন কিছুতেই তাতে রাজী হতে পারল না দিগন্তপ্রিয়।

ওর ছোট্ট মস্তিষ্কে পলিপেপটিড-শৃঙ্খলে যে জেনেটিক নির্দেশ — সপ্তপুরুষ নয় সহস্রপুরুষ তাকে যে সংস্কারের নির্দেশ দিয়ে রেখেছে — তাতে তার এখন সোজা দক্ষিণে উড়ে যাবার কথা — অ্যান্টার্টিকা অঞ্চলে, দক্ষিণ মেরুতে।



এতদিনের সঙ্গীদলের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করে সে নতুন দলের সঙ্গ নিল। এখন আর সে চুন্নুমুন্নু নয়, নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শিখেছে।

অবশেষে বোভে দ্বীপে একরাত্রি বাস করে কুইন মউ ল্যান্ড। খাশ অ্যান্টার্টিকার ভূ-খণ্ডে। না, ভূ-খণ্ডে নয়, বরফ-খণ্ডে!

খাদ্য এখানে প্রচুর। ছোট মাছ। এখন জানুয়ারী মাস। দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যগ্রীষ্ম। এই সময়েই আর্টিক টার্ন-এর প্রাথমিক পালক ঝড়ে পড়ে। দিগন্তপ্রিয়র পালকও একে একে খসে পড়ল। অর্ধনগ্ন দিগন্তপ্রিয় একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে! ওর পালক এভাবে খসে পড়ছে কেন? কিন্তু লক্ষ্য করে দেখে এ পরিবর্তন ওর একারই হচ্ছে না — অন্যান্য আর্টিক টার্নও একইভাবে অর্ধউলঙ্গ হয়ে পড়ছে। উড়তে পারছে না ভাল করে।

তবে বেশি দিন নয়। মাসখানেকের ভিতরেই আবার ওর নতুন পালক গজালো। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল ওর।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে এখানে সূর্য অস্ত যায় না। দিগন্তরেখা বরাবর পাক মারে। ফলে সারাটা গ্রীষ্মকাল দিন। মধ্যরাত্রে মাতালের ঘোলাটে চোখ মেলে সূর্যটা তাকিয়ে থাকে। তখনো তার আলো এসে পড়ে বরফের উপর — জ্যোৎস্নার মতো ম্লান সে আলো।

দক্ষিণমেরুর এই রাজ্যটা আর্টিক-টার্নদের মহামিলনক্ষেত্র। যারা প্রশান্তমহাসাগরের উপকূল ধরে উত্তরমুখো যায় আর যারা অতলান্তিক ঘরানার — দুইদলের আর্টিক টার্নই এই মহাতীর্থে তাদের দক্ষিণাভিযান সমাপ্ত করে। যেন কুম্ভমেলায় জমায়েত হয়েছে কেরালা আর মেঘালয়ের মানুষ! দু-দল একই প্রজাতির — ওদের মধ্যে বিয়ে সাদি হতে পারে — জীববিজ্ঞানমতে হলে তাদের সন্তানাদিও হবে; কিন্তু তা হয় না। মানে বিবাহটাই হয় না। হবু বর বা হবু কনে তা চায় না — কারণ দু-দলের পথ পরিক্রমা যে ভিন্ন সড়কে! বিবাহের পরে ওরা কোন পথে যাবে হনিমুনে? — কোভালম বীচ না শিলং? দিগন্তপ্রিয় তাই দেখল — দুই দলের স্বজাতীয়রা মেলামেশা করছে বটে কিন্তু জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার সময় অসবর্ণ বিবাহ করছে না। ওর অবশ্য এখনো সে-কথা চিন্তা করার সময় আসেনি; এখনো প্রজননক্ষমতাই লাভ করেনি সে। কিন্তু ব্যাপারটা ও বুঝতে পারে। লক্ষ্য করে।

মার্চ-এপ্রিলে নতুন পালক গজানোর পর ওর মনে একটা নতুন প্রশ্ন জাগল:

এই যে দখিনপানে যাওয়ার আকর্ষণ, সেটা এখানেই কেন শেষ হবে? 'দক্ষিণ' তো শেষ হয়নি। মহামিলন ক্ষেত্রেরও তো একটা 'দক্ষিণ দিক' রয়েছে। সেদিকে কেউ কেন যায় না? অনেককে 'কী-অ'... কী-অহ্' ডাক দিয়ে সঙ্গে যেতে ডেকেছে; কিন্তু কেউই রাজী হয়নি।

দিগন্তপ্রিয়র অন্তরে একটা ঘূর্ণী আছে। একদিন সে একাই রওনা হয়ে পড়ল — আরও দক্ষিণে যাবে বলে। দক্ষিণের চূড়ান্তটা সে দেখে আসবে! ঐ যেখানে দু-পেয়েদের রাজ্য — মানুষ নয়, পেঙ্গুইন।



পারল না। শীতাধিক্যেই শুধু নয়, প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে। দুরন্ত তুষার-ঝটিকার মধ্যে পড়ে গেল সে। বুঝল, এজন্যই ওদের শাস্ত্রে আরও

দক্ষিণে যাওয়া মানা। ঝড়ের বেগে সে যে কোথায় ছিটকে এসে পড়ল তা বুঝতেই পারল না। ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। এখানে মাটি নেই, পাথর নেই — শুধুই ভাসমান আইসবার্গ। শীতের প্রাবল্যেই হ'ক অথবা নিষিদ্ধরাজ্যে পদাপর্ণের পাপেই হ'ক ওর উত্তর-দক্ষিণ গুলিয়ে গেল!

ও বেচারি তো জানে না — এখানে কম্পাসও মাতালের মতো টলতে থাকে — ঠিকমতো উত্তর-দক্ষিণ নির্দেশ করতে পারে না।

দিগন্তের সব দিকেই শুধু বরফের পাহাড়! পরিচিত পাখিরা কেউ নেই — আর্টিক টার্ন, শিয়ারওয়াটার, প্লভার, এমনকি শত্রুপক্ষের স্কুয়া! আছে শুধু পেঙ্গুইন — তারা উড়তে পারে না!

আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে পরিচিত অঞ্চলে ফিরে আসতে পারল না। দিকভ্রান্ত পথিকের মতো এলোমেলো অনেকক্ষণ উড়ে ক্লান্ত হয়ে নেমে পড়ল বরফ-গোলা সমুদ্রে। আর্টিক টার্ন সীগাল-এর মতো স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে ভাসতে পারে না — ডুবেও যায় না তা বলে। নিতান্ত ক্লান্ত হলে ওরা জলে নেমে কিছুটা বিশ্রামও নিতে পারে। কিন্তু এখানে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঐ উথাল-পাতাল ঢেউয়ে সে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।

হঠাৎ ওর নজর হল — আকাশ ভেদ করে এক মহাবিহঙ্গ নেমে আসছে ওরই দিকে! প্রকাণ্ড তার দেহটা! এতবড় পাখি সে ইতিপূর্বে দেখেনি। পালাবার ক্ষমতা নেই! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল দিগন্তপ্রিয়। শুধু জৈবিক-প্রেরণায় ওর কণ্ঠ দিয়ে বার হয়ে এল ক্ষীণ আর্তনাদ — চৈচি — চৈচি — চৈচি!

মহাবিহঙ্গম স্থির লক্ষ্যে নেমে এল নিচের দিকে। ভয়ে দু-চোখ বন্ধ করল দিগন্তপ্রিয়। কিন্তু এ কী? মহাবিহঙ্গম ওকে ছোঁ-মেরে তুলে নিল না আদৌ! আল্‌তো করে ওকে ছুঁয়ে আবার উঠে গেল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আকাশে। এ জাতীয় তুষার-ঝঞ্ঝায় সে অভ্যস্ত। চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে তার! বারে বারে দেখেছে এ জাতীয় পথক্লান্ত পরিযায়ীদের। পক্ষিকুলের এই সম্রাট তাদের করুণা করে, উৎসাহ জোগায়। কতবার কত পাখিকে সে এভাবে বাঁচিয়েছে! যেন অমরনাথের পথের বৃদ্ধ পাণ্ডা। পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রী যদি গুড়িসুড়ি মেরে পথের ধারে বসে পড়ে তখন পাণ্ডাজী তার লাঠি উঁচিয়ে হাঁকাড় পারে: ফিন্‌ বৈঠ গিয়া! উঠ্‌, চল, বোল্‌ মুহ্‌সে: জয় ঁ অমরনাথজীকি!

চতুর্দিকেই ভাসমান আইসবার্গ। যেন ভরা-পূর্ণিমায় অমরনাথের স্ফটিক-লিঙ্গ!

ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে দিগন্তপ্রিয়র। ঐ অচেনা মহাগরুড় তাহলে শত্রুদলের নয় — স্কুয়া-বাজ-শিক্‌রের সমগোত্রীয় নয়। সে বন্ধু! সে ওকে ডাক্‌ছে, উঠে পড়তে বলছে জল থেকে!

অনিবার্য মৃত্যুর মুখ থেকে সদ্য ফিরে এসে — বিশেষ ঐ প্রকাণ্ড মহা-বিহঙ্গমের আশ্বাসবাণী শুনে সে নতুন করে উৎসাহ পায়। আপ্রাণ আয়াসে ছোট্ট দুটি ডানা ঝাপ্‌টে উঠে পড়ে জল থেকে।

মহাগরুড় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আকাশে একটা চক্কর মেরে আবার ফিরে এসেছে ততক্ষণে। ওকে ডাক দিল: গররর্‌!



অর্থাৎ ভয় নেই! আয় আমার পিছু-পিছু!

কাছেই একটা ভাসমান আইসবার্গ।

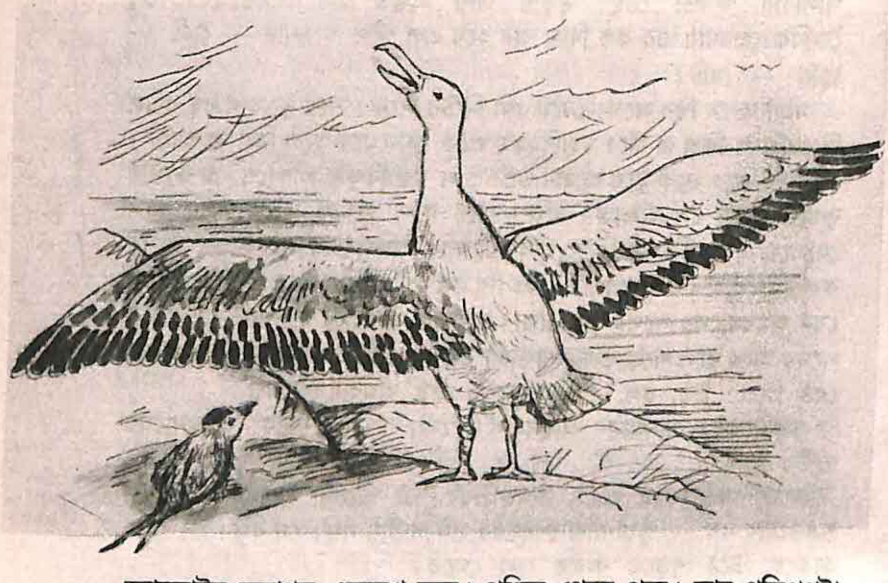
দুজনে আছড়ে পড়ল তার উপরে।

দিগন্তপ্রিয় তার দৈহিক ক্ষমতার শেষ সীমান্তে পৌচেছিল। বরফে আছড়ে পড়েই সে জ্ঞান হারালো।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে জানে না — জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখে মহাগরুড় তার দুই বিরাট ডানা বিস্তার করে ওকে ঝড়ের দাপট থেকে আড়াল করে ঠায় বসে আছে। ওর ডানার বিস্তার পুরো তিন মিটার। প্রায় দশ ফুট। মহাগরুড় পক্ষিকুলের সম্রাট: সাদার্ন অ্যালবাট্রস্!

একটু পরে ঝড়ের বেগ আপনিই কমে গেল। এখন আবার চারপাশ দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ দুরন্ত তুষার-ঝঞ্ঝায় দু-হাতের বেশি নজর চলছিল না — সবটাই ছিল শুভ্র অন্ধকারে বিলীন!

মহাগরুড় ইঙ্গিত করল ওকে। দু-জনে আবার এসে পৌছালো আইসবার্গের কিনারে। 'ক্রিলাকীর্ন' সে ভোজের আসরে খাদ্যের অভাব নেই। দুজনেই ক্ষুধার্ত। পেটভরে 'ক্রিল' খেয়ে নিল প্রথমে। তারপর মহাগরুড়ের ইঙ্গিতে দিগন্তপ্রিয় তার পিছু পিছু উঠে পড়ল আকাশে।



অ্যালবাট্রস ক্রমাগত একমুখে চলে। পশ্চিম থেকে পুবে। তার গতিপথটা ঢেউ-এর মতো। যেন কালাজ্বর রুগীর টেম্পারেচার চার্ট! এই উঠে যাচ্ছে আকাশের চূড়ায়, এই নেমে আসছে পাতালে! কিন্তু বরাবর একমুখো — পশ্চিম-পুব। কয়েক মাসের মধ্যে গতিমুখ পরিবর্তন না করেও ওরা ফিরে আসে সেই 'আমড়াতলার মোড়ে'! কারণ ওরা সচরাচর অক্ষাংশ বদল করে

না। দক্ষিণমেরুটা ক্রমাগত পাক মেরে ফেরে — কেউ চল্লিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ ষাট দক্ষিণ-অক্ষাংশ বরাবর। মহাগরুড় তার চল্লিশ বছর বয়সে বিশ ত্রিশ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে।

'চূড়ান্ত-দক্ষিণ' দেখার সখটা মিটেছে! এখন ও মহাগরুড়ের অনুগামী। তবে ওর মতো ঢেউ তুলে বায়ুগতিনির্ভর গ্লাইডিংটা অভ্যাস করতে পারেনি। দিগন্তপ্রিয় ওর সঙ্গে আর্টিক সার্কেল বরাবর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। পশ্চিম থেকে পুবে। ভারত মহাসাগর — তাসমানিয়ার দক্ষিণ, নিউজিল্যান্ডের লেক, প্রশান্ত মহাসাগর, কেপ হর্ন-এর শেষপ্রান্ত হয়ে আবার ফিরে এল প্রায় সেই কুইন ম'ড ল্যান্ডে — পূর্ণকুম্ভমেলার আসরে। কিন্তু মেলা তখন ভেঙে গেছে। দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মও ততদিনে খতম। যে কুম্ভমেলার আসরে দেখেছিল লাখ্-লাখ্ আর্টিক টার্ন, এখন তা প্রায় পক্ষিহীন!

—কী-অহ্! কী-কী-কির্‌রে···

দারুণ চমকে উঠেছে দিগন্তপ্রিয়। এযে সেই চেনা সুর। এ যেন আফ্রিকার গভীর অরণ্যে অপরিচিতের কণ্ঠে: ডক্টর লিভিংস্টোন, আই প্রিজ্যুম?

অনেক অনেকদিন পরে, আর্টিক টার্ন-এর ডাক!

'কী-অহ্' এবং 'কিররে' একই নিশ্বাসে।

দিগন্তপ্রিয় বাঁক ঘুরে উপর দিকে তাকালো। নীল আকাশে একটি একক পক্ষী — সেই ওকে বলেছে '—কী-অহ্' — 'এই যে! শুনছেন?'

এবং '— কী-কী-কিররে' — 'আমার ভারী বিপদ'!

দিগন্তপ্রিয় ওকে ঘিরে বার কতক পাক খেল। দেখল, ওটা পাখি নয়, পক্ষিণী — প্রায় ওর সমবয়সী। ওকে দেখে মেয়েটি আশ্বস্ত হল। দুজনে পাশাপাশি ভেসে চলল সাউথ জর্জিয়া দ্বীপের দিকে।

আর্টিক টার্নের কয়েকটি দল তখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যারা এ ভাঙাহাট ছেড়ে যায়নি। ওরা দুজনে সামিল হল সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টার্ন দলে।

মহাগরুড় বুঝতে পারে, তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। বার দুই পাক মেরে সে একটা তীক্ষ্ণ ডাক দিল: গ্ররর···

: গুডবাঈ! বেস্ট অব্ ল্যাক!

দিগন্তপ্রিয়ও ডেকে ওঠে: কী-আহ্!

: বঁ ভয়েজ!

অ্যালবাট্রস্ রওনা হয়ে গেল তার নিরবচ্ছিন্ন দক্ষিণ মেরু বলয়ের পরিক্রমা পথে!

মেয়েটির সঙ্গে ওর ভাব হল। কিন্তু দিগন্তপ্রিয় বুঝে উঠতে পারে না — ওর সমস্যাটা কী? হয় তো বাপ-মাকে হারিয়েছে। উপায় কী? অনেক দল তো এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওদের সঙ্গে মেয়েটি তো অনায়াসে এবার তার উত্তরমুখী যাত্রা শুরু করতে পারে। অতি পরিচিত বাসাটা সে খুঁজে পাবে না? যেখানে সে জন্মেছে? তার বাপ-পিতেমো জন্মেছে? সেখানেই হয়তো দেখা হয়ে যাবে পরিচিতদের সঙ্গে।



রোজই দু-চারদল উত্তরমুখো রওনা হচ্ছে। তারা যাবার সময় কানুন-মাফিক ডাক দিয়েও যাচ্ছে। দিগন্তপ্রিয় মেয়েটিকে তাগাদা দেয় : চল না, এই দলের সঙ্গে রওনা দিই। এখানকার গ্রীষ্ম যে শেষ হয়ে এল! দেখছ না আকাশে ঝিলিক দিচ্ছে?

এ ভাষায় বলেনি। অরোরা অস্ট্রেলিস্‌টা যে গ্রীষ্মসমাপ্তির সূচক এটা কিন্তু সে বুঝে নিয়েছে। আর দেরি করা ঠিক নয় — কিন্তু কিছুতেই মেয়েটিকে রাজী করাতে পারে না। সে যাবেও না, আবার দিগন্তপ্রিয়কে যেতেও দেবে না। ক্রমাগত আতঙ্কিত আর্তকণ্ঠে বলে যায়: কী-কী-কী-কির্‌রে!

দিগন্তপ্রিয়র দারুণ বুদ্ধি!

সে সমঝে নিল শঙ্খশুক্লার সমস্যাটা!

ও হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্টিক-টার্ন। তারা ভিন্ন পথের পথিক। বস্তুত প্রশান্ত মহাসাগরীয়রা মেলাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করে যায় অতলান্তিকীদের মাসখানেক আগে। কেন, তা তারাই জানে। এখন এই ভাঙা-মেলার আসরে যারা রয়েছে তারা সবাই ফিরে যাবে আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূল বরাবর — সেটা শঙ্খশুক্লার পরিযায়ী-পথ নয়। হয়তো ঝড়ের দাপটে অথবা অন্য কোনও কারণে শঙ্খশুক্লাও পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ঠিক ওরই মতো। অনেক কষ্টে কুম্ভমেলার আসরে ফিরে এসেছে; কিন্তু এখন দেখছে তার দেশ-ওয়ালীরা আর কেউ নেই। তাই ঐ কী-কী-কী-কির্‌রে!

দিগন্তপ্রিয় ওকে বোঝালো, আদর করল, সোহাগ করল, প্রচণ্ড ধমকও দিল। শেষমেশ বাধ্য হয়েই রাজী হয়ে গেল শঙ্খশুক্লা। এখানে পড়ে থাকলে অবধারিত মৃত্যু! ঠিক আছে — ভিনদেশেই যাবে সে।

প্রায় তিন পূর্ণিমা পাড়ি দিয়ে ওদের দলটা এসে পৌঁছালো চেস্টারফিল্ডের সেই গথিক-গীর্জার ঘণ্টাঘরে। ফেরার পথে — কেউ ওকে বলেনি, তবু — কঙ্গো বদ্বীপে সে দাদুর খোঁজ করেছিল। সন্ধান পায়নি। তারপর এসে পৌঁচেছে ইংলন্ডে।

ওরা দুজনের কেউই প্রাপ্তবয়স্ক নয়। যৌন আকর্ষণ অনুভব করছে না। প্রজননক্ষমতা কারও নেই। তবু দুজনেই দুজনের উপর নির্ভর করে। মাছটা, ব্যাঙটা ভাগ করে খায়। যাকে বলে: কাফ্ ল্যভ্!

গীর্জার ঘণ্টাঘরে শঙ্খশুক্লাকে রেখে দিগন্তপ্রিয় এবার চলল একটা পরিচিত বাড়ির সন্ধানে। পথ চিনতে কোনই অসুবিধা হল না তার। ওর মনে হল, ফেরার পথে সেই দুপেয়ে মানুষগুলোর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়া ওর কর্তব্য। সেই ঝাঁকড়া চুলো হাফপ্যান্ট-পরা দুপেয়ে আর তার মা। আহা! কী যত্নটাই না তারা করেছিল।

তখন সন্ধ্যা হব-হব। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু গোধূলির রেশ মেটেনি। বাড়িটার কাছাকাছি এসে ও সেই মোটা তারটার উপরেই বসল। যে তারে পা আটকে তাকে ঝুলতে হয়েছিল একদিন! উ! কী যন্ত্রণাদায়ক সে দিনগুলো।

ঐ তারে বসেই দিগন্তপ্রিয়র নজর হল — ওদের বাড়ির উঠানে ইজিচেয়ারে পেতে বসে আছেন সেই ভদ্রমহিলা। ওর দিকেই তাকিয়ে বসে আছেন। তারপর উনি চট্ করে উঠে ঘরের ভিতর গেলেন। পরমুহূর্তেই ফিরে এসে কালো একটা যন্তর চোখে লাগিয়ে ওকেই দেখতে থাকেন।

দিগন্তপ্রিয় বুঝতে পারে — উনি ওকেই দেখছেন। বোধহয় দেখতে চাইছেন ওর পায়ের সেই গয়নাখানা খোয়া গেছে কিনা। ও মনের আনন্দে ডেকে ওঠে: কী-আহ্! কী-আহ!

আকাশে দুটো পাক মেরে ঝুপ করে নেমে আসে ওঁর বাগানে।

মহিলা এক ছুটে আবার ঢুকে গেলেন বাড়ির ভিতর — নিশ্চয় সেই ঝাঁকড়া-চুলো ছেলেটাকে ডেকে এনে দেখাতে — ভাবে ও!

ছেলেটা এল না। উনিই ফিরে এলেন কতকগুলো 'নাট্স্' হাতে। ছড়িয়ে দিলেন বাগানে। ওর দিকে, ওর নাগালের মধ্যে।

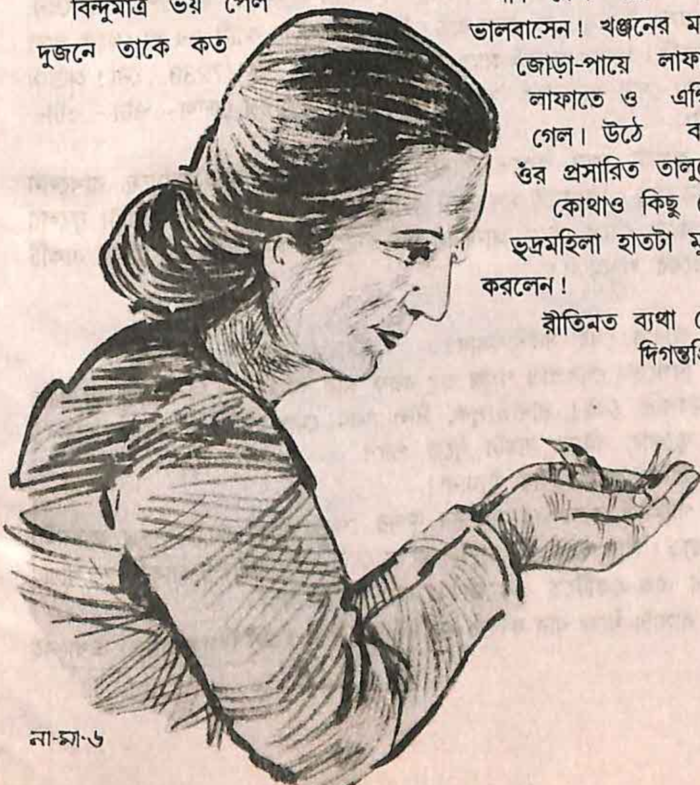
দিগন্তপ্রিয় টুকিয়ে টুকিয়ে দু-চারটে খেল। আরও ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো পড়ে রইল; কিন্তু সে দিকে ওর আর নজর নেই। ডেকে উঠল: কী-অহ্?

: কই সেই ঝাকড়া-চুলোটা কই?

মহিলাটি তাঁর হাত দুটো প্রসারিত করে দিয়ে কী যেন বললেন। দু-পেয়েদের ভাষায়। বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না। কিন্তু ওঁর প্রসারিত বাহুর মুদ্রার অর্থটা বুঝল। উনি দেখতে চান — দিগন্তপ্রিয় ওঁর হাতের তালুতে গিয়ে বসে কি না — সেই আগের মতো! ভয় পায় কি না এতদিন পরে।

বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। কেন পাবে? ওঁরা দুজনে তাকে কত ভালবাসেন! খঞ্জনের মতো জোড়া-পায়ে লাফাতে লাফাতে ও এগিয়ে গেল। উঠে বসল ওঁর প্রসারিত তালুতে। কোথাও কিছু নেই ভদ্রমহিলা হাতটা মুঠো করলেন!

রীতিমত ব্যথা পেল দিগন্তপ্রিয়!



মুষ্টিবদ্ধ হাতটা উনি বুকের উপর রেখে যেন চীৎকার করে কী একটা কথা বললেন! ছেলেকে চীৎকার করে ডাকলেন কি? বুঝতে পারল না। ওর মনে হল ওটা কাউকে ডাকার শব্দ নয়। ওটা আর্ত হাহাকার! একটা বুকভাঙা আর্তনাদ!

অর্থাৎ ওটা — কী! কী-কির্‌রে!

ওকে নিয়ে উঠে গেলেন ঘরে। কী একটা যন্ত্র বার করে ওর পায়ের আংটিটা সাবধানে কেটে খুলে নিলেন। তারপর সেবার সেই ওঁর ছেলেটা যেমন করে ওকে নীল আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেভাবেই ওকে উড়িয়ে দিলেন। মুখেও বললেন — কী-যেন!

দিগন্তপ্রিয় কিন্তু উড়ে গেল না। ফিরে এল সে একটা চক্কর মেরে। বললে, কী-অহ?

: কই? তোমার ছেলেটা কই? তাকে ডাক!

ভদ্রমহিলা তখন দু-হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদছেন! কেন? কী হয়েছে?

: কী-অহ্?

উনি জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। কাচের সার্সির ভিতর দিয়ে ও দেখতে পেল — উনি এগিয়ে গেলেন সেই টেবিলটার দিকে। যন্ত্রটা তুলে নিয়ে দু-পেয়েদের ভাষায় কার সঙ্গে জানি কী-সব কথা বলতে থাকেন!

বেচারি দিগন্তপ্রিয়! সে মনুষ্যভাষ বোঝে না।

বুঝলে সে আন্দাজ করতে পারত কী মর্মান্তিক বেদনায় উনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছেন। মিসেস কন্‌ওয়ে তখন টেলিফোনের মাউথপীসে বলছেন, 'ইয়েস... ইয়েস্ ... দ্য সেম বার্ড! হ্যাঁ... রিংলেটটা আমি ওর পা থেকে খুলে নিয়েছি। আমার হাতেই আছে সেটা। সেই নম্বর : এস/7239... নো! আয়াম সরি! সেটা আপনাকে ফেরত দিতে পারব না ডক্টর জোন্স... ওটা... ওটা... ওটা...

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন রিসিভারে। কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না — রিংলেটটা ফুলের ব্যকেতে গেঁথে রেখে আসবেন চার্চ-ইয়ার্ডের সিমেট্রিতে — ছোট্ট একটি কবরের পাদমূলে!

আবার সেই সর্বতীর্থসার!

দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত শুধু বরফ আর বরফ! দশ-বিশ মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই। সাদাভালুক, সীল আর মেরু-হরিণদের খাশ-তালুক।

ভূগোল বইতে নামটা খুঁজে পাবে — ব্যাফিন বে!

গ্রীনল্যান্ডের উত্তর সীমানা।

গাঢ়নীল বরফগলা সমুদ্রের উপর থেকে খাড়া উঠে গেছে গ্র্যানাইট পাহাড়। তার গায়ে মৌ-চাকের মতো ছোট ছোট অসংখ্য প্রাকৃতিক খোপ। তার এক-একটিতে একজোড়া করে আর্টিক-টার্ন।

বাসাটা খুঁজে বার করতে কোনই অসুবিধে হয়নি দিগন্তপ্রিয়র। এখানেই



জন্মেছে ওর বাপ, ঠাকুর্দা — ও নিজে।

আবার এখানেই জন্ম নেবে শঙ্খশুক্লার অনাগত সন্তান।

হয়তো এবছরই নয়। আগামী বছর।

দুটিতে ভালই জুটি বেঁধেছে।

এমনটা সচরাচর হয় না, মানছি তো।

জীবনের প্রথম দক্ষিণযাত্রায় কোন আর্টিক টার্নই জীবনসঙ্গিনী খোঁজে না। কিন্তু ব্যতিক্রমই তো জগতের নিয়ম। দিগন্তপ্রিয় যে তেমনই এক ব্যতিক্রম — একথা কি আগে বলিনি ? দক্ষিণদিকের চূড়ান্ত দেখবার সখও তো আর কারও হয় না। ব্যতিক্রম বলেই সে হয়েছে আমার কাহিনীর নায়ক।

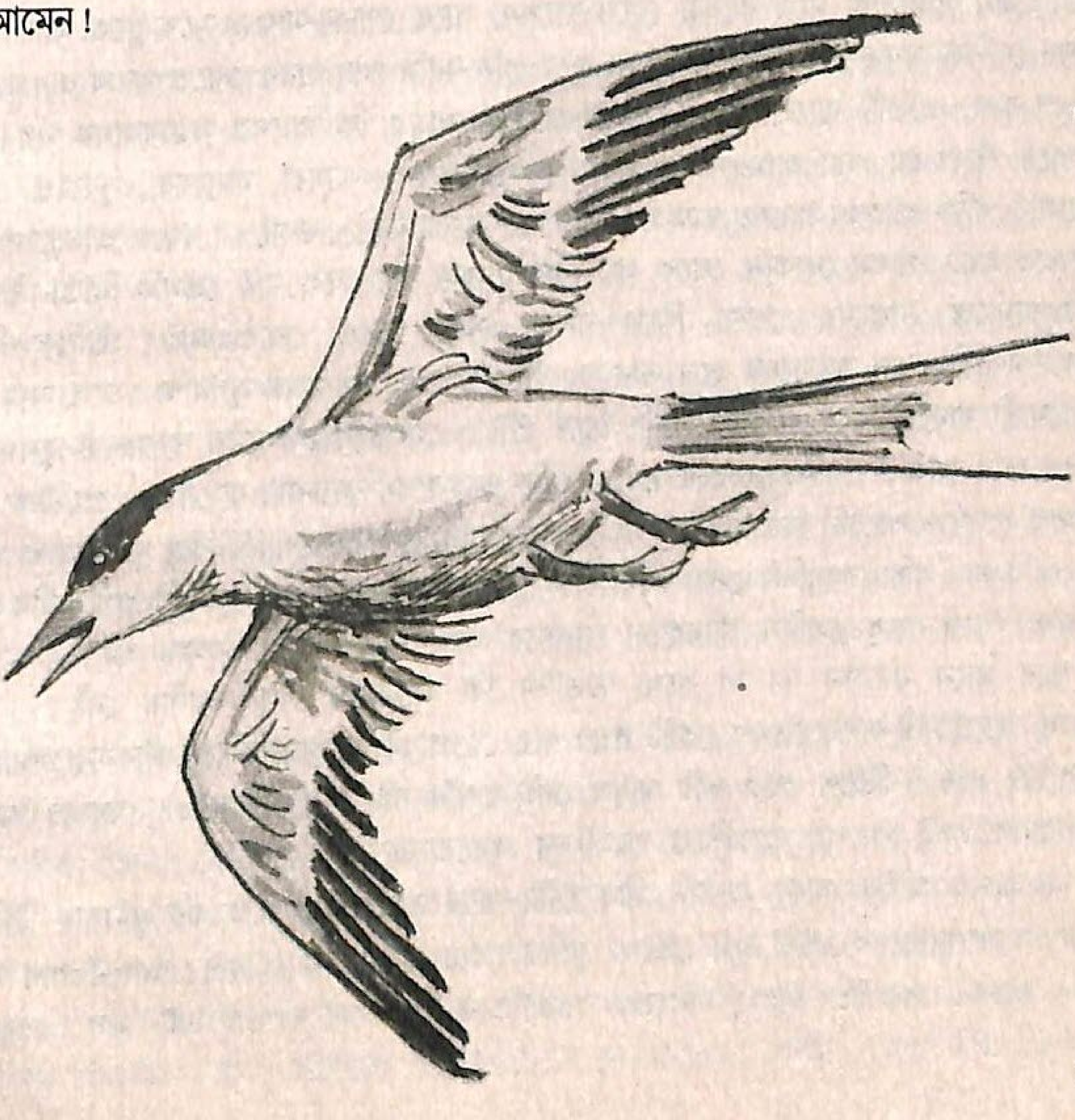
ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে। দেবদাস পারুর মতো; বৈঁচিফলের মালাহাতে বেণীদোলানো রাজলক্ষ্মী আর ডানপিটে শ্রীকান্তের মতো। তারাও তো পরস্পরকে ভালবাসতো। প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই!

নাঃ! ও তুলনা দুটি না দিলেই বোধহয় ভাল হত। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর — না পার্বতী, না রাজলক্ষ্মী কেউই তাদের বাল্যসঙ্গীকে সার্থক করে তুলতে পারেনি নতুন প্রজন্মের সাফল্যে!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি : আহা! সে সুখ থেকে শঙ্খশুক্লা যেন বঞ্চিতা না হয়! সে যেন নতুন যুগের নতুন দিগন্তপ্রিয়ের 'মা' হতে পারে।

স্বর্গত মাস্টার জেমস্ কনওয়ের মতো এবার আপনারা বরং বলুন :

আমেন!



নিরপরাধ ফাঁসির আসামী

ঈশ্বরকে যদি মানো তাহলে দায়িত্বটা তাঁর স্কন্ধে চাপানো চলে। বিজ্ঞান ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, তাই দায়িত্বটা কারও ঘাড়ে চাপাতে পারে না; বলে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমি জীব জগতের ঐ 'খাদ্য-খাদক' সম্পর্কটার কথা বলছি। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী সন্ন্যাসী একবার ক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছিলেন, "The scheme of the universe is devilish ! I could have created a better world." [বিশ্বপ্রপঞ্চের পরিকল্পনার পিছনে একটা শয়তানী লুকিয়ে আছে! এর চেয়ে ভাল একটা জগৎ আমি নিজেই তৈরী করতে পারতাম!]

হক কথা! ঈশ্বরের হাতে যে ক্ষমতা এবং যে সময় ছিল তাতে তিনি এর চেয়ে ভাল একটা জীবজগৎ কেন বানাতে পারলেন না ভেবে অবাক লাগে। যতই তাঁকে দয়াময় আর করুণাময় বলি, এই খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাপনাটা তো তাঁরই সৃষ্টি? সাড়ে-তিনশ কোটি বছর আগে নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে যেদিন প্রথম প্রাণের সঞ্চার হল, সেদিন সবার আগে সে যা বলেছিল তা—ম্যয় ভূখা হুঁ! তারপর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই ব্যবস্থা চলেছে। স্মরণীয়, ঈশ্বরের দূতের দল যুগে যুগে পৃথিবীতে এসে বলে গেছেন, 'ভালবাসো! অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশ!' কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং কেন তৈরী করলেন এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক? সুন্দর পাখিটা কেন তেড়ে গিয়ে হত্যা করে সুন্দর প্রজাপতিটাকে? বুদ্ধদেব বলেছিলেনঃ 'প্রাণী হত্যা কর না'! জৈন সন্ন্যাসীরা মুখে কাপড় বেঁধে রাখেন, পাছে পোকা-মাকড় মুখে ঢুকে মারা যায়। অথচ দৈনিক অযুত-নিযুত প্রাণীহত্যা না-করে তুমি-আমি প্রাণ ধারণ করতে পারব না। প্রতিটি তণ্ডুল-কণা, প্রতিটি ডালের দানা, আতা-আপেল-আঙুর কি প্রাণের সম্ভাবনাময় নয়? সে হিসাবে জীবহত্যা করা আমাদের অনিবার্য ললাট-লিখন। আমরা, মানুষেরা, সূর্যরশ্মি থেকে সরাসরি শক্তি আহরণ করতে অক্ষম। ভিখারির মতো উদ্ভিদ জগতের কাছে আমাদের হাত পাততে হয়। র‍্যাশন-দোকান থেকে গম নিয়ে যেমন গম কলে যাই তেমনি নিত্যি-ত্রিশদিন সূর্যপ্রণামান্তে উদ্ভিদের দোরে গিয়ে বলি, একটু ভেঙে দেবে ভাই? উদ্ভিদ নিজে 'সূর্যরশ্মিপায়ী'। সে আমাদের হয়ে তার 'সালোক-সংশ্লেষ গমকলে' সূর্যরশ্মি ভেঙে আমাদের উপযোগী খাদ্য বানিয়ে ফেলে। মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেল, কিন্তু পায়ের তলার ঐ তৃণখণ্ডের হিম্মৎ তার আজও হয়নি: সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি আহরণের কায়দাটা জানে না। প্লাস্টিক খাদ্য আজও বানাতে পারেনি বিজ্ঞান! গাছ কেটে আমরা নির্মূল করতে পারি, কিন্তু দূর্বাঘাস যা পারে তা পারি না। যদি কোনদিন সেটা শিখতে পারে বিজ্ঞান—মানুষকে 'সূর্যরশ্মিপায়ী' জীব করে তুলতে পারে, শুধু সেদিন জীবহত্যা না-করে আমরা প্রাণধারণে সক্ষম হব।

তার মানে যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন কি আমাদের কিছু করণীয় নেই?

না, আছে। ঐ সাড়ে তিনশ কোটি বছর ধরে যে প্রাকৃতিক ছন্দ-বিধানে জীবনসংগ্রাম চলে আসছিল মাত্র দু-তিনশ বছর ধরে মানুষ সেই ছন্দটা নষ্ট করে ফেলেছে। তোমার আমার বাপদাদার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে।

বিবর্তনের আইন মেনে প্রতিটি জীব চেষ্টা করে তার প্রজাতিকে এই দুনিয়ায় টিকিয়ে রাখতে। প্রাণধারণের এটাই মূল প্রেরণা, দুনিয়াদারীর প্রথম পাঠ। 'চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা' নয়—'আপন প্রজাতি বাঁচা!' নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার এই মূল প্রেরণাটা

কোটি-কোটি বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত—জল-স্থল-অন্তরীক্ষে, সারা দুনিয়ায়। কত কত প্রজাতি আবির্ভূত হয়েছে, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বছর নর্তনকুর্দন করে সরে গেছে মহাকাল-নাটমঞ্চের উইংসের আড়ালে। অমন যে অসীম পরাক্রমশালী টিরানোসরাস রেক্স—পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ স্থলচর মাংসাশী প্রাণী—সেও হেরে গেল লড়াইয়ে। অমন যে মহাশক্তিধর 'সেবর্-টুথড় টাইগার'—যারা কয়েক কোটি বছর ধরে দাপটের সঙ্গে পৃথিবী শাসন করেছে, তারাও মাথা নত করে পরাজয় মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা একেবারে হারিয়ে যায়নি—কারণ তাদের বংশধরেরা বিবর্তিত-আকারে এসেছে এই দুনিয়াদারীর রঙ্গমঞ্চে—নতুন নামে তাদের আমরা ডাকি। টিরানোসরাস রেক্স ছিল ডাইনোসর, বিশালদেহী সরীসৃপ—তা থেকে বিবর্তিত হয়েছিল পরবর্তী কল্পের স্তন্যপায়ী। 'ছোরা-দেঁতো বাঘ' যার কাছে হার মেনে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে গেল, সে বিবর্তনের পথে এসেছে আরও ক্ষমতাশালীরূপে। ক্ষমতা তার দেহে নয়, মস্তিষ্কে। যার কাছে সে হার মেনে অবলুপ্ত হয়ে গেল সেই দ্বিপদী জীবটির নাম: মানুষ!

এটাই ছিল তিন সাড়ে-তিনশ কোটি বছর ধরে খেলার আইন!

তারপর ঘটল একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। বিবর্তনের পথে ঐ যে দ্বিপদী জীবটি আবির্ভূত হল দুনিয়ায়, সে ঐ চিরকালের ছন্দটা লঙ্ঘন করল। এতদিন জীবন-সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাণধারণের তাগিদ। মাংসাশী প্রাণীর প্রয়োজন খাদ্য, শাকাশীর নিরাপত্তা। খাদ্য-খাদক সম্পর্কটাই এতদিন একমাত্র ছিল বিবেচ্য। মানুষ খাদ্যের প্রয়োজনে নয়, ভিন্নতর প্রয়োজনে জীবহত্যা শুরু করল। আজ থেকে দশ-বিশ হাজার বছর আগে। যখন শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে সে পশুচর্মে দেহ আবরিত করতে শুরু করল। হরিণ, গরু, ঘোড়া, বাইসন সে হত্যা করত খাদ্যের প্রয়োজনে। কিন্তু শ্বেতভল্লুক শিকার করত তার চামড়ার লোভে। হ্যাঁ, মারাত্মক ঐ শব্দটা—'লোভ'! প্রাণীজগতের সাড়ে তিন-শ কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে ঐ ধারণাটা এতদিন ছিল না যে! কাম ছিল, ক্রোধ ছিল, ছিল না: লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য! জীবজগতে ঐ শেষোক্ত চার রিপুর যেটুকু প্রকাশ আমরা দেখি, তার মূল প্রেরণা: ক্ষুধা। জীবনধারণের এবং বংশরক্ষার। মানুষ আমদানি করল নতুন জীবনছন্দ। আগুনের ব্যবহার শিখল সে—শিখল তিমি আর সীলমাছের চর্বি দিয়ে বাতি জ্বালতে। 'মদ' আর 'মোহ' নিয়ে এল বিলাস, অলঙ্কার, বৈভব। হাতির দাঁতের শৌখিন জিনিসের প্রয়োজন হল তার। সাপ বা কুমির তার খাদ্য নয়, কিন্তু ওদের চামড়াটা দরকার—জুতো, পোশাক, ব্যাগ বানাতে। বীভার, মিংক-এর কোট, মুক্তার দুল, লাক্ষার শীলমোহর সবই প্রয়োজন হয়ে পড়ল একে একে। মদ-মোহের প্রভাবে হরিণ-মোষ-বাঘের মাথা স্টাফ্ড় করে রাখার ফ্যাশন শুরু হল বিত্তশালী মহলে।

অরণ্য নির্মূল করে, পরিবেশ দূষিত করে, সে অসংখ্য জীবের পক্ষে এই পৃথিবীটাকে বাসের অযোগ্য করে তুলল। মেরে-মেরে-মেরে নিঃশেষ করে দিল কত প্রাণী—মোয়া, ডোডো, প্যাসেঞ্জার পীজন! কেউ দু-তিনশ বছর আগে, কেউ হালে শেষ হয়েছে। এই যে অবক্ষয়, এই যে নিঃশেষে মুছে যাওয়া—এটা কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে নয়। এবার আর আমাদের বলবার অধিকার রইল না: "নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে, আসব যাব চিরকালের সেই আমি।" কারণ এবার ঐ হারিয়ে-যাওয়া না-মানুষগুলি থেকে নতুন কোন না-মানুষ বিবর্তিত হয়নি! মানুষের অত্যাচারে ঐ না-মানুষেরা হারিয়ে গেল বামীর হাতের

প্রদীপশিখায় আলোর মতো। তার পরিপূরণ হল না! আকাশ-ভরে যে কান্নাটা জেগেছিল তার শেষ রেশও মিলিয়ে গেছে। মানুষের সে অপকীর্তির কিছু চিহ্ন হয়তো আজও খুঁজলে দেখতে পাবে। যেমন ইংরেজি ভাষায় একটা লব্জ ঃ Dead as dodo ; অথবা মার্কিন মুলুকের স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্সস্টিটুটে : 'মার্থা' !

সারা পৃথিবীর কথা যাক। ভারতের কথাই বলি। আমরা কী অসভ্যের মতো বনসম্পদ নষ্ট করে চলেছি! জ্বালানি কাঠের লোভে, বন কেটে বসত করার মোহে। রাশিয়াতে মাথা পিছু বনভূমি হচ্ছে 3.6 হেকটেয়ার, কানাডায় সেটা তার পাঁচ-ছয় গুণ ঃ 20 হেকটেয়ার। গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে অরণ্যভূমির অনুপাত—মাথাপিছু 1.04 হেকটেয়ার। আর ভারতের? এক হেকটেয়ার নয়, আধাও নয়, সিকিও নয়—কুল্যে 0.13 হেকটেয়ার!

ছেলেবেলায় যখন দার্জিলিঙে যেতুম, ছোট রেলে চেপে নজরে পড়ত দিগন্ত-অনুসারী মহা-অরণ্য! সবুজের সে এক মহোৎসব! এখন দার্জিলিঙ-পাহাড় উলঙ্গ! বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে, সিঞ্চল-হ্রদে জল আর জমে না! তাই যে হবার কথা! আজকের দিনেও গোটা ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার পরিমাপ তিনশ কোটি একার-ফুট। তার মানে গোটা ভারতে গোটা বছরে যে বৃষ্টিপাত হয় সেই জল যদি সবটা ধরে রাখা যেত তাহলে তিনশ কোটি একার জমিতে একফুট জল দাঁড়াতো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই জল ভারতবাসীর পক্ষে যথেষ্ট। পানীয় হিসাবে এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে—মায় জীবজন্তু, গাছ-পালা, শস্য প্রভৃতি। কিন্তু জলটা আমরা ভোগ করতে পারছি না। কেন? যে-হেতু কেটে-কেটে-কেটে আমরা বনভূমিকে ঐ মাথাপিছু 0.13 হেকটেয়ারে কমিয়ে এনেছি! বর্ষার জলধারাকে মাটি ধরে রাখতে পারছে না। গাছের শিকড়ই পারে বর্ষার জলধারাকে ভূগর্ভস্থ-ভাঁড়ারে সঞ্চয় করতে! ঐ সূর্যরশ্মিপায়ী গাছই তা পারে, 'সবার উপরে মানুষ সত্যর' তা ক্ষমতায় কুলায় না! ফলে নানা অঞ্চলে সাময়িক বন্যা সৃষ্টি করে দেবতার সেই আশীর্বাদ সমুদ্রে ফিরে যায়। অরণ্যের অভাবেই ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে, জমির উপরতলার সারভরা মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাদাদের নির্দেশে আমাদের যুবশক্তি বাৎসরিক চাঁদা সংগ্রহে বার হচ্ছে—একবার বন্যার জন্য, একবার খরা!

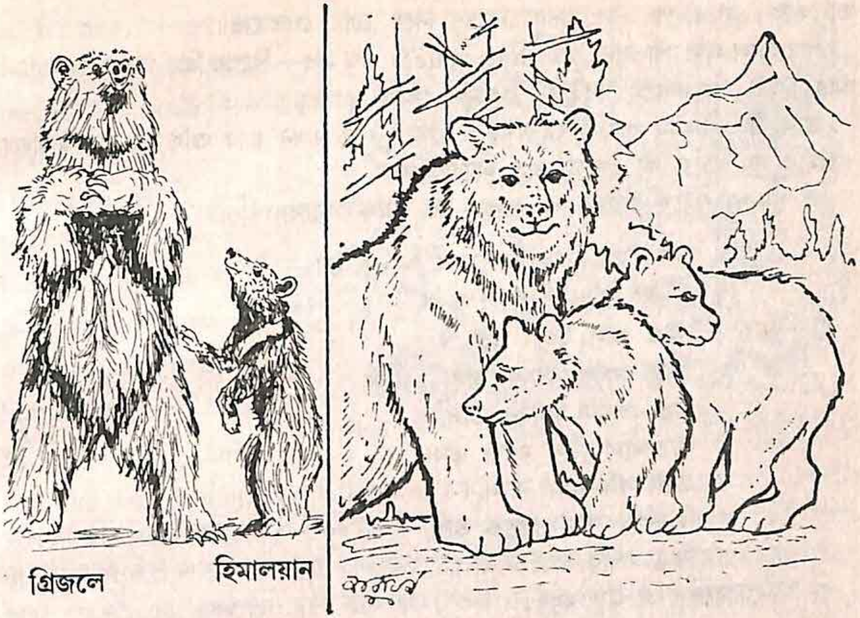
ঠিকাদারের ট্রাকের সারি যথারীতি চলেছে গাছ কেটে নিয়ে। তাকে কেউ রুখছে না! ইজারাদার বিভিন্ন দেবতার দোরে ঠিকমতো প্রণামী দিয়ে যায় যে!

যাক, সে সব কথা। আপাতত শোনাতে বসেছি কিছু না-মানুষের কথা। যারা মানুষের অত্যাচারে শেষ হয়ে গেছে অথবা ফাঁসির আসামীর মতো নির্জন কারাগারে প্রহর গণে। এরা জানে না—মানুষের দরবারে এরা কোন্ অপরাধে অপরাধী! কেন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেবতার-প্রতিস্পর্ধী ঐ দ্বিপদী প্রতিবেশী : মানুষ!

ঐ সঙ্গে শোনাব কিছু দরদী মানুষের কথাও। যাঁদের প্রচেষ্টায় ঐ অবক্ষয় কিছুটা রোখা গেছে। শুভবুদ্ধির সেই সব বিজ্ঞানীই আজ গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট অথবা সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসীর উত্তরসূরী! এই বেদনাময় কাহিনীর ঘনান্ধকারে ঐটুকুই রূপালী রেখা :

1. মেক্সিকান গ্রিজলি ভালুক [Grizzly Bear : *Ursus horribis nelsoni*] :

ভারতে আমরা সচরাচর তিন জাতের ভালুক দেখতে পাই। এক নম্বর : স্লথ ভালুক—পথেঘাটে ভালুক-নাচিয়েরা যাদের নিয়ে খেলা দেখায়। সারা ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে



গ্রিজলে হিমালয়ান

এদের দেখতে পাওয়া যায়। আকারে ছোট। পোষ মানে। দু-নম্বর : হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের কালো ভালুক। বুকে সাদা লোমের 'ভেস্ট'—ইংরেজি V-অক্ষর যেন খোদাই করা। বাকি দেহ কুচকুচে কালো। দৈর্ঘ্যে তিন-চার ফুট। তিন-নম্বর : ব্রাউন ভালুক। এরাও হিমালয়ের বাসিন্দা—কিছু উঁচু পাহাড়ে-অরণ্যে থাকে। আকারে বড়। এই ব্রাউন ভালুকের (*Ursus arctos*) একই গণভুক্ত জ্ঞাতিভাই হচ্ছে আমেরিকার **গ্রিজলি ভালুক**। আকারে প্রকাণ্ড। দু-পায়ে যখন খাড়া হয়ে দাঁড়ায় তখন উচ্চতা আট ফুট বা 244 সে.মি। এই গ্রিজলি আর কোডিয়াক বেয়ার বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলচর মাংসাশী প্রাণী। বলা যায় : বর্তমান কল্পের 'টিরানোসরাস রেক্স'! কারণ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বা সিংহের চেয়ে এরা আকারেও বড়, ওজনেও দড়! আমাদের হিমালয়ান ভালুক তার পাশাপাশি মনে হবে পোলাপান!

গায়ের রঙ লালচে, সোনালী। এক সময় গোটা পশ্চিম আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছিল এদের একছত্র সাম্রাজ্য। সে অঞ্চলে বাঘ-সিংহ নেই, তাই ওকে রাজসূয় যজ্ঞ করে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়নি। নখদন্তের অধিকারী বড়জাতের মাংসাশী প্রাণী পার্বত্য সিংহ বা 'পুমা'। তারা ওর দিগড়ে ভেড়ে না।

তবু গ্রিজলি-ভালুক শেষ হয়ে যেতে বসেছে। যেহেতু বিবর্তনের তাগিদে এ দুনিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে এক জাতের দ্বিপদী জীব, যারা দূর থেকে 'নখদন্ত' ছুঁড়ে মারতে পারে—রাইফেলের নলে!

গ্রিজলি ভালুকের মাংস সেই দ্বিপদী জীব খায় না। ওর চামড়া দিয়ে গা-ঢাকে না। তাহলে মারে কেন? হত্যার আনন্দে! মারতে-মারতে-মারতে আমরা ওদের শেষ করে এনেছি। চল্লিশের দশক থেকে ওরা সংরক্ষিত প্রাণী। পঞ্চাশের দশকে মনে হয়েছিল ওরা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। তারপর 1969 সালে একদল জীববিজ্ঞানী দূর থেকে দেখতে পান কয়েকটি গ্রিজলি

ভালুককে। মা-ভালুক তার ছানাপোনাদের নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

শীতকালে লম্বা 'শীতঘুম' দেয় (hibernate)। খায় মাছ—বিশেষ প্রিয় মাছ হচ্ছে স্যামন আর ট্রাউট। প্রয়োজনে সর্বভুক। কন্দমূল থেকে মৃতজন্তু।

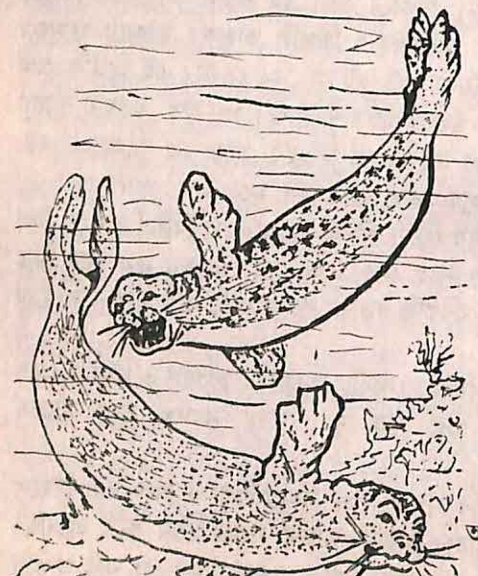
তবে দীর্ঘ শীতঘুম পাড়ি দিয়ে যখন ও জেগে ওঠে তখন ওকে শুধিয়েছি, ও গ্রিজলি! তোমার সব চেয়ে কী খেতে ভাল লাগে গো?

ও ঘুম-ঘুম-চোখে জবাবে যা বলেছে তা স্রেফ 'আবোলতাবোল':

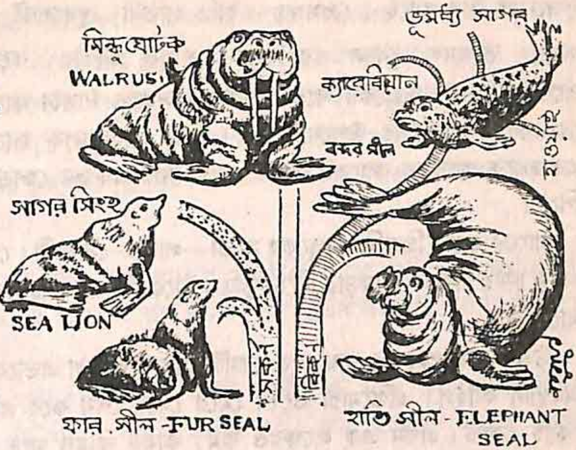
"দাদা গো! দেখ্‌ছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভাল,
ঘুমও ভাল ধকল ভাল,
ট্রাউট মৎস্য যেমন ভাল,
ঠিক তেমনি স্যামন ভাল,
শীতকালে সীল মৎস্য ভাল,
গ্রীষ্মে হরিণবৎস ভাল,
গিটকিরি গান গাইতে ভাল,
কিন্তু সবার চাইতে ভাল,
—মৌচাকের ঐ মধু মধুর!"

2. সন্ন্যাসী সীল [Monk Seal]

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটি বিশেষ বর্গ হচ্ছে পিনিপিডিয়া। তারা জলচর এবং মাংসাশী। সে দলে আছে যাবতীয় সীল আর সিন্ধুঘোটক। তিমি বা ডলফিন (সিটাশিয়া বর্গ) অথবা ডুগঙ, ম্যানাটি (সাইরেনিয়া বর্গ) স্তন্যপায়ী বটে কিন্তু এ-দলে নেই। পিনিপিডিয়ানদের মূল শাখা তিনটি! একদলের কান-জোড়া সহজেই নজরে পড়ে, যেমন ফার-সীল, সী-লায়ন। অপর দল বিকর্ণ। সে দলে আছে এলিফ্যান্ট সীল এবং বন্দর সীল। তৃতীয় শাখায় মহাকায় সিন্ধুঘোটক। তৃতীয় সরিকের কথা এখনি বলব। আপাতত বন্দর সীলের কথা বলি। এদের দেখা যেত বিভিন্ন বন্দরে। তারই একটি উপশাখা হচ্ছে মংক সীল। আমরা বাঙলায় নাম দিয়েছি সন্ন্যাসী সীল। এমন নাম কেন হয়েছে বলা মুশকিল। নিরামিষাশী নয়, খায় মাছ আর কম্বোজ



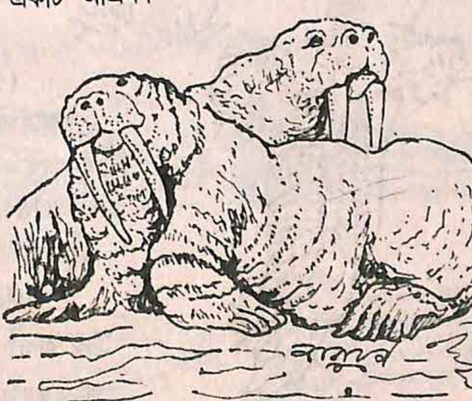
জাতীয় প্রাণী। জপতপ করে বলেও শুনিনি। তবে একটি বিলাতী বইতে দেখছি লিখেছে, "Although the Hawaiian monk seal appears tame, it seems incapable of tolerating human presence. If any human appears where they are living and birthing their young, they will move and not return to that area." [দেখলে মনে হয় হাওয়াইয়ান মংক সীল পোষ মানবে, কিন্তু বাস্তবে এরা মানুষকে বরদাস্ত করতে পারে না। যেখানে ওরা বাস করে অথবা বাচ্চাদের জন্ম দেয়, না-মানুষ করে, সেখানে মানুষজনের সাড়া পেলেই ওরা সদলবলে দূরে সরে যায়; আর সে-অঞ্চলে কখনো ফিরে আসে না।]



হয়তো এই মনুষ্যসমাজ থেকে দূরে থাকার প্রবণতার জন্যই অমন নাম।

'মংক সীল'-এর গণের নাম মোনাচাস (Monachus)। এই গণে মাত্র তিনটি প্রজাতি। কিন্তু তারা এই পৃথিবীর তিনপ্রান্তের বাসিন্দা। একই গণের ঐ তিনটি প্রজাতি মনুষ্য সান্নিধ্য এড়াবার প্রয়োজনে কী বিরাট দূরত্বে চলে গেছে! একদল থাকে ক্যারেবিয়ান সী-তে। ঐ যে সাগর-পার থেকে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ টীম ক্রিকেট খেলতে আসে। দ্বিতীয় দলের বাস ভূমধ্য সাগরে। তৃতীয় দল হাওয়াই দ্বীপে। তিনটিই মোনাচাস গণের সন্ন্যাসী সীল। তার ভিতর ক্যারেবিয়ান সাগরে যারা ছিল তারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। তাদের হাজারে হাজারে দেখেছিলেন ক্রিস্টফার কলম্বাস তাঁর প্রথম অভিযানে। ভূমধ্যসাগরের সন্ন্যাসী সীল টিকে আছে কি না জানি না। কিছুদিন আগেও গ্রীসের কাছাকাছি তাদের দেখা গেছে। আর হাওয়াই দ্বীপের কাছাকাছি নাকি আছে দেড় হাজার সন্ন্যাসীর একটি আশ্রম।

3. **সিন্ধুঘোটক** [**Walrus :** *Odobenus rasmarus*]



পিনিপিডিয়া বর্গের মধ্যবর্তী একক বাসিন্দা। এক দিকে 'সকর্ণ সীল' অপর দিকে 'বিকর্ণ সীল'। উত্তর মেরুবলয়ের কাছাকাছি থাকে। আকারে বেশ বড়। দৈর্ঘ্যে প্রায় চার-মিটার, ওজনও দেড় টন। পুরুষ স্ত্রী

দুজনেরই দাঁত আছে (প্রসঙ্গত হাতি-হাতিনী দুদলেরই গজদন্ত হয়)। দাঁত দিয়ে সমুদ্র তলদেশ খুবলে ওরা ঝিনুক, শামুক জাতীয় কম্বোজ খুঁটে বার করে খায়। প্রয়োজনে শ্বেত ভল্লুকের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ও দাঁতটা কাজে লাগে। দাঁতের অবস্থানটা বেকায়দা—লড়াইয়ের উপযোগী নয়। কিন্তু শ্বেতভালুক জানে—ওরা থাকে দল বেঁধে। একজনকে আক্রমণ করলেই পিছন থেকে আর একজন জোড়া দাঁতের ছোরা বসিয়ে দেবে পিঠে!

গায়ের লোম গ্রিজলি ভালুকের মতো—লালচে-সোনালী। গোঁফ আছে। দাড়ি নেই। আর আছে চর্বির পরত—চামড়ার নিচে, ভুঁড়ির খাজে খাঁজে। তাই বরফ-গোলা জলেও ওদের শীত লাগে না।

উত্তর মেরু অঞ্চলে প্রায় দেড়-কোটি বছর ধরে ওরা এভাবেই টিকে আছে। তবে ইদানীং অবস্থাটা কাহিল। এস্কিমোরা ওদের মেরে মেরে শেষ করে এনেছে। এক কালে ওরা ছিল কোটি কোটি। এখন এক লক্ষেরও কম। কারও কারও মতে মাত্র হাজার পঞ্চাশ! এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ মাদী সিন্ধুঘোটক দু বছর অন্তর সন্তান প্রসব করে। তাও একবারে মাত্র একটি!

4. **ক্যালিফোর্নিয়া শকুন [Californian Condor :** *Gymnogyps californianus*]

জীববিজ্ঞানীদের মতে এই প্রজাতির সংখ্যা বর্তমানে একশরও কম! হয়তো পঞ্চাশ থেকে ষাট! প্রকাণ্ড বড় পাখি। ডানা খোলা অবস্থায় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের দৈর্ঘ্য 3মি। বলা যায়, এটি বিশ্বের বৃহত্তম মাংসাশী পাখি। স্বীকার্য, অ্যালবাট্রসের ডানার মাপ কিছু বেশি—3.3 মি পর্যন্ত—কিন্তু সে 'মছলিখোর'! এরা মূলত মৃতদেহ ভক্ষণ করে। শেষ তুষার যুগের আমলে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে এই ধরনের এক শকুন -প্রজাতি ছিল, যার ডানার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের মাপ ছিল 4.9 মিটার! সেটা পক্ষী জগতে সর্বকালের রেকর্ড (টেরডেকটিল পাখি ছিল না)। এদের আর এক জ্ঞাতিভাই আজও বহাল তবিয়তে টিকে আছে দক্ষিণ আমেরিকায়: আন্ডিয়ান শকুন। তারা অ্যান্ডিজ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, তিন থেকে ছয় হাজার মি· উঁচু পর্বত শিখরে বাস করে। ক্যালিফোর্নিয়া শকুনের গলায় লাল রঙের 'টাই' বাঁধা। পিঠ নীলচে-ধূসর। মাঝে-মাঝে সাদা পালকের বাহার। এরা মানুষের উপকারই করে।



মৃতজন্তু ভক্ষণ করে এবং শস্যহানিকর ইঁদুর ও প্রেয়ারি-ডগ-এ উদরপূর্তি করে। কিন্তু মানুষ এ সত্যটা বোঝেনি। মেরে মেরে ওদের প্রায় শেষ করে এনেছে। এখন মাত্র গোটা পঞ্চাশ পাখি টিকে আছে লস্ অ্যাঞ্জেলেস শহরের উত্তর-পশ্চিমে রকি-পাহাড়ের মাথায়-মাথায়। কিন্তু প্রজাতি হিসাবে ঐ পঞ্চাশটি পাখি এ শতাব্দী পাড়ি দিতে পারবে কি না, ঘোরতর সন্দেহ। মুশকিল এই যে, এদের মাদী-পাখিও ডিম পাড়ে একবছর অন্তর—তাও একবারে মাত্র একটি ডিম!

5. মিসিসিপি কুমির [American Alligator : *Alligator mississippenis*]

'ও কুমির তোর জলকে নেমেছি' খেলতে শুরু করার আগে কুম্ভীররাজ্যটার ব্যাপার-স্যাপার একটু সমঝে নেওয়া যাক।

কুমির হচ্ছে সরীসৃপ (Reptile) শ্রেণীর। একই শ্রেণীভুক্ত সাপ, কাছিম, গিরগিটি, টিকটিকির ভিতর কুম্ভীরাদি (Crocodilian) একটি বর্গ। তার প্রজাতি সংখ্যা গোটা পঁচিশ-ছাব্বিশ।



ভারতে আমরা তিন জাতের কুমির দেখি। জীববিজ্ঞান-মতে তাদের খটমট ল্যাটিন নাম যাই হোক, সাদা বাঙলায় তারা:

A. **মেছো কুমির** : মিঠেজলের নদী বা দহে থাকে। দৈর্ঘ্যে চার মিটার পর্যন্ত। সচরাচর মাছ খায়।

B. **মানুষ-খেকো কুমির** : মূলত সোঁদরবনের বাসিন্দা। নোনা জল, মিঠে জল দুই অবস্থাতেই অভ্যস্ত হতে পারে। তবে মোটামুটি মোহনা-অঞ্চলের খাড়িতে বাস। সমুদ্রে পাড়ি মারে। দৈর্ঘ্যে ছয় মিটার পর্যন্ত। শুয়োর, হরিণ, সুযোগ-মতো মানুষও খায়।

C. **ঘড়িয়াল** : পরে বলছি।

জীববিজ্ঞান মতে কুমিরের প্রজাতি সংখ্যা বর্তমানে তেইশ। কারও কারও মতে পঁচিশ বা ছাব্বিশ। ঘড়িয়াল, কেম্যান ইত্যাদি ঝড়তি-পড়তি—ঐ যারা মানুষ খেতে ডরায়—তাদের বাদ দিলে বড় সরিক মাত্র দুটি : **অ্যালিগেটার** আর **ক্রোকোডাইল**। নৈকষ্য-কুলীন ক্রোকোডাইলদের প্রজাতি



সংখ্যা প্রায় এক ডজন। আর অ্যালিগেটারদের কুল্লে দুইটি প্রজাতি। কেমন করে এমনটা হল জানি না—'রাঢ়ী' আর 'বারিন্দির' অ্যালিগেটারের বাস পৃথিবীর দু-প্রান্তে। একদলের নিবাস উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদী, অপরটির চীনের ইয়াং-সি নদী ('ইয়াংসিকিয়াং' নদী বলা ভুল—এ.সি. কারেন্টের মতো। কারণ চীনা ভাষায় 'কিয়াং' মানে নদী)।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় 'রেপটাইল-হাউসে' আমরা যাদের দেখি তারা সবাই 'ক্রোকোডাইল', একটাও 'অ্যালিগেটার' নেই। কী করে বুঝব? চেনা যায় সহজেই:

অ্যালিগেটারের মুখ বেশি চওড়া। কিন্তু 'বেশি কম' মাপব কীভাবে? তার চেয়ে সুবিধা নিচেকার চোয়ালে চতুর্থ দাঁত—শ্বদন্তটা নজর করা। অ্যালিগেটারের ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ অবস্থায় সেটি দেখা যাবে না। ক্রোকোডাইল-এর ক্ষেত্রে সেটি বাইরে বেরিয়ে থাকবে।

মার্কিন অ্যালিগেটার খায় মাছ, ঝিনুক, কাঁকড়া, কাছিম, পাখি, সুবিধা হলে মানুষের ছানাও! এরা লবণাক্ত জলে যায় না। নদীর বাসিন্দা। পঞ্চাশ বছর আগে ফ্লোরিডা অঞ্চল থেকে বছরে আড়াই লক্ষ কুমিরের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হত। এখন ওদের দেখাই পাওয়া যায় না। ওরা সংরক্ষিত প্রাণী।

6. ঘড়িয়াল [Gharial : *Gavialis gangeticus*]

কুম্ভীরাদি (Crocodilia) বর্গের তিনটি গোত্র (family) : ক্রোকোডাইল, ঘড়িয়াল আর অ্যালিগেটার (কেম্যানসহ)। তিনটির মধ্যে একটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি: **ঘড়িয়াল**। যার বাস ছিল শুধুমাত্র বৃহত্তর ভারতে—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র,—পাকিস্তানের সিন্ধু এবং বর্মার ইরাবতীতে। দৈর্ঘ্যে সচরাচর 450 সে.মি। ক্বচিৎ 600 সে.মি পর্যন্ত। মুখটা সূচালো। নাকের ডগায় একটা 'ঘাট' বা 'ঘড়া'। যা-থেকে ওর নাম ঘড়িয়াল। খায় মাছ। কখনো বা মৃত জন্তুর দেহ খুবলে খায়। মানুষকে কখনো আক্রমণ করে না। একবারে ত্রিশ-চল্লিশটা ডিম পাড়ে। জলে নয়, ডাঙায়। নদীর পাড়ে। বাচ্চা যখন জন্মায় তখনি প্রায় 30 সে.মি. দৈর্ঘ্যের। ডিম ফুটতে সময় নেয় প্রায় তিন মাস। ছবিতে একটা ঘড়িয়াল বাচ্চাকে সদ্য জন্ম নিতে দেখা যাচ্ছে।



নিতান্ত বাল্যকালে—বছর দশেক বয়েসে বাবার সঙ্গে একবার স্টিমারে চেপে আসাম গিয়েছিলাম। ভাগীরথী বা হুগলি নদী বেয়ে সুন্দরবনে, সেখান থেকে পুবমুখো, তারপর ব্রহ্মপুত্র বেয়ে তেজপুর। যাত্রা পথে অনেক অনেক ঘড়িয়ালকে বালির চড়ায় রোদ পোহাতে দেখেছি। স্টিমারের শব্দ পেয়ে তারা জলে নেমে গেল। এই তো সেদিন! বছর পঞ্চাশ আগে! আর বর্তমানে গোটা পশ্চিমবঙ্গে, বাংলাদেশ এবং আসামে ওরা নিশ্চিহ্ন! আমার জীবদ্দশাতেই এটা স্বচক্ষে দেখে গেলাম! কুম্ভীরাদি-বর্গের এই Gavial-গোত্রের একমাত্র গণের (Gavialis) একমাত্র প্রজাতিটি টিকে আছে ভারতের কয়েকটি নদীতে: চম্বলে, গিরিয়ায় এবং নারায়ণী নদীতে।

7. কালো-পা ফেরেট [Black-footed Ferret : *Mustelanigripes*]

মাংসাশী বর্গের (Carnivora order) সর্বসমেত সাতটি গোত্র। তার একটির নাম 'নকুলাদি গোত্র' (Mustelidae)। এই গোত্রে প্রজাতি সংখ্যা 70 ; নকুল বা বেজি, খটাশ, ভোঁদর, মিংক, স্কাংক ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণী এই গোত্রভুক্ত। **কালো-পা ফেরেট** এই গোত্রের। এক সময় মধ্য-আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা বাস করত—কানাডা থেকে টেক্সাস।

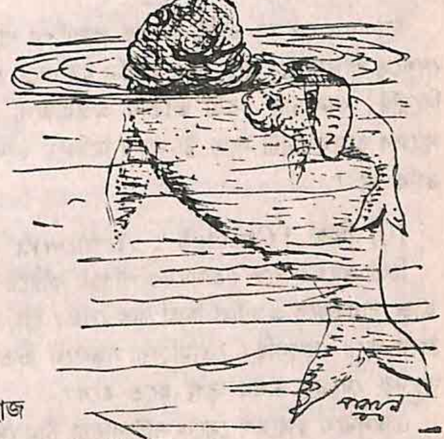


দেহটা ফুট খানেক (30 সে·মি)। লেজ ছয় ইঞ্চি (15·সে·মি)। প্রধান খাদ্য হচ্ছে প্রেয়ারী-ডগ। অর্থাৎ ভূগর্ভবাসী একজাতের ধেড়ে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। প্রেয়ারী-ডগ চাষের ক্ষতি করে। ফলে মার্কিন চাষী ব্যাপক হারে ঐ প্রেয়ারী-ডগদের হত্যা করতে শুরু করল। তার ফলে এই কালো-পা ফেরেট অবলুপ্তির পথে।

পিঠের উপর ধূসর রঙ, চারটি পা কুচকুচে কালো। লেজের ডগাটুকুও তাই। আর চোখে যেন একজোড়া গগল্‌স্! এখন ওরা সংখ্যায় কত তা আন্দাজের বাইরে। হয়তো কয়েক শত!

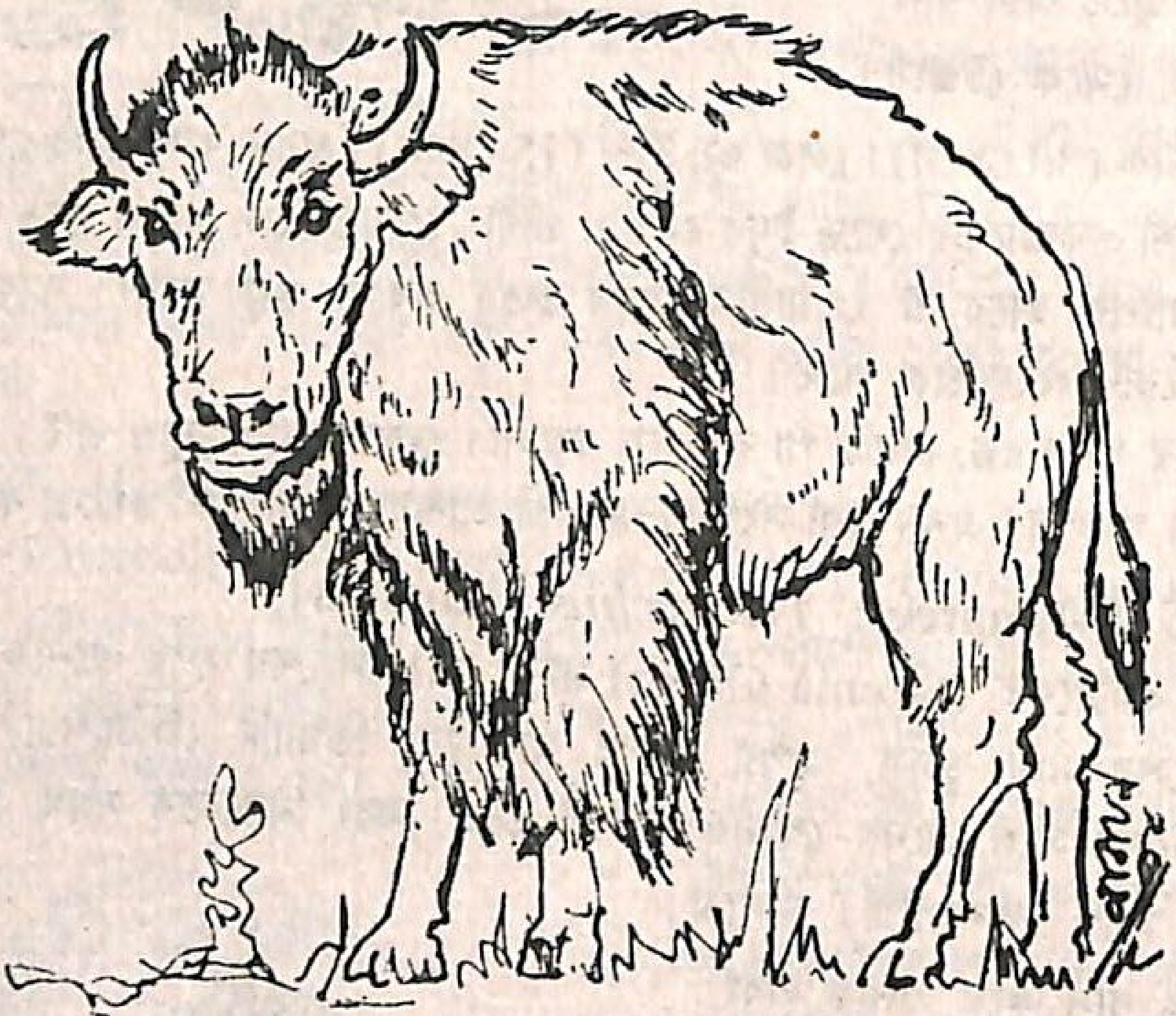
8. ম্যানাটি [Manatee : *Trichechus manatus*]

সাইরেনিয়া বর্গটাকেই (Sirenia Order) মানুষ প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে। মাত্র দুটি গোত্র। একদলের নাম ডুগঙ, অপর দলের ম্যানাটি। তিম্যাদি (সিটাশিয়া) বর্গের বা পিনিপিডিয়া বর্গের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং নিকটতর সম্বন্ধ হাতি বর্গের (প্রবোসিডিয়া) সঙ্গে। স্তন্যপায়ী। জলচর। শাকাশী। ডুগঙ বাস করে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরে। নদীতেও মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে। শৈশবে আমি একটি মৃত ডুগঙকে দেখেছিলাম তেজপুর, আসামে। ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ঐ সমুদ্রচারী জীবটা যে কী-করে অত উজানে গেছিল তা জানি না! ম্যানাটি তারই মামাতো বা মাসতুতো ভাই। ম্যানাটি এবং ডুগঙ দুজনেই সংরক্ষিত প্রাণী। এদের দেখেই এককালে নাবিকেরা মৎস্যকন্যার গল্প ফেঁদেছিল। এখনও ছেলে-কোলে ডুগঙ বা ম্যানাটিকে দূর জাহাজ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো হ্যান্স অ্যান্ডারসন বর্ণিত মৎস্যকন্যার মতো তার কুচবরণ গায়ের রঙ কিংবা মেঘবরণ চুল নেই মাথায়, কিন্তু তার মাতৃস্নেহ নিখাদ!



9. মার্কিন বাইসন [**Wood Bison :** *Bison bison athabascae*]

একসময়ে গোটা মার্কিন রাজ্যে বাইসন বাস করত অযুত নিযুত সংখ্যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় তৃণভূমির শেষপ্রান্ত যেখানে মিশেছে দিগন্ত রেখায়, সে পর্যন্ত বাইসন দেখা যেত ঠাশাঠাশি! আমেরিকার স্থলচর শাকাশীজীবের মধ্যে আকারে বৃহত্তম। উচ্চতায় মানুষভর, দৈর্ঘ্যে প্রায় 3 মিটার, ওজন এক টন। গত শতাব্দীতে একজন জীববিজ্ঞানী বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা মিলিয়ে বাইসনের সংখ্যা ছয় কোটি। 1820 সালের পর মিসিসিপির পুব পারে আর ওদের দেখা যেত না; 1885-এর পরে পশ্চিমপারের বাইসন সংখ্যা নেমে এসেছিল একশর নিচে। তখন থেকেই এরা সংরক্ষিত প্রাণী। এখন বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যাটা কয়েক হাজার।



উডল্যাণ্ড-বাইসন একটি বিশেষ প্রজাতির বাইসন। এখন আর তাদের মুক্ত জীব হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা নির্মূল। তাদের একটির ছবি এখানে এঁকে দিয়েছি। কানাডার একটি জাতীয় অভয়ারণ্যে এদের এখন সংরক্ষণ করা হয়েছে। 1957 সালের আদমসুমারী মতে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে ওদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত। এখন কত ঠিক জানি না।

10. চিতা [**Cheetah :** *Acinonyx jubatus venaticus*]

চিতা বাঘের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু একথা কি জান যে, আজ ভারতবর্ষে একটিও চিতা বাঘ নেই? হ্যাঁ, আমরা—বীর শিকারীরা—মেরে-মেরে ওদের ঠাণ্ডা করে ফেলেছি। তোমাদের সঙ্কলনে চিতাবাঘ শিকারের গল্পের বইয়ে যে ছবি আছে তাদের দেখেই এখন তৃপ্ত হতে হবে।

একসময়ে ব্রহ্মদেশ থেকে সাইবেরিয়া, চীন দেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা—দুই মহাদেশব্যাপী অতি বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করত এই সবচেয়ে দ্রুতগামী স্থলচর জীব। ঘণ্টায় 66 মাইল (110 কি·মি) বেগে এক-নাগাড়ে এক দেড়শ মিটার দৌড়াতে পারে। মুক্ত তৃণভূমিতে হরিণ, খরগোশ, জেব্রা কেউ ওর হাত থেকে রেহাই পাবে না দৌড়ে পালিয়ে। এককালে চিতাকে

পোষ মানিয়ে হরিণ শিকারে যেতেন রাজা-রাজড়ার দল। চিতা চমৎকার পোষ মানে। চিতা কিন্তু বাঘ বা বিড়ালের মতো থাবার ভিতরে নখ টেনে নিতে পারে না।

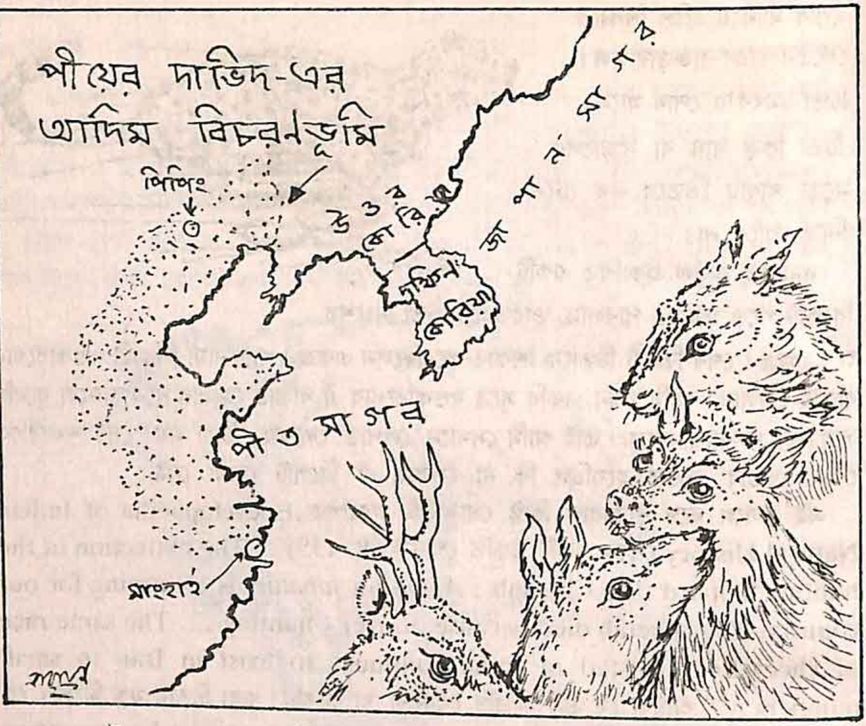


বনমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্ট পড়ে জানতে পারলাম, ভারতবর্ষে চিতা নিঃশেষ হয়ে গেছে! শেষ তিনটি চিতাকে শিকার করেছিলেন একজন খ্যাতনামা শিকারী দণ্ডকারণ্যের বাস্তার জেলায়। আমি যখন চাকরি সূত্রে দণ্ডকারণ্যের ঐ বাস্তার জেলার বনে জঙ্গলে ঘুরেছি তার বছর দশবারো আগে। তাই আমি সেখানে 'লেপার্ড' দেখেছি, 'চিতা' নয়! সেই শিকারীকে কোন খেতাব দেওয়া হয়েছিল কি না সেকথা ঐ রিপোর্ট লেখা নেই!

এই প্রসঙ্গে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি প্রকাশিত Encyclopaedia of Indian Natural History থেকে একটি উদ্ধৃতি শোনাই (P. 135) : "The extinction of the hunting leopard (the Cheetah : *Acinonyx jubatus*) is a warning for our country. The cheetah died because of over - hunting .... The same race of cheetah as existed in India continues to exist in Iran in small numbers ..." আমরা যে ভুল করেছি ইরানীরা তা করেনি। ওরা চিতার যত্ন নিচ্ছে। কে জানে হয়তো একদিন ওরা আমাদের এক জোড়া চিতা উপহার পাঠাবে। হ্যাঁ, এমন ঘটনার নজির আছে। হাওয়াই দ্বীপের একজাতের বিচিত্র হাঁস (Nene duck) নির্মূল হয়ে যাবার পর লন্ডন জু-র কর্তৃপক্ষ হাওয়াই দ্বীপকে উপহার দেন এক জোড়া নিনি-হাঁস। ঠিক একই ভাবে আরব থেকে নিঃশেষিত হরিণ, Arabian Oryx উপহার হিসাবে আরব সরকারকেই পাঠিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানডিয়াগোর চিড়িয়াখানা। অত কথা কী? চীনের রাজাকে ডিউক অব বেডফোর্ড একজোড়া পীয়ের-ডেভিড হরিণ উপহার দিয়েছিলেন, সে গল্পটা কি বলিনি? আচ্ছা, না হয় সংক্ষেপে আবার বলি:

11. পীয়ের-দাভিদ হরিণ [Pere' David Deer : *Elaphurus davdianus*]

1865 সালের কথা। চীন দেশে ধর্মপ্রচার করতে এসেছেন ফাদার দাভিদ। তিনি ছিলেন একজন ফরাসী না-মানুষ দরদী এবং জীববিজ্ঞানী। পিকিং শহরের উপকণ্ঠে চীনের রাজাধিরাজের ছিল মস্ত বাগানবাড়ি। পেল্লায় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লোকে বলে, তার ভিতর আছে সম্রাটের পোষা হরেক রকম পশুপাখি যা বাইরের জঙ্গলে নাকি পাওয়া যায় না। ভীষণ কৌতূহল হল ফাদার দাভিদের। বাগান—বাড়ি নিষিদ্ধ অঞ্চল। ফাদার ভাব জমালেন একজন তাতার জমাদারের সঙ্গে। সেই লোকটাই ওঁকে জানালো—ঐ প্রমোদ উদ্যানে নাকি আছে বিচিত্র এক জাতের হরিণ: স্যু-পু-শিয়াঙ। ফাদার দাভিদ ততদিনে চীনে ভাষাটা শিখে ফেলেছেন। বলেন, তার মানে তো 'চার-রঙ্গ'। তা ঐ হরিণের নাম 'চতুরঙ্গ' হল কেন? দ্বাররক্ষী শুনিয়ে দিল 'যাদু এ তো বড় রঙ্গ' ছড়া। ঐ হরিণের গলা উটের মতো, খুর গরুর মতো, লেজ গাধার মতো, আর শিং সমেত বাদবাকি দেহটা হরিণের মতো—তাই!



দুরন্ত কৌতূহলে ফাদার দাভিদ বলেন, একবার দেখাতে পার?

এক বিঘৎ জিব বার করে দ্বাররক্ষী বলে, অমন কথা মুখেও আনবেন না, ফাদার। সম্রাট জানতে পারলে আপনার-আমার তো বটেই, আমাদের ফাদারেরও গর্দানা নেবেন।

—কেন? দূর থেকে একবার দেখব, তাতে ক্ষতি কী?

—পাঁচিল – ঘেরা বাগানের ভিতর বিদেশীদের দৃষ্টি দেওয়া মানা!

আরও খবর পাওয়া গেল, ঐ 'চাররঙ্গ হরিণ' এককালে খোলা অরণ্যেই পাওয়া যেত—কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত চীনারা সেগুলি মেরে মেরে প্রায় শেষ করে এনেছে। তাই চীনসম্রাট কয়েক হাজার হরিণকে ঐ বাগানবাড়িতে ঠাঁই দিয়েছেন! বাগানে আরও অনেক দুর্লভ প্রাণীর বাস!

তাতার প্রহরীর নিষেধ সত্ত্বেও ফাদার দাভিদ গাছে উঠে একদিন পাঁচিলের এপার থেকে চতুরঙ্গ-হরিণ দেখতে পেলেন। দর্শনমাত্র তিনি বুঝতে পারেন এ জাতের হরিণ জীববিজ্ঞানের তালিকার বাইরে। একটা অজানা, অনামা প্রজাতি। অনেক প্রলোভন দেখালেন তিনি; কিন্তু প্রহরী কিছুতেই রাজী হল না। তারপর একদিন প্রহরী ওঁর কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। অর্থাৎ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক! ধরা পড়ে ওরা ফাদার দাভিদকেও আমন্ত্রণ করল হরিণ-মাংসের ভোজে। ফাদার বললেন, না! আমাকে শুধু চামড়াখানা দাও, না হলে সম্রাটের কানে কথাটা আমিই তুলব।

কী আর করা? তাই দিতে হল। দাভিদ ওষুধ প্রয়োগে চামড়াটা 'ট্যান' করে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে। পারীর জীববিজ্ঞানীরা এক কথায় স্বীকার করলেন এটি একটি অপরিজ্ঞাত প্রজাতির হরিণ। তার নাম রাখ হল 'ফাদার-দাভিদ হরিণ' ঃ *Elaphurus davdiamus !*

য়ুরোপের অনেকগুলি চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ চীনসম্রাটকে অনুরোধ জানালেন, তাঁরা ঐ বিচিত্র হরিণ কিছু কিনতে চান। সম্রাট প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর আবেদন এল রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে। ভবি তাতেও ভুলল না। রীতিমতো জেদাজেদি! কিন্তু চীনসম্রাট কিছুতেই রাজী নন! তারপরেই চীনসম্রাট গভীর গাড্ডায় পড়ে গেলেন, পার্শ্ববর্তী জাপান-সম্রাটের গুঁতো খেয়ে। ফলে এবার চীনসম্রাট য়ুরোপের কাছে হাত পাতলেন : তাঁর কিছু অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ দরকার।

ইংল্যান্ড-ফ্রান্স বলে, কিন্তু সেই চতুরঙ্গ হরিণ?

চীনসম্রাট খিচিয়ে ওঠেন, দুত্তোর নিকুচি করেছে! চাদ্দিকে জাপানী সৈন্য, হচ্ছে কামান - বন্দুকের কথা, ওরা এসময় হরিণ-হরিণ খেলা খেলতে চায়! দাও হে, ওদের ডজন দুয়েক চতুরঙ্গ হরিণ ছানা পাঠিয়ে দাও।

তাই হল। চীন থেকে জাহাজে চেপে ঐ অদ্ভুতদর্শন কয়েকটি না-মানুষ এসে পৌছালো ফ্রান্সে। ক্রমে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল য়ুরোপের নানান চিড়িয়াখানায়।

ভাগ্যিস আনা হয়েছিল ওদের। কারণ ঐ ঘটনার কয়েক দশক পরে 1894 সালে হোয়াঙ নদীর ('হো' মানেও নদী, তাই 'হোয়াঙ-হো নদী' নামঞ্জুর।) প্রচণ্ড বন্যায় ঐ প্রমোদ ভবনের পাঁচিল এক জায়গায় গেল ধ্বসে। বন্যার জল হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল সংরক্ষিত উদ্যানে। প্রাণভয়ে হরিণের দল ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশ্রয় নিল আশপাশের বনে জঙ্গলে। মাত্র দশ বছরের ভিতরেই চীনারা তাদের মেরে শেষ করে ফেলল।

দুঃসংবাদ য়ুরোপে পৌছালো। দাভিদ-হরিণ তাদের আদিম নিবাসে নিশ্চিহ্ন! তখন হিসাবে কষে দেখা গেল সারা য়ুরোপের নানান চিড়িয়াখানায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মাত্র আঠারোটি প্রাণী! কিছু নেহাৎ বাচ্চা, বাদ বাকি মাদী-মদ্দা। ঐ আঠারোটি প্রাণী থেকে যদি ওদের বংশবৃদ্ধি না করা যায়, তাহলে ফাদার ডেভিড হরিণ ডোডো-পাখির সমগোত্রীয় হয়ে যাবে। স্থির হল, ঐ আঠারোটি প্রাণীকে একত্র রাখতে হবে, যাতে তাদের বংশবৃদ্ধি হতে পারে। দায়িত্ব নিলেন ইংলন্ডের ডিউক অব বেডফোর্ড। তাঁর একটি প্রকাণ্ড পাঁচিল - ঘেরা বাগানে ওদের আঠারোটি না-মানুষকে রাখা হল।

ধীরে ধীরে ওদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। যে চিড়িয়াখানা যতগুলি প্রাণী পাঠিয়ে এই পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিল ডিউক কয়েক বছর পরে সুদ-সমেত তাদের আবার হরিণ ফেরত দিলেন।

G. Durrell তাঁর Encounters with Animals বইতে 1958 সালে লিখেছিলেন, "আঠারোটি প্রাণী থেকে বাড়তে বাড়তে এখন সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে দেড়শতে। সম্ভবত ওদের বাঁচানো গেল।"

তারপর 1982 সালের অক্টোবর সংখ্যা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় দেখছি একজন জীববিজ্ঞানী লিখেছেন, "সারা পৃথিবীতে আজ এগারো শ' পীয়ার দাভিদ হরিণ আছে।"

ডিউক অব বেডফোর্ড চীনসম্রাটকেও কয়েকটি পীয়ের দাভিদ হরিণ উপহার দিয়েছিলেন। চীনসম্রাট বোধকরি 'কৃপণ' কবিতাটি পড়েননি, না হলে তাঁর প্রমোদভবনের অন্যান্য বন্যাবিধ্বস্ত বিচিত্র জীবদের কথা স্মরণ করে হয়তো স্বগতোক্তি করতেন:

"দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে—
এখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন' ভ'রে,
তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।।"

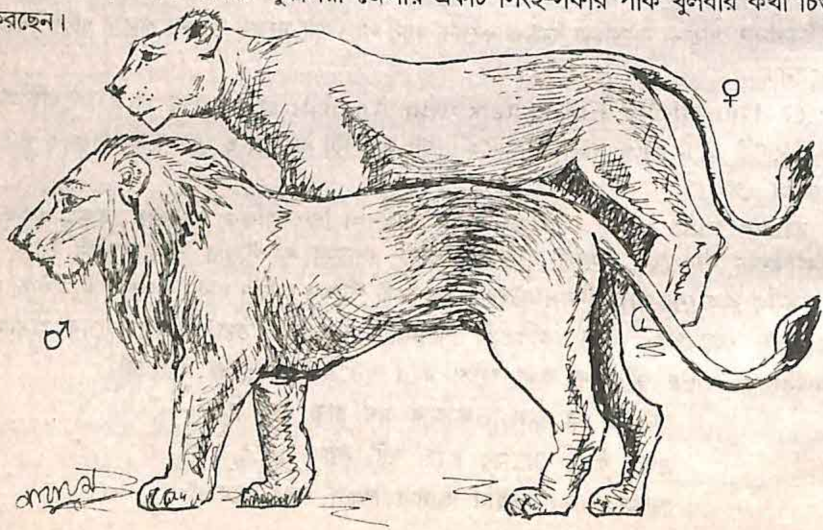
12. সিংহ [**Lion :** *Panthera leo parsica*]

মাংসাশী বর্গের (Carnivora) সাতটি গোত্রের একটি হচ্ছে ফেলিডি (Felidae) বাঘ, সিংহ, চিতা, বেড়াল, লিঙ্কস, ইত্যাদির গোত্র। তার ভিতরেই আছেন পশুরাজ—প্যান্থেরা লিও। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে জাতীয় পশুর সম্মানজনক আসন থেকে তাঁকে গদিচ্যুত করে বসানো হয়েছে বাঘকে। তাতে অবশ্য পশুরাজ ক্ষুব্ধ হননি। এক সময় দক্ষিণ য়ুরোপ থেকে শুরু করে গোটা আফ্রিকা ও এশিয়া ছিল এর বিচরণভূমি। এখন এরা সংখ্যায় খুব কম। দুই প্রজাতির সিংহ এখন দেখতে পাওয়া যায়—আফ্রিকার সিংহ (প্যান্থেরা লিও লিও) এবং এশিয়ার সিংহ (প্যান্থেরা লিও পারসিকা)। আফ্রিকায় তানজানিয়া রাজ্যের সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্কে বর্তমানে প্রায় হাজারের মতো সিংহ আছে। কিছু আছে কেনিয়া আর উগান্ডার মুক্ত অরণ্যেও। এরা আকারে এশিয়ার সিংহের চেয়ে সামান্য বড়। তবে আচরণ, জীবনযাত্রা সব এক রকম।

আমরা আলোচনা করছি এশীয় সিংহের কথা: প্যান্থেরা লিও পারসিকা। ভারতে গির-অরণ্যে তারা সংরক্ষিত। 1936-এ ঐ অরণ্যে না-মানুষটির সংখ্যা ছিল 289 ; 1974-এ তা কমে গিয়ে হয়েছে শ-দুয়েক। দৈর্ঘ্যে লেজসমেত 275 থেকে 300 সে·মি। উচ্চতা প্রায় 100 সে·মি। ওজন 150 থেকে 250 কে·জির কাছাকাছি। গির অভয়ারণ্যের চারপাশে প্রায় এক মিটার উঁচু পাঁচিল তোলা হয়েছে যাতে আশপাশের গ্রাম থেকে গবাদি পশু বা পথভ্রান্ত মানুষ ওখানে না ঢুকে পড়ে। 1957 সালে উত্তর প্রদেশের বেনারসের কাছে চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্যে ছাড়া হয়েছিল একটি সিংহ ও দুটি সিংহী। গির-অরণ্য থেকে নিয়ে এসে। 1965 সালে দেখা গেল তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে—সিংহ পরিবারের সদস্যসংখ্যা এগারো। কিন্তু আশির দশকে তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না। এখনো বোঝা যাচ্ছে না—ওরা পার্শ্ববর্তী কোনও অরণ্যে পালিয়ে গেছে না পোচারদের হাতে মারা পড়েছে।

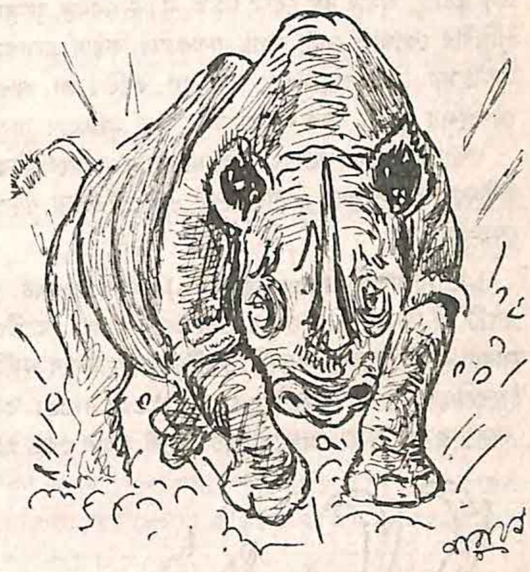
ভুবনেশ্বরের কাছে 'নন্দনকাননে' একটি সফরি-পার্ক খোলা হয়েছে। এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় সিংহের সফরি পার্ক। কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে আফ্রিকান সিংহ, ভারতীয় নয়।

শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলায় একটি সিংহ-সফরি পার্ক খুলবার কথা চিন্তা করছেন।

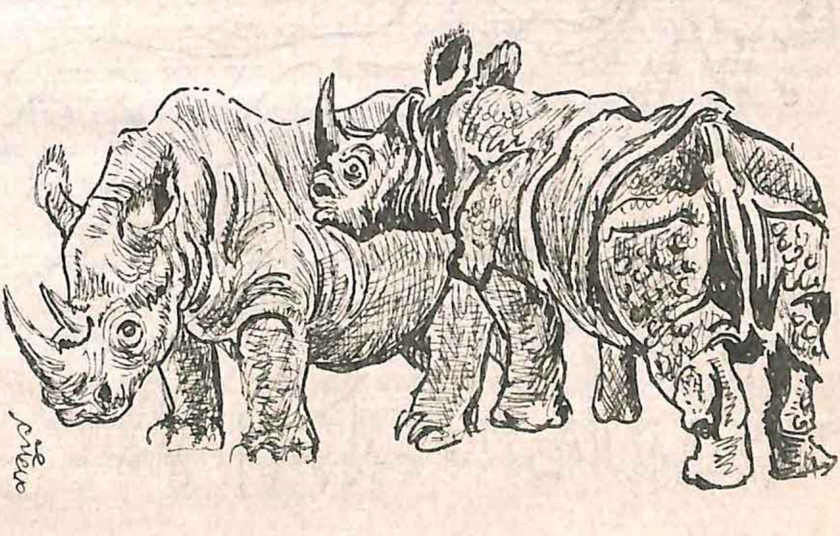


13. ভারতীয় গণ্ডার [Great Indian Rhinoceros : *Rhinoceros Unicornis*]

হাতি বা ইঁদুর-বাদুড় প্রভৃতিকে বাদ দিলে তৃণভোজী স্থলচর না-মানুষদের প্রধান দুটি বর্গে বিভক্ত করা যায়: জোড়-সংখ্যক খুর বিশিষ্ট বর্গ (Artiodactyla Order) এবং বিজোড়-সংখ্যক খুর-বিশিষ্ট বর্গ (Perissodactyea Order)। প্রথম দলে নয়টি গোত্র যাদের জোড়-সংখ্যক খুর, যেমন শুয়োর, উট, জলহস্তী, হরিণ, গরু-মোষ, জিরাফ। নয়টি গোত্রে প্রজাতি সংখ্যা প্রায় 172। দ্বিতীয় বর্গে মাত্র তিনটি গোত্র : অশ্বাদি, টেপির এবং গণ্ডার। প্রজাতি সংখ্যাও মাত্র 15 ; এর ভিতর গণ্ডারের প্রজাতি সংখ্যা মাত্র পাঁচ।



তার মধ্যে তিনটি প্রধান। দুটি আফ্রিকার, একটি ভারতীয়। আফ্রিকার কালো গণ্ডারের নাকে দু-দুটি খড়্গ, সামনেরটি অতি দীর্ঘ। 135 সে·মি পর্যন্ত হতে পারে। এদের পাওয়া যায় সারা আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চলে। আফ্রিকান সাদা গণ্ডার সংখ্যায় কম। তাদেরও নাকে দুটি খড়্গ, তারাও তৃণভূমির বাসিন্দা। আকারে কালো-জাতের চেয়ে কিছুটা বড়। সুদান এবং দক্ষিণ

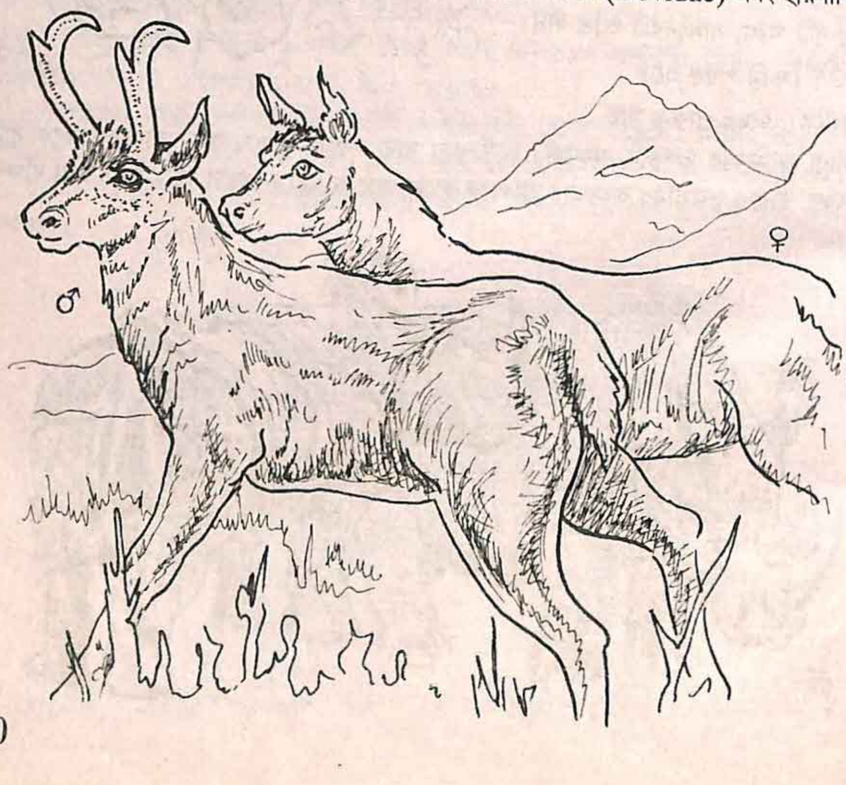


আফ্রিকায় সামান্য পরিমাণে আছে। 'সাদা' বলা হচ্ছে বটে, আসলে হাকুচ কালো নয়, নীলচে-ধূসর।

ভারতীয় বৃহৎ গণ্ডার আকারে ঐ দুই দলের চেয়ে বড়, ওজনেও দড়। তার নাকে একটি মাত্র খড়্গ, আর এক বৈশিষ্ট্য এদের দেহের উপর বিভিন্ন প্লেট পাতা—যা আফ্রিকান গণ্ডারের গায়ে নেই,—তাদের দেহচর্ম অপেক্ষাকৃত মসৃণ। এরা তৃণভূমির বাসিন্দাও নয়, থাকে গভীর অরণ্যে কোন নদীর ধার ঘেঁষে। দিনের অধিকাংশ সময়েই কাদাজলে পড়ে থাকে। শাকাশী। একান্তচারী, অর্থাৎ দল বেঁধে থাকে না। উত্তরবঙ্গ,.আসাম ও নেপাল ছাড়া এই প্রজাতির গণ্ডার পৃথিবীর কোথাও নেই, অথচ এককালে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এদের ছিল একাধিপত্য। এখন আসামের শিবসাগর/নওগাঁ জেলায় কাজিডাঙা অভয়ারণ্যে অনেকগুলি আছে। তাছাড়া নেপালের তরাই অরণ্যে আজও কিছু মুক্তপ্রাণ একশৃঙ্গ গণ্ডার বিচরণ করে।

গণ্ডারের খড়্গ, রক্ত এমনকি মূত্রের নানা অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে ঝাড়ফুঁক – সর্বস্ব গুণীনরা বিশ্বাস করে। তার ফলে এই অতিকায় জীবটিকেও আমরা প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছি।

14. **দ্বিধাশৃঙ্গী (Pronghorn) :** ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি প্রায়-হরিণ জাতীয় একটি না-মানুষ। নিঃসন্দেহে জোরা-খুর বর্গের (আর্টিয়োড্যকটিলা)। কিন্তু কোন গোত্রের? আমরা একটু আগেই বলেছি, আর্টিয়োড্যাকটিলার নয়টি গোত্র। দুটি হচ্ছে শূকরাদি জীবের, ইংরেজিতে যাদের বলে Pigs এবং Pecearies। তা-ভিন্ন জলহস্তী, উট, জিরাফ-ওকাপি :গাত্রদের বাদ দিলে জোরাখুর বর্গের দুটি প্রধান গোত্র হচ্ছে গবাদি (Bovidae) এবং হরিণাদি



(Cervidae)। অবশ্য এই প্রধান গোত্র দুটি ছাড়াও আছে আরও দুটি নগণ্য গোত্র। একটির নাম ট্রাগুইলিডি, সে-গোত্রে মাত্র চারটি দুলর্ভ প্রজাতি : গজদন্ত-ওয়ালা ক্ষুদ্রাকার হরিণ। আর অ্যান্টিলোক্যাপ্রিভি নামে একটি দুলর্ভ গোত্রের প্রাণী, তাতে একটি মাত্র প্রজাতি। প্রধান দুটি হরিণ-প্রতিম গোত্রের কথা বলিঃ Bovidae এবং Cervidae.

বোভিডি-গোত্রে গরু-মোষ-ছাগল ছাড়াও আছে নীলগাই, গৌর, বাইসন, নূ এবং ইলান্ড-হরিণ, চারসিঙ্গ-হরিণ, কৃষ্ণসার-হরিণ প্রভৃতি। অপর পক্ষে সার্ভিডি গোত্রভুক্ত হচ্ছে সম্বর, চিত্রল, কস্তুরী মৃগ। ওদের পার্থক্যটা কী? জটিলতা এড়িয়ে বলা যায়, গবাদি গোত্রের সবাই জাবর কাটে, হরিণাদি গোত্রে কেউ জাবর কাটে না। দ্বিতীয়ত, গবাদি গোত্রের প্রাণীর মাথায় যে শিঙ, তাতে কখনো ডালপালা গজায় না। মজার কথা, দ্বিধাশৃঙ্গী জাবর কাটে না, কিন্তু তাদের শিঙের ডগায় ফর্কের মতো দুটি শাখা! তাহলে? দ্বিধাশৃঙ্গী কোন গোত্রের? Bovidae না Cervidae?

এই না-মানুষটিকে পাওয়া যায় শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকায়। কলম্বাসের পথরেখা ধরে সভ্য মানুষ যখন দলে দলে এই নতুন মহাদেশে আসতে শুরু করল তার পূর্বে ওরা গোটা মহাদেশে কোটি কোটি সংখ্যায় বাস করত। মাংসাশী জীব—মাউন্টেন-লায়ন বা পুমা—ওদের প্রজাতিগত ভাবে কোন ক্ষতি করতে পারেনি। ওরা দারুণ জোরে ছুটতে পারে—ঘণ্টায় একশ কি·মি· বেগে। গাত্রবর্ণ—পিঠের উপর দিকটা পাটকেলে; নিচের দিক ও লেজের কাছে সাদা। এছাড়া গলায় যেন একটা সাদা গলবন্ধ জড়ানো। দৈর্ঘ্যে 1.4 মি, উচ্চতায় প্রায় 100 সে·মি। ওজন 700 কে·জি পর্যন্ত। বছরে একবারই সন্তান হয়। আড়াই শ দিন গর্ভধারণের পর, একেবারে দুটি বাচ্ছা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ওরা নির্মূল হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা হয়েছিল। মার্কিন জীবপ্রেমীরা বহু আয়াসে সে দুর্দৈবকে প্রতিহত করেছেন। এখনও ওরা সংরক্ষিত। মাত্র কয়েক হাজার টিকে আছে।

কিন্তু আমাদের ধাঁধাটার সমাধান হয়নি। দ্বিধাশৃঙ্গী কোন গোত্রের? জাবর বিশারদ Bovidae, নাকি সম্বর-চিত্রল-কস্তুরীর সগোত্র Cervidae? মজার কথা, ধাঁধাটা দাখিল করে শতকরা নিরানব্বইটা ক্ষেত্রে সবাইকে বোকা বানিয়েছি। শুধুমাত্র একবার আমার এক নাতনি উল্টে আমাকেই বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিল। চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে যখন সঠিক উত্তর দিয়ে বসল তখন আমি তো তাজ্জব! জানতে চাই, ও কী করে আন্দাজ করল?

নাতনি আমাকে ধমক লাগায়, আন্দাজ কেন? এ তো যুক্তি-নির্ভর সিদ্ধান্ত।

আমি বলি, কী যুক্তি?

ও বলে, বল্‌ছি। তার আগে আমার এই ধাঁধাটার জবাব দাও তো? শোনঃ

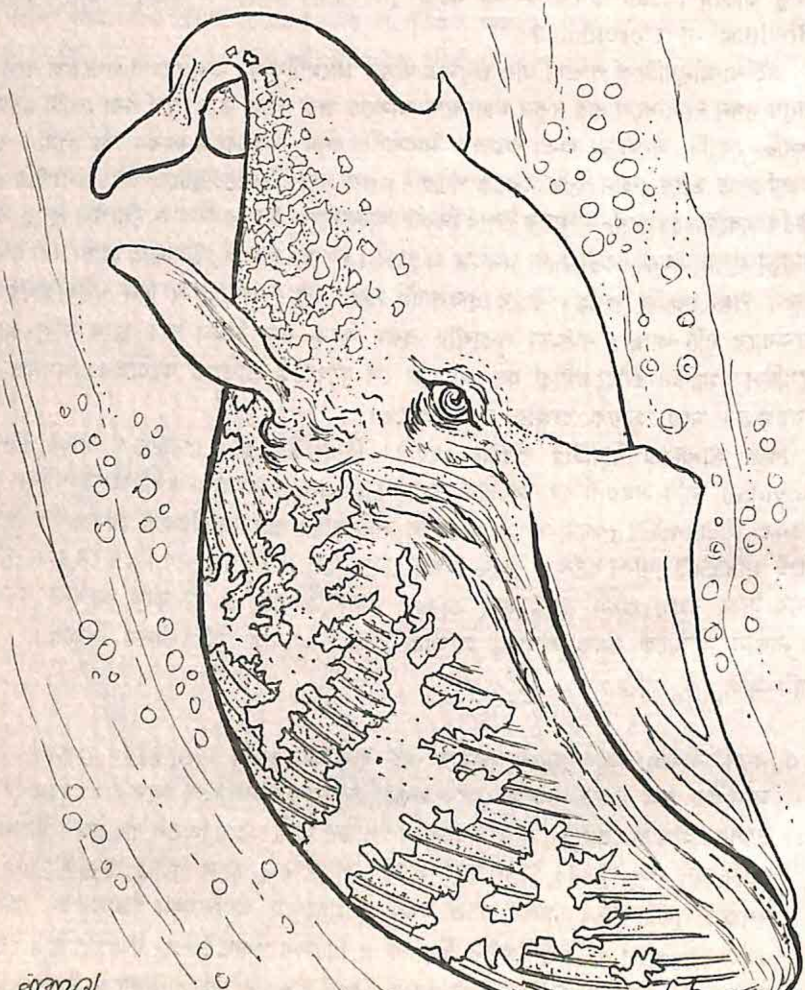
মনে কর তুমি হাওড়া স্টেশন থেকে একটা ছয়-নম্বর বাস ড্রাইভ করে বালিগঞ্জের দিকে চলেছ। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে ছিল একশ জন যাত্রী। তার ভিতর বাহান্নজন স্ত্রীলোক, আটচল্লিশ জন পুরুষ। গাড়ি যখন স্ট্র্যাণ্ড রোডে এল তখন পনের জন স্ত্রীলোক ও দশজন পুরুষ নেমে গেল। গাড়ি যখন এসপ্ল্যানেডে এল তখন পঁচাত্তরজন যাত্রীর একজনও নামল না কিন্তু দশজন স্ত্রীলোক ও পাঁচজন পুরুষ উঠল। তারপর আর কেউ উঠল না বা নামল না টার্মিনাস-এর আগে। এখন বল তো বাস-ড্রাইভারের বয়স কত?

আমি বলতে পারিনি। তোমরা পার?

এ ধাঁধাটার সমাধান করতে পারলে একই যুক্তিতে বুঝে ফেলবে দ্বিধাশৃঙ্গী কোন গোত্রের। এখনই সমাধানটা বলে দিচ্ছি না। একটা ছোট্ট নীলতিমি ডিঙিয়ে সমাধানটার নাগাল পাবে। ততক্ষণ ভাবতে থাক।

15. নীলতিমি (Blue Whale : *Balaennoptera musculus*)

বিজ্ঞানের মতে নীলতিমি হচ্ছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে জলস্থল-অন্তরীক্ষে সর্ববৃহৎ না-মানুষ। অবশ্য গাছকে বাদ দিয়ে বলছি। দৈর্ঘ্যে এরা 70 থেকে 100 ফুট (30 মি)। ওজন 200 টন পর্যন্ত। গায়ের রঙ নীলচে, চিবুকে ও পেটে নানান ছোপ-ছোপ দাগ। উত্তর অতলান্তিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট এলাকায় এদের যাতায়াত। এই শতাব্দীর শুরুতে সারা পৃথিবীতে নীলতিমির সংখ্যা ছিল প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। তারপর শুরু হল ব্যাপক হারে



তিমি শিকার! জাপান, রাশিয়া, আমেরিকাই প্রধান সরিক। তিন দশকের ভিতর সংখ্যাটা কমে গিয়ে হল চল্লিশ হাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না বাধলে ওরা বোধহয় নির্মূল হয়ে যেত। কিন্তু 1939-45 বছর ছয়েক মানুষ নিজ-প্রজাতি শিকার করতে ব্যস্ত ছিল! তিমি-শিকার বন্ধ ছিল সে কয় বছর। 1950 সালে ইন্টারন্যাশানাল হোয়েল কমিশন আন্দাজ করেছিলেন ওদের সংখ্যা দশ হাজার। বর্তমান মনে হয় হাজার ছয়েক অবশিষ্ট আছে।

মুখে ঝিল্লি। খায় 'ক্রিল'—অতি ক্ষুদ্রাকার সামুদ্রিক প্রাণী, কুচো চিংড়ির চেয়েও ছোট। চিবুকে দীর্ঘ আঁজি-কাটা। নাকের উপর নাসাছিদ্র। অক্সিজেন নেবার প্রয়োজনে। ঘণ্টায় অন্তত একবার জলতলে উঠে এসে শ্বাস নেয়। স্তন্যপায়ী জীব। মিলনকাল গ্রীষ্ম। সন্তান মাতৃজঠরে বাস করে এগারো মাস। জন্ম সময়ে সদ্যোজাতর দৈর্ঘ্য প্রায় চব্বিশ ফুট (7 মিটার)। একটা কথা কখনো ভেবে দেখেছ? মাছ তার ভাসমানতা বজায় রাখতে দেহাভ্যন্তরে 'পটকা' পয়দা করেছে। তিমিদেহে 'পটকা' বা Swim-bladder নেই। তাহলে ঐ বিশাল দেহের প্রয়োজনে যে পরিমাণ অক্সিজেন লাগে তা টেনে নিয়ে নীলমিমি কী করে সমুদ্র-গভীরে যায়?

তার কারণ বাতাসটা ওরা ফুসফুসে জমা করে না। গ্রহণমাত্র তা ধমণীর দূষিত-রক্তকে শোধন করে ফেলে। দূষিত বাতাসটা ত্যাগ করে একই সঙ্গে! নীলতিমি নির্মূল হওয়ার আশঙ্কা একাধিক হেতুতে। প্রথমত আন্তর্জাতিক সংস্থাকে লবডঙ্কা দেখিয়ে এখনও অনেক তথাকথিত সুসভ্য জাত নীলতিমি শিকার করে বলে । দ্বিতীয়ত দুই বছর অন্তর ওদের সন্তান হয়—একবারে একটি। তৃতীয়ত ওরা বহুবিবাহ প্রথাটাকে মনে করে: বর্বরতা! ওদের বিবাহ বন্ধন আযৌবন এবং যাবজ্জীবন!

[**দ্বিধাশৃঙ্গী** বা **PRONGHORN** হরিণের প্রজাতিগত নামটা তখন বলিনি। তাহলে ধাঁধার মজাটা মাঠে মারা যেত। প্রজাতিগত নামটা *Antilocapta americana.*

নাতনি কী সূত্রে সমাধান পেয়েছিল এবার বুঝিয়ে বলি ঃ

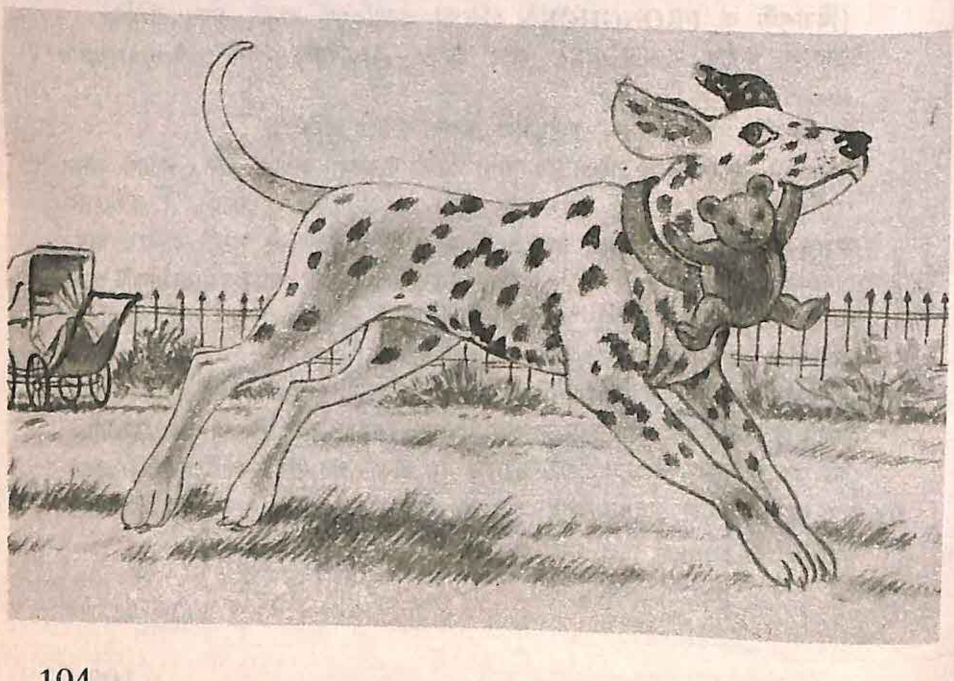
প্রথম কথা ঃ বাস-ড্রাইভারের বয়স হচ্ছে উত্তরদানকারীর বয়স। কারণ প্রথম পংক্তিতেই বলা হয়েছে, "মনে কর তুমি হাওড়া স্টেশন থেকে..."। কতলোক উঠছে-নামছে হিসাবটা মনে রাখতে গিয়ে প্রথম পংক্তির ঐ সূত্রটি হারিয়ে যায়। দ্বিধাশৃঙ্গীর বেলাতেও বলা হয়েছে আর্কিয়োড্যাকটিলার নয়টি গোত্রের মধ্যে একটি হচ্ছে দুর্লভ গোত্রের প্রাণী-বিশিষ্ট 'অ্যান্টিলোক্যাপিডি'! তারপর সে কথাটা চাপা দিয়ে 'বোভিডি' আর 'সার্ভিডি'-র ব্যাখ্যান করা হয়েছে!

দ্বিধাশৃঙ্গী ঐ 'অ্যান্টিলোক্যাপিডি' গোত্রের একমাত্র গণের একমাত্র প্রজাতি! মাত্র কয়েক শ আজও বেঁচে আছে উত্তর-আমেরিকায়। কোনও দুর্ধর্ষ শিকারী যদি সে কটাকে শেষ করতে পারেন তাহলে একটি **প্রজাতি** নয়, একটি **গণ** নয়, একটি **গোত্রই** নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমরা তারপর বলব: হারা-ধন অ্যার্টিয়োড্যাকটিলা বর্গে রইল বাকি মাত্র আটটি গোত্র! আগে ছিল নয়টি।]

ক্লিপ্‌টোম্যানিয়াক্‌

না, আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাদের না-মানুষদরদী হতে বলেছি মানে এমন কথা বলছি না যে, না-মানুষ মাত্রেই যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা আর মানুষেরাই পাজি। ওদের মধ্যেও দোষে-গুণে না-মানুষ আছে। এবার তারই একটা গল্প শোনাব। একটি ক্লিপ্‌টোম্যানিয়াক কুত্তার কিস্‌সা। আপনারা জানেন, 'ক্লিপ্‌টোম্যা-নিয়া' একটা মানসিক ব্যাধি — আর সেজন্য রোগীর কোন দোষ নেই। না-মানুষ প্লেটো যদি এই মানসিক ব্যাধিতে না ভুগতো তাহলে — কে বলতে পারে সেও হয়তো তার মানুষ মিতের মতো Timaeus অথবা Republic লিখে না-মানুষ জগতে অমর হয়ে থাকত। এ গল্পটা Estelle Mendelosn-এর একটি কাহিনীর (Reader's Digest, July '68) অবলম্বনে।

'ক্লিপ্‌টোম্যানিয়া অসুখটার কথা নিশ্চয় জানেন। বাংলায় এর কোনও প্রতিশব্দ আছে কিনা জানি না — 'অবচেতন মনের চৌর্যবৃত্তি' বলা যেতে পারে। চুরি করেই তারা আনন্দ পায়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের মতো। যে বস্তুটা চুরি করেছে সেটার কোনও প্রয়োজন নেই, সেটা ভোগ করতেও চায় না। নিতান্ত নিষ্কাম কর্ম! অধিকাংশ সময়ে জ্ঞানে



ফিরে এলে অপরিসীম লজ্জা পায়। কুকুরের প্রসঙ্গে আসার আগে এক মানুষ 'ক্লিপ্‌টোম্যানিয়াক্‌' এর কিস্‌সা শোনাই। এটা স্যার উইনস্টন চার্চিলের মৃত্যুর পরে মিসেস্‌ চার্চিল তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছিলেন।

ওঁদের বিবাহের সামান্য কিছুদিন পরের কথা। উইনস্টন তখন এক উদীয়মান পার্লামেন্টারিয়ান। লয়েড জর্জ-এর মন্ত্রীসভাতেও যোগদান করেননি। একবার চার্চিলের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ হল কোন এক ডিউক-ডাচেস্‌-এর ডিনার পার্টিতে। আহারের প্রস্তুতি পর্যায়ে কক্‌টেল চলছে। হঠাৎ মিসেস চার্চিলের নজর হল গৃহস্বামিনী কেমন যেন চুপ্‌সে গেছেন। তাঁকে জনান্তিকে ডেকে মিসেস্‌ চার্চিল প্রশ্ন করেন, তুমি এমন মন-মরা হয়ে পড়েছ কেন বলত?

ডাচেস্‌ ওঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। গোপনে নিবেদন করলেন, দুঃখের কথা আর বল না ভাই! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কাউন্ট অমুকের পুত্রটি একটি রূপার চামক পকেটে তুলে ফেলল। এই ডিনার সেটটা আমাকে স্বয়ং কুইন উপহার দিয়েছিলেন — তিনশ বাহান্ন পিসের সেট! আজ খুঁতো হয়ে গেল!

মিসেস চার্চিল অবাক হয়ে বলেন, মানে? ও হঠাৎ ঐ চামচটা চুরি করবে কেন? ও তো বিরাট বড়লোকের ছেলে?

— ও, তুমি বুঝি জান না? কাউন্ট অমুকের পুত্রটি একটি ক্লিপ্‌টোম্যানিয়াক্‌। জ্ঞান ফিরে এলে ও নিজেই লজ্জায় মিশে যাবে। কিন্তু ফেরত তো দিতে আসতে পারবে না।

মিসেস্‌ চার্চিল মর্মাহতা হলেন।

কিছু পরে চার্চিলের সেটা নজর হল। জনান্তিকে স্ত্রীকে একই প্রশ্ন করলেন তিনি, তুমি এমন মনমরা হয়ে পড়েছ কেন বলত?

মিসেস্‌ চার্চিল চুপি চুপি সব কথা তাঁর কর্তাকে জানালেন। চার্চিল বলেন, ও! এই কথা! আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি!

মিসেস্‌ তাঁর হাত দুটি ধরে বলেন, না, না, না! অমন চেষ্টাও কর না! কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবে তাহলে!

— হবে না! আমি জাত-ডিপ্লম্যাট! আমার উপর আস্থা রাখ! লাঠি ভাঙবে না, অথচ সাপ মরবে!

চার্চিল সুযোগ মত সেই কাউন্ট-তনয়কে আড়ালে ডেকে বললেন, ভাই! বড় বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য চাইছি! একটা উপকার করবে আমার?

কাউন্ট-তনয় এই উদীয়মান এম· পিকে চিনতেন? বললেন, বল, কি সাহায্য করতে পারি· আমি?

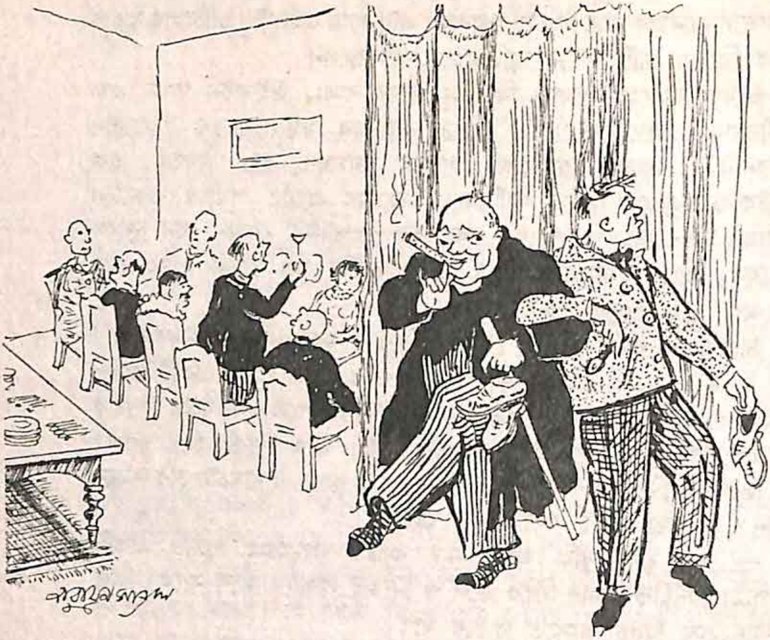
চার্চিল বলেন, শোন ভাই! আমি একটা মানসিক ব্যাধিতে ভুগছি। ক্লিপ্‌টোম্যানিয়া! কখন অজান্তে এই রূপার চামচটা তুলে পকেটে ফেলেছি! এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে আমার। আমি এটা লুকিয়ে টেবিলে ফেরত দিতে চাই। তুমি শুধু নজর রাখবে — কেউ যেন না জানতে পারে!

কাউন্ট-তনয় বলেন, কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে?

—কারণ ডাচেস্‌ দেখে ফেলেছেন আমাকে চুরি করতে!

— তুমি নিশ্চিত?





— ডাচেস-এর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। উনি তোমার ব্যাপারটাও জানতে পেরেছেন!

— আমার ব্যাপার! মানে?

— তোমার ব্যাপার নয়, তোমার ডান পকেটের ঐ রূপার চামচটার ব্যাপার। সেটাও উনি দেখতে পেয়েছেন! আমি জানি!

কাউন্ট-তনয় পকেটে হাত দিয়েই শিউরে ওঠেন। এতক্ষণ তিনি কিছুই জানতেন না।

অতঃপর দুই চোর পর্যায়ক্রমে পাহারা দিলেন এবং দুজনে পর্যায়ক্রমে চোরাই মাল টেবিলে ফেরত দিয়ে এলেন!

ধুরন্ধর চার্চিলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। লাঠি ভাঙেনি অথচ সাপটা মরেছিল!

প্লেটোর কথা বলি।

আমাদের বাড়ির সামনে যে পানবিড়ির দোকানটা আছে তার ছোকরাটা প্লেটোকে বোঝাতে বলত "the Big Donation." আসলে প্লেটো ছিল "a big Dalmatian" — ডোনেশান নয়। কিম্বা কি জানি ছোকরা রসিকতা করতেই ন্যাকা সেজে ঐ রকম উচ্চারণ করত কি না। কারণ প্লেটো নানান জাতের 'ডোনেশান' বা উপহার নিয়ে আসত আমাদের বাড়িতে। সচরাচর শিকারী কুকুর প্রভুকে যা এনে দেয় — পাখি, খরগোশ, সেসব কিছু নয়; সচরাচর শিক্ষিত কুকুর প্রভুকে যা এনে দেয় — বাথরুম স্লিপার, ছড়ি,



হ্যাট, তাও নয়। সে নিয়ে আসত স্রেফ — চোরাই মাল!

প্লেটোকে আমরা যা-কিছু শিখাতে চেয়েছি ও শেখেনি। 'স্টে, সিট্ ডাউন, জাম্প, হীল!' কাকস্য পরিবেদনা। প্লেটো অন্য দিকে মুখ করে হাই তুলত! রবারের বল ছুঁড়ে কুড়িয়ে আনতে বললে আরাম করে শুয়ে পড়ত! অশিক্ষিতের চূড়ান্ত!

কিন্তু চুরি বিদ্যায় সে দারুণ দড়! মজা হচ্ছে — বাড়ির লোকের কোন কিছু সে চুরি করত না। তার নজর বাইরে। বোধহয় ও ভাবত — বাইরের ধন চুরি করে আনলে আমরা খুশি হব।

একদিন বিকালে সুন্দর একটা হাই-হিল জুতোর একপাটি নিয়ে এসে হাজির! আনকোরা নতুন জুতো — গ্লেসকিড্! আশপাশের সব কয়টি বাড়িতে গিয়ে আমাকে খোঁজ করতে হল — কারণ আমিই বয়সে সবার ছোট — এ লজ্জার কথা তো বড়রা স্বীকার করতে পারেন না! কিন্তু চোরাই মালের মাল্‌কিনের সন্ধান পেলুম না। হয়তো বে-পাড়া থেকে এনেছে।

রোজই সন্ধ্যার ঝোঁকে সে নিয়ে আসে নানান পুতুল। টেডি-বেয়ার, মিকি-মাউস, ন্যাকড়ার ক্যাঙারু, হাতী, ঝুমঝুমি! তার কারণ বাড়ির অদূরেই আছে একটা পার্ক। প্যারাম্বুলেটারে বাচ্চাকে নিয়ে মায়েরা আসে সেখানে। প্লেটো তক্কে-তক্কে থাকে! আশ্চর্য! একবারও ধরা পড়ে না।

কী কেলেঙ্কারি! আমাদের বাড়িতে স্তূপাকার হয়ে জমে যাচ্ছে ঐ সব। কার মাল খোয়া গেছে জানব কী করে? আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো জিজ্ঞাসা করা যায় না — হ্যাঁগো! আমাদের প্লেটো যে বিশ-পঞ্চাশটা চোরাই মাল এনেছে তার ভিতর কোনটা কি তোমাদের?

তারপর একদিন! প্লেটো নিয়ে এল বেশ বড় টেডি-বেয়ার। রীতিমতো দামী জিনিস!

বাবা বললেন, ওকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখ।

বাবা তো বলেই খালাস! কিন্তু প্লেটো যে মুক্তপ্রাণী! তাকে কি বেঁধে রাখা যায়? আর 'ক্লিপ্‌টোম্যানিয়া' তো একটা মনের অসুখ! ও তো সজ্ঞানে চুরি করে না!

পরদিন স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হল, "গতকাল সন্ধ্যায় নর্দার্ন পার্কে প্যারাম্বুলেটার থেকে একটা প্রকাণ্ড টেডি-বেয়ার খোয়া গেছে। দু-বছরের বাচ্চাটা তারপর থেকে মনমরা হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত কাঁদছে। তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না! ওটা দয়া করে ফেরত দেবেন?"

আমরা শলা-পরামর্শে বসলাম। স্থির হল, বাবা নিজেই যাবেন। ওদের দোরগোড়ায় টেডি-বেয়ারটাকে বসিয়ে কলিং-বেল বাজাবেন। ভিতরে নড়াচড়ার শব্দ শুনলেই ছুটে এসে বসবেন গাড়িতে। দরজা খোলা হচ্ছে দেখলেই স্টার্ট দিয়ে হুস্ করে পালিয়ে আসবেন।



চুরি করল প্লেটো, আর চোরের দায়ে ধরা পড়বেন বাবা!

পরিকল্পনাটা ভালই ছিল। কিন্তু অন্ধকারে বাবা বেল বাজানোর আগেই একটা হোঁচট খেলেন। তৎক্ষণাৎ পোর্চের আলো জ্বলে উঠল। আর সদর দরজাটা গেল খুলে। এক বৃদ্ধা বললেন, ইয়েস, কাকে চাই!

বাবা আমতা আমতা করে বলেন, 'ইয়ে হয়েছে! আপনারাই বোধহয় আজ কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন··· মানে···'

বৃদ্ধা বিনা বাক্যব্যয়ে বাবার হাত থেকে টেডি-বেয়ারটাকে ছিনিয়ে নিলেন শুধু।

বাবা তখন ব্যাক-গিয়ারে হাঁটছেন; আচ্ছা চলি, নমস্কার।

সেই সময় এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধার পাশে। সম্ভবত, বৃদ্ধার স্বামী এবং টেডি-বেয়ার-বঞ্চিতার ঠাকুর্দা। তিনি স্ত্রীকে বলেন, ও ভদ্রলোক কে? কী চাইছেন?

বৃদ্ধা বলেন, ভদ্রলোক! হ্যাঁ, ভদ্রলোক তো বটেই! খুকুর পুতুলটা ফেরত দিতে এসেছিল।

বাবা ততক্ষণে গাড়িতে। কিন্তু স্টার্ট দেবার আগেই শুনতে পেলেন বৃদ্ধের বিস্ময়বোধক প্রশ্নটা, মাই গড! ঐ ধেড়ে মানুষটা খুকুর টেডি-বেয়ারটা চুরি করেছিল।

একটা জিনিস বাড়ির কেউ খেয়াল করেনি; কিন্তু আমার নজর হয়েছিল। চোরাই মালগুলো তো ফেরত দেওয়া যেত না, ফেলে দেওয়াও যেত না। তাহলে সেগুলো যেত কোথায়? বামুনদির ঘরে! বামুনদি বুড়ি। কিন্তু তার নাতি-নাতনি আছে। বছরে একবার সে বড়দিনের আগে বাড়ি যায়। ব্যাপারটা আমার নজরে পড়েছে; কিন্তু লজ্জায় কাউকে কিছু বলিনি।

কিছুদিন পরের কথা।

বামুনদির এক বান্ধবী বাচ্চা হতে হাসপাতালে গেল। বামুনদি বিকালবেলায় ভিজিটিং আওয়ার্সে দেখতে গেল তাকে। প্লেটোকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা নয়; কিন্তু সে লেজুড় ধরলে বামুনদি কী করতে পারে? বান্ধবীর সঙ্গে মেটার্নিটি ওয়ার্ডে যতক্ষণ সে গল্পগাছা করেছে ততক্ষণ প্লেটোকে সে দেখতে পায়নি। ফেরার পথেও প্লেটো ওর সঙ্গে ছিল না। তবে প্লেটো পথঘাট ভালই চেনে। একা একা ফিরে আসতে পারবে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। বামুনদিরও নয়।

বাড়ি ফিরে বামুনদি আমাকে প্রশ্ন করল, খোকন, প্লেটো আসেনি এখনো?



আমার ভীষণ রাগ হল। বললাম, না! সে বোধহয় তোমার জন্য কিছু সওদা করতে গেছে!

বামুনদি রাগ করল না একটুও। এক গাল হেসে বললে, তা হতে পারে!

চোরের মন বোঁচকার দিকে! তাকে কোথাও দেখতে পেলুম না যাতায়াতের পথে!

বামুনদি রান্না-ঘরের দিকে চলে গেল।

একটু পরেই দেখি, শ্রীমান প্লেটো এসে উপস্থিত। আমার কাছে সে ভিড়ল না। সটান চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। মুখে যথারীতি এক চোরাই মাল। খবরের কাগজে জড়ানো!

আমি হাঁক পাড়ি: প্লেটো! কাম হিয়ার!

কথা না শোনা ওর স্বভাবজাত। তায় এখন তার মুখে বামাল! বামুনদি কি ওকে উৎসাহ জোগায়? চোরাই মাল এনে দিলে মাংসের টেংরি উপহার দেয়?

চুপি-সাড়ে আমি এগিয়ে যাই রান্নাঘরের দিকে! ভেজানো দরজার সামনে আড়ি পাতি। যা ভেবেছি তাই!

চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। কিন্তু বামুনদির কণ্ঠস্বর কানে গেল, এই তো সোনামণি! কী এনেছ তোমার আন্টির জন্যে? দেখি দেখি!

নাঃ! ব্যাপারটা বলতে হবে ড্যাডিকে। বামুনদির আশ্‌কারা পেয়ে পেয়েই···

মনে মনে বাক্যটা সমাপ্ত হল না। কারণ পরক্ষণেই বামুনদির এক চিল-চিৎকার: ও মা গো!

দৌড়ে এগিয়ে যাই।

দেখি বামুনদি ইতিমধ্যে কাগজে জড়ানো পুঁটুলিটা নিয়েছে। ফেলে দিয়েছে মাটিতে।

অতি যত্নে প্লেটো এবার হাত সাফাই করেছে হাসপাতালের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে। স্টুল স্যাম্পল! তার গায়ে লেখা: মিসেস্ লেভির স্পেসিমেন!

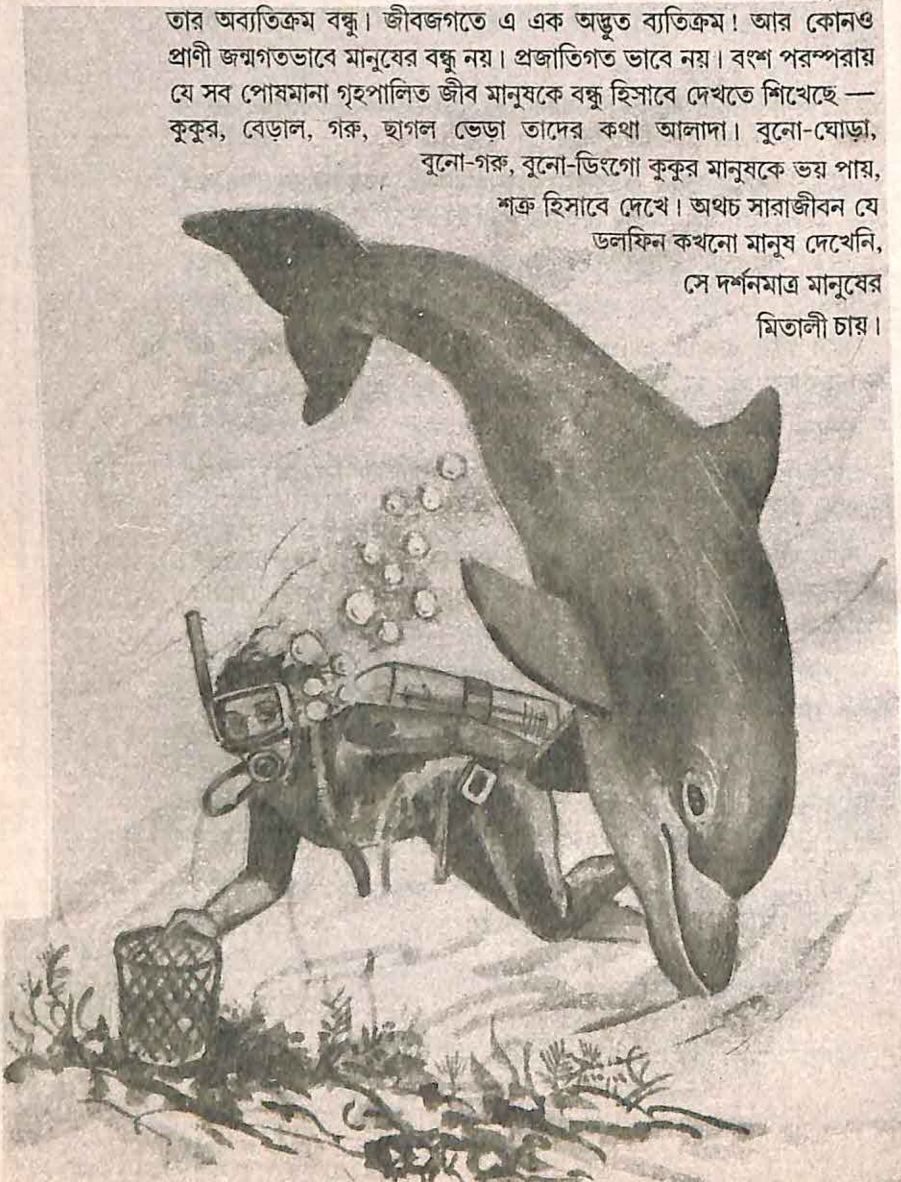
প্লেটো আজও রোগমুক্ত হয়নি। বামুনদি হয়েছে। সে আর তারপর থেকে প্লেটোকে কোনদিন আশ্‌কারা দিত না।

আপনাদের যদি কোন জিনিস হারায়, চটি, ছাতা, কানের দুল, বিশেষ করে বাচ্চাদের খেলনা, তাহলে দয়া করে আমাকে একটা টেলিফোন করবেন। ফেরত পাবেন। পরিবর্তে প্রার্থনা করবেন প্লেটো নিরাময় হয়ে উঠুক!

ডলফিন

নানা তথ্যসূত্র থেকে এ কাহিনীর কাঠামো গড়া গেছে। বিষয়টা নিয়ে 'তিমি-তিমিঙ্গিল' বইতে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম (প্রকাশকাল : 1979)। তারপর যেসব জীববিজ্ঞানের বই পড়েছি তার তথ্যসূত্র থেকেই এ কাহিনীর অবতারণা।

আমাদের, মানে না-মানুষদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রজাতি আছে তিম্যাদি-বর্গের (Cetacian Order) : তার নাম ডলফিন। মানুষেরা তার অব্যতিক্রম বন্ধু। জীবজগতে এ এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম! আর কোনও প্রাণী জন্মগতভাবে মানুষের বন্ধু নয়। প্রজাতিগত ভাবে নয়। বংশ পরম্পরায় যে সব পোষমানা গৃহপালিত জীব মানুষকে বন্ধু হিসাবে দেখতে শিখেছে — কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল ভেড়া তাদের কথা আলাদা। বুনো-ঘোড়া, বুনো-গরু, বুনো-ডিংগো কুকুর মানুষকে ভয় পায়, শত্রু হিসাবে দেখে। অথচ সারাজীবন যে ডলফিন কখনো মানুষ দেখেনি, সে দর্শনমাত্র মানুষের মিতালী চায়।



বলতে পারেন — কেন?

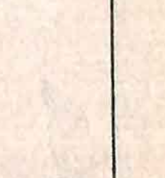
এটা সত্যিই একটা ধাঁধা! বহু প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রচারী নাবিকদের মধ্যে একটা কথার প্রচলন আছে — পথহারা নাবিককে ডলফিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথ দেখায়, ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করে। মিশর, গ্রীস, রোমের সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে, বাইবেলে স্বীকৃতি আছে। আর পাঁচটা গাল-গল্পের মতো বিজ্ঞান এ কিংবদন্তী প্রথমে বিশ্বাস করত না। কিন্তু পরে এ সত্যটা প্রমাণিত হয়েছে।

সবচেয়ে বিখ্যাত 'পোলোরাস জ্যাক'। আন্দামান-নিকোবরের মতো নিউজিল্যান্ডে প্রধান দুটি দ্বীপ — দুই দ্বীপের মাঝখানে সংকীর্ণ প্রণালীটা ডুবো পাহাড়ে ভর্তি। উত্তর দ্বীপের ওয়েলিংটন বন্দর থেকে দক্ষিণ-দ্বীপের নেলসন বন্দরে আসতে হলে তাই নাবিকদের গোটা দ্বীপটা ঘুরে আসতে হত — না হলে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজডুবির আশঙ্কা। নাবিকদের এই সমস্যা প্রণিধান করে ঐ অজ্ঞাতনামা ডলফিনটা নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিল। বিসর্পিল পথে ডুবো পাহাড় এড়িয়ে সে অনুসরণকারী জাহাজকে পথ দেখিয়ে প্রণালীটা পারাপার করে দিত। নাবিকদের এই গল্পকথা অবিশ্বাস করে কয়েকজন জীববিজ্ঞানী সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন। তাঁদের জাহাজটা প্রণালীর কাছাকাছি এসে বার কয়েক সিটি দিতেই দেখা গেল সেই ডলফিনটা এগিয়ে এসে ঘাই দিচ্ছে! তারপর পথ-প্রদর্শকের মতো এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চল্‌ল সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে।

1904 থেকে 1911 পর্যন্ত এভাবে পোলোরাস জ্যাক অসংখ্য জাহাজকে পারাপার করে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ড সরকার আইন জারী করলেন — ঐ জ্যাক হচ্ছে জাতীয় সম্পত্তি। তাকে বধ বা বিরক্ত করা আইনত অপরাধ। 1912-র পরে তাকে আর দেখা যায়নি।

শোনা যায়, 1912 সালে চার চারটি নরউইজিয়ান তিমি-শিকারী জাহাজ নোঙর গেড়েছিল ওয়েলিংটন বন্দরে। ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সরকারের আর একটি মৎসশিকারী প্রতিষ্ঠানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রেষারেষি ছিল। একদিন ঐ নরউইজিয়ান কোম্পানির একটি জাহাজ থেকে একজন ডাচ্ নাবিক মত্তাবস্থায় পোলোরাস জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি করে। জ্যাক মরে না, কিন্তু আহত হয়। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকার একটা তদন্ত কমিশন বসাবার প্রস্তাব করেন — কারণ পোলোরাস জ্যাক ছিল জাতীয় সম্পত্তি, তাকে গুলি করা নিতান্ত বেআইনী কাজ। প্রথমে সকলের ধারণা হয়েছিল গুলি খেয়ে জ্যাক মারা গেছে, কারণ পরদিন থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। অবস্থা যখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে তখন আবার একদিন দেখা গেল জ্যাককে। ওয়েলিংটন বন্দরের সমুদ্র সৈকতের কাছে জল থেকে মাথা তুলে দুই হাতডানায় তালি বাজাচ্ছে! ঘাম দিয়ে সকলের জ্বর ছাড়ল যেন।

যে তথ্যসূত্র থেকে এই কাহিনীটি সংগ্রহ করেছি তাঁরা এরপর যা বলেছেন তা মেনে নিতে কেমন যেন বিশ্বাস হয় না — এরপর থেকে জ্যাক আর পাঁচটা জাতির জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত, শুধুমাত্র ঐ নরউইজিয়ান

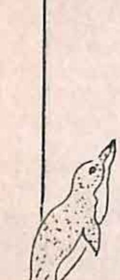


কোম্পানির চারখানি জাহাজ ছাড়া। অন্য যে কোন জাহাজ — তা যাত্রীবাহী, মালবাহী যাই হোক — প্রণালীর কাছাকাছি এসে ভোঁ দিলেই জ্যাক সাঁতরে আসত! পথ দেখিয়ে দিত। অথচ ঐ নরউইজিয়ান কোম্পানির চারখানি জাহাজ বাদে!

আমাদের মনে দু-দুটো প্রশ্ন জাগে। প্রথম কথা যে জাহাজ থেকে ওকে গুলি করা হয়েছিল সেটাকে জ্যাক কোনক্রমে চিনলেও ঐ কোম্পানির বাকি তিনখানা জাহাজকে সে কেমন করে সনাক্ত করত? দ্বিতীয় কথা — অতই যদি বুদ্ধি ধরে তাহলে জ্যাক কেন তির্যক পথে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল না? সে তো অনায়াসে তার শত্রু জাহাজকে ভুল পথে পরিচালিত করে ডুবো-জাহাজে ধাক্কা খাওয়াতে পারত! সে তো বাইবেল পড়েনি, কিম্বা মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগিতার প্রবন্ধ! তাহলে কি ধরে নেব মানুষের শত্রুতা করার ইচ্ছা তার জন্মাতেই পারে না? প্রজাতিগত সংস্কারে?

পোলোরাস জ্যাক ' তা এ শতাব্দীর প্রথম যুগের কথা। একটি সাম্প্রতিক ঘটনা শুনুন। এটা বলছেন, ফ্লোরিডা উপকূলের এক মার্কিন স্নানার্থিনী:

"আমি সাঁতার জানি না। মাজা-জলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র স্নান করছিলাম সেদিন। আমার স্বামীর সঙ্গে। স্নান করতে গেলে যেমন হয় — ঢেউ-এ-ঢেউ-এ আমি কিছু দূরে সরে এসেছি। ঘাটে আরও অনেক লোক আছে। যদিও আমার পাঁচ-সাত হাত দূরে সে সময়ে কেউ নেই। হঠাৎ একটা বড় ঢেউ-এর পর আমার পদস্খলন হল। ঢেউটা সরে যাবার পর দাঁড়াতে গিয়ে দেখি পায়ের তলায় জমি নেই! তার মানে, ঢেউ-এর ধাক্কায় আমি ডুব জলে চলে গেছি! আমার স্বামী তখন বেশ কিছুটা দূরে। মৃত্যুভয়ে আমি আর্তনাদ করে উঠি। কেউই তা শুনতে পেল না। মৃত্যুকে দেখলাম মুখোমুখি! সেই মুহূর্তটির বর্ণনা করা অসম্ভব! অনিবার্য-সলিল-সমাধি থেকে রক্ষা পেলাম অলৌকিকভাবে! না, ভুল বলেছি — অলৌকিক নয়! সমুদ্র গর্জনে আমার আর্তনাদ কোনও মানুষ শুনতে পায়নি বটে, কিন্তু শুনতে পেয়েছিল এমন একজন, যার শ্রবণশক্তি মানুষের চেয়ে বহুগুণে বেশি! হঠাৎ মনে হল তলা থেকে কে যেন আমাকে গুঁতো মেরে উপরে তুলে দিল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আমার কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। মনে হল, আমার কাছেপিঠে কেউ তো ছিল না — তাহলে আমাকে তলা থেকে ঠেলা মারল কে? চার-পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার — তারপর ঐ অজ্ঞাত বন্ধুর এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি বালির উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় দশ-পনের ফুট দূরে আমার উদ্ধারকারী — একটা ডলফিন জল থেকে মাথা তুলে আমাকে দেখছে। তার চোখ দুটো রীতিমত জ্বলজ্বল করেছে। আমি দু-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সে দুটো হাতডানায় তালি বাজিয়ে খ-খ-খ-খ করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই সে মিলিয়ে গেল সমুদ্রে। আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে, ওকে ধন্যবাদটা পর্যন্ত জানাতে পারিনি।"



1966 সালে বিলাতের সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখছি ডলফিনের অনুরূপ ব্যবহার।

সুয়েজ প্রণালীতে একজন ইতালিয়ান নাবিক হঠাৎ ঘটনাচক্রে জাহাজ থেকে উল্টে পড়ে যায়। জায়গাটা মানুষখেকো হাঙরে আকীর্ণ। নাবিকটি উদ্ধার পাওয়ার পর সাংবাদিকদের বলেছিলেন — একদল ডলফিন নাকি তাকে রক্ষা করে। সে যখন সাঁতরে জাহাজের দিকে ফিরছিল তখন একটা হাঙর তাকে বারে-বারে আক্রমণ করতে তেড়ে আসে। কিন্তু তার গাত্রস্পর্শ করতে পারে না ; কারণ গোটা দশ-পনের ডলফিন তাকে চক্রকারে ঘিরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

আর একজন সিটেশিয়ান বিজ্ঞানীর (তিম্যাদি-বিশারদ) বক্তব্য শুনুন। এটাও ঐ ষাটের দশকের ঘটনা:

উপকূল থেকে অনেক দূরে একদিন একটা ঘটনা ঘটল। আমার নৌকার অদূরে দেখতে পেলাম একটা হাঙর বারে বারে জল থেকে ঘাই মেরে উঠছে। কৌতূহলী হয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি — ঐ রাক্ষুসে হাঙরটাকে ঘিরে ফেলেছে সাত-আটটা ডলফিন। কেউ পালাচ্ছে না — যদিও পালাবার রাস্তা তাদের চারদিকেই খোলা। ডলফিনগুলো পর্যায়ক্রমে বিদ্যুদ্‌বেগে সাঁতরে এসে ঐ হাঙরটার পেটে গুঁতো মারছে! হাঙরটা ওদের বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করল। করবেই! তার তীক্ষ্ণ দাঁত আছে, ডলফিনের দাঁতে কামড় নেই! তবু একজনও পালালো না। রক্তের ধারায় তারা প্রায় সকলেই ভেসে গেল তবু ক্রমাগত ফিরে ফিরে এসে গুঁতো মারল হাঙরের পেটে। শেষ পর্যন্ত হাঙরটাই ঐ নিরীহ ডলফিনের ব্যূহ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করল। পারল না! আশ্চর্য! তীক্ষ্ণ দাঁতের অধিকারী ঐ মাংসাশী হাঙরটা শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিল একতামন্ত্রে দীক্ষিত ঐ নিরীহ ডলফিনের কাছে!

এবার 'ওপোননি'-র কথা বলি:

এটাও নিউজিল্যান্ডের ঘটনা। গ্রামটার নাম ওপোননি। 1955 সালে ঐ সমুদ্রতীরে একটা মজার ঘটনা ঘটল। শত শত স্নানার্থীর সঙ্গে সমুদ্রস্নান করছিল ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা জিল বেকার। কোমর জল। বেচারি সাঁতার জানে না। কাছে স্নান করছে তার বাবা-মা। জিল বলছে, তার হঠাৎ মনে হল — দুই পায়ের ফাঁকে মসৃণ কী একটা জীব সেঁদিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই দেখে যে, সে জলে ভাসছে! কিসের পিঠে? ঘটনাটা অনেকেই দেখতে পেয়েছে। ভয়ে সবাই চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার শুনে জন্তুটা ডুব দিল — কিন্তু মাত্র হাতখানেক। অর্থাৎ তখন জন্তুটাকে দেখা যাচ্ছে না — দেখা যাচ্ছে শুধু জিলকে। সবাই দেখছে জিল দু-দিকে দু-পা ঝুলিয়ে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা মাছের পিঠে, দু-হাতে তার পিঠ-ডানাটা আঁকড়ে। আসলে সেটা মাছ নয়, ডলফিন! অনেক দক্ষ সাঁতারু তার পিছু নিল।

কী পাগলের কথা! সাঁতরে নাগাল পাবে ডলফিনের? যে নাকি ঘণ্টায় পঞ্চাশ কি·মি· বেগে সাঁতরাতে পারে? ঘাটশুদ্ধ সবাই আর কী করবে? হায়-হায় করে ওঠে!

কিন্তু না! ডলফিনটা রাবণ রাজার মতো সীতাহরণে আসেনি। এসেছিল



দশকোটি বছরের ওপার থেকে ভেসে আসা আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করে! হ্যাঁ, তিম্যাদি স্তন্যপায়ী জীবেরা প্রায় দশকোটি বছর আগে ডাঙা থেকে জলে ফিরে যায়!

ডলফিনটা এসেছিল সেই আত্মীয়তার টানে। ঘাটে স্নানরতা ঐ কিশোরীকে নিয়ে একটু মজা করতে। গভীর সমুদ্রে আধমাইলটাক একটা চক্কর মেরে সে আবার ফিরে এল ঘাটে। একটা ডিগ্‌বাজি খেয়ে — আশ্চর্য — যার ধন তাকেই ফেরত দিল! একেবারে জিল বেকারের মায়ের কোলে!

ওপোননি ক্রমে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ঐ সমুদ্রতীরেই সে স্নানার্থী বাচ্চাদের নিয়ে খেলা করত। জিলের বয়সী অনেক ছেলেমেয়েকে সে তার পিঠে সওয়ার করত। ওর দিকে রবারের বল ছুঁড়ে দিলে সে 'হেড' করে ফেরত পাঠাত। ছিপি এঁটে খালি বিয়ারের বোতল জলে ফেলে দিলে সে সেটাকে নাকের উপর তুলে ব্যালেন্সের খেলা দেখাতো। শেষপর্যন্ত 'ওপেননি'কেও নিউজিল্যান্ড সরকার জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে ডল্‌ফিনের ভাষা নিয়ে নানান গবেষণা হয়েছে। ওদের ভাষা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি — কিন্তু এটুকু বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে যে, ডলফিন পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে। শুধু জৈবিক প্রয়োজনের ইঙ্গিতময় ভাষা নয় — রীতিমতো নৈর্ব্যক্তিক তাত্ত্বিক আলোচনা!

সত্তরের দশকের শেষাশেষি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম — 'তিমি তিমিঙ্গিল'। তাতে ডলফিন বিষয়ে তৎকালীন সংগৃহীত অনেক তথ্য ছিল। কিন্তু গত দশ পনের বছরে ঐ বিষয়ে দুর্দান্ত গবেষণা হয়েছে — যে সব কথা ঐ বই লিখবার সময় আমার জানা ছিল না। সেগুলিই এবার সর্বাগ্রে নিবেদন করি:

ষাটের দশক থেকেই জন লিলি ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে একটি ডলফিন কম্যুনিকেশন রিসার্চ ইনস্টুট প্রতিষ্ঠা করে ডলফিন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। ডলফিন মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব, তিম্যাদি বর্গের (Cetacian Order). ক্রিটেশিয়ান যুগের শেষাশেষি, মানে প্রায় দশ কোটি বছর আগে যখন অজ্ঞাত কারণে অতিকায় ডাইনোসররা লুপ্ত হয়ে যায় তখনই জন্ম নেয় স্তন্যপায়ী জীবেরা। তাদের একটি শাখা আবার সমুদ্রে ফিরে যায় — এরাই তিম্যাদি বর্গের স্তন্যপায়ী।

লিলি একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা বানিয়ে ডলফিনদের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। জলতলের একটু উপরে পাতা হল একটা প্ল্যাটফর্ম। জলে রইল একটি পুরুষ ডলফিন — পিটার, আর ঐ প্ল্যাটফর্মেসপ্তাহে ছয়দিন দিবারাত্র বাস করত লিলির এক সহকারী মহিলা — মার্গারেট। দুজনে গভীর বন্ধুত্ব হল। মার্গারেট বারে বারে জলে নামে বন্ধুর সঙ্গে খেলা করতে। নেহাৎ ক্লান্ত হলে পাটাতনে উঠে বসে। তখন পিটার এগিয়ে আসে সোহাগ জানাতে। সপ্তাহে একদিন মার্গারেট তার পুরুষ বন্ধু আর পিটার তার স্বজাতীয়া সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটাতো।



দশ সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় মার্গারেট বলেছে, পড়াশুনায় পিটারের দারুণ

আগ্রহ। আমার চেয়ে তার অধ্যবসায় বেশি। বেশ বোঝা যেত পিটার শুধু আমার ভাষাটা শিখতেই চাইত না, তার ভাষাটাও আমাকে শেখাতে চাইত।

লিলি লিখেছেন, বেশ অনুভব করা যেত যে, ওরা বুঝতে পারছে আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাতে ওদের প্রচণ্ড আগ্রহও ছিল। কুকুর, ঘোড়া, শিম্পাঞ্জীকে আমরা যখন সার্কাসে খেলা শেখাই তখন কৃতকার্য হলে কিছু খাবার উপহার দিই। এটাই সাধারণ নিয়ম। আমরা বারে বারে দেখেছি, ডলফিন সেটা মানতে রাজি নয়। কৃতকার্য হবার জন্যই তাকে প্রিয় খাদ্য দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারলে ওরা প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত করত। ভাবখানা দুটি স্তন্যপায়ী প্রজাতি পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়, এর মধ্যে ঘুষ দেবার প্রশ্ন আসছে কেন?

আড়াই মাসের চেষ্টায় পিটার সামান্য কয়েকটি ইংরাজী শব্দ (word) শিখতে পেরেছিল। দু-একটা ক্ষেত্রে অর্থ বুঝে তাকে ঐ একধ্বনি-বিশিষ্ট মনোসিলেব্ল ব্যবহার করতেও দেখা গেছে। যেমন more (আরও)। এ নয় যে, ঐ ধ্বনিটা করলে তাকে আরও খাবার দেওয়া হবে বলেই তার মস্তিষ্কে খাদ্য-ধ্বনি সম্পর্কটা স্থাপিত হয়েছিল। একথা কেন বলছি?

শুনুন তাহলে:

কার্ল সাগান — আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই টি·ভি·র-কসমস-খ্যাত বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানীটির কথাই বলছি, একবার ডলফিন নিয়ে লিলি কী জাতের গবেষণা করছেন তাই দেখতে গেছিলেন। লিলি কেতা-দুরস্তভাবে তাঁর একটি শিক্ষিত ডলফিনের সঙ্গে বিজ্ঞানীর আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ডক্টর সাগান, এঁর নাম এডগার।

এডগার যথারীতি তার হাতডানা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। সাগান খুব কিছু বিস্মিত হলেন না। এ ধরনের সার্কাসের খেলা তিনি অন্যত্রও দেখেছেন। করমর্দনের পরেই এডগার কী যেন বলে উল্টে গিয়ে তার ভুঁড়িটা চিতিয়ে দিল। এবার লিলি ঐ শ্লোকের 'শাঙ্করভাষ্য' দাখিল করে বললেন, এডগার আপনাকে অনুরোধ করছে ওর তলপেটে একটু সুড়সুড়ি দিতে।

সাগান ওর অনুরোধ রাখলেন। তৎক্ষণাৎ এডগার সাঁতার দিয়ে দূরে সরে গেল। জল থেকে মাথা তুলে দুই হাতডানায় হাততালি বাজালো। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সাগান অনেক অনেক হাততালি পেয়েছেন, এই প্রথম তা পেলেন ভিন্ন প্রজাতির এক জীবের কাছে।

এডগার আবার ফিরে এল ঘাটের কাছে। আবার চিৎ হল; এবার কিন্তু ওর তলপেট জলতলের এক বিঘৎ নিচে। সাগান সাহেব কী আর করেন? আস্তিন গুটিয়ে আবার সুড়সুড়ি দিলেন।

এডগার পুনরায় দূরে সরে গেল, হাততালি বাজালো, এবং ঘাটের কাছে এসে চিৎ হল। এবার কিন্তু জলতলের এক হাত নিচে।

সাগান হয়ত মনে মনে বললেন, এ তো আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল দেখছি! মুখে কিন্তু কিছু বললেন না তিনি। কোটটা খুলে, হাঁটু গেড়ে, আস্তিন ভিজিয়েই এবার সুড়সুড়ি দিলেন।



এডগার তৎক্ষণাৎ দূরে গিয়ে হাততালি দিল। ফিরে এসে যখন চিৎ হল

তখন ওর দেহ জলতলের দেড় দু'হাত নিচে। অর্থাৎ খেলাটা চালিয়ে যেতে হলে এবার সাগানকে জলে নামতে হয়। তিনি এবার বলে বসলেন, নো!

এডগার তৎক্ষণাৎ উবুড় হল। এক দৃষ্টে সাগানের দিকে মিনিট-খানেক তাকিয়ে রইল। এবার সে দূরে সরে গেল না। ওখানেই জল থেকে মুখ তুলে স্পষ্ট উচ্চারণে বললে: More! More!

সাগান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অর্থযুক্ত ইংরাজি বলতে পেরেছে বলেই শুধু নয়, এডগার রীতিমতো ফন্দি করে ওঁকে 'লেগ-পুল' করেছে! বোকা বানিয়েছে বলে!

লিলি বলছেন, কাকাতুয়া, ময়না প্রভৃতি হরবোলা পাখির সঙ্গে ডলফিনের কথা বলা প্রভেদ আকাশ-পাতাল। হরবোলা পাখি অর্থ না বুঝে শব্দটা অনুকরণ করে। যখন 'রাধাকৃষ্ণ' পড়ে তখন 'রা-ধা-কৃষ-ন' এই চারটি ধ্বনি করে। তাকে দিয়ে যদি এবার 'কৃষ্ণরাধা' বলাতে চান তাহলে, সেই সময়ই লাগবে যা লেগেছিল 'রাধাকৃষ্ণ' শেখাতে। অপর পক্ষে ডলফিন যদি 'রাধাকৃষ্ণ' বলতে শেখে, তাহলে শুনে শুনে পর মুহূর্তেই 'কৃষ্ণরাধাও' বলতে পারবে। কারণ ঐ চারটি ধ্বনি পৃথক পৃথক ভাবে ওর মস্তিষ্কে সঞ্চিত হবে। ঐ ধ্বনিচতুষ্টয়ের যে কোন পার্মুটেশন কম্বিনেশন তার আয়ত্তে আসবে!

এই তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠিত হল কীভাবে? এজন্য লিলি 187 টি অর্থবিযুক্ত ধ্বনি (Nonsense syllables) বেছে নিয়েছিলেন। তার সবগুলিই কিন্তু একধ্বনি-বিশিষ্ট (mono-syllable) নয়। অর্থবিযুক্ত ধ্বনি বেছে নেওয়া হল ডলফিনের কথা চিন্তা করে নয়, পরীক্ষকের জন্য। কারণ দেখা গেছে, অর্থযুক্ত শব্দ শিক্ষক অভ্যাসবশে একটা বিশেষ ঢঙে উচ্চারণ করেন — যা শুধুমাত্র ধ্বনিনির্ভর নয়। তাতে জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

উনি দেখতে চাইলেন, এই উল্টো-পাল্টাভাবে সাজানো ধ্বনিগুচ্ছ (এক-এক গুচ্ছে তিন থেকে দশটি ধ্বনি) ডলফিনকে শোনানো, এবং শ্রবণমাত্র ডলফিন তা উচ্চারণ করতে পারছে কি না তাই দেখা! দেখা গেল, ওরা নির্ভুলভাবে তা উচ্চারণ করছে!

স্বীকার্য; পরীক্ষক ও ডলফিন উচ্চারিত শব্দনিচয়ের মধ্যে বেশ তফাৎ থাকত। কেমন জানেন? ধরুন পরীক্ষক বললেন, 'কাদ-লসা-টাপি-সবা'। তিনি থামতেই ডলফিন বললে 'হাৎ-লজা-তাফি-জহা'।

তার মানে এ নয় যে, ডলফিনটা ভুল বলেছে। কারণ চার-পাঁচটা ডলফিনই ঐ শব্দগুচ্ছ শুনে ঐ একই কথা বলেছে, হাৎ-লজা-তাফি-জহা! তার হেতুটা লিলির মতে এই — ডলফিনের শ্রুতি ও স্বর মানুষের মতো নয়। ঠিক যেমন আমরা ভুল ইংরাজি উচ্চারণ করে ভাবি ককনি বলছি! অথবা ইংরাজ ঠিক 'বেংগালির মটোই বাংলা বলটে পারেন!'

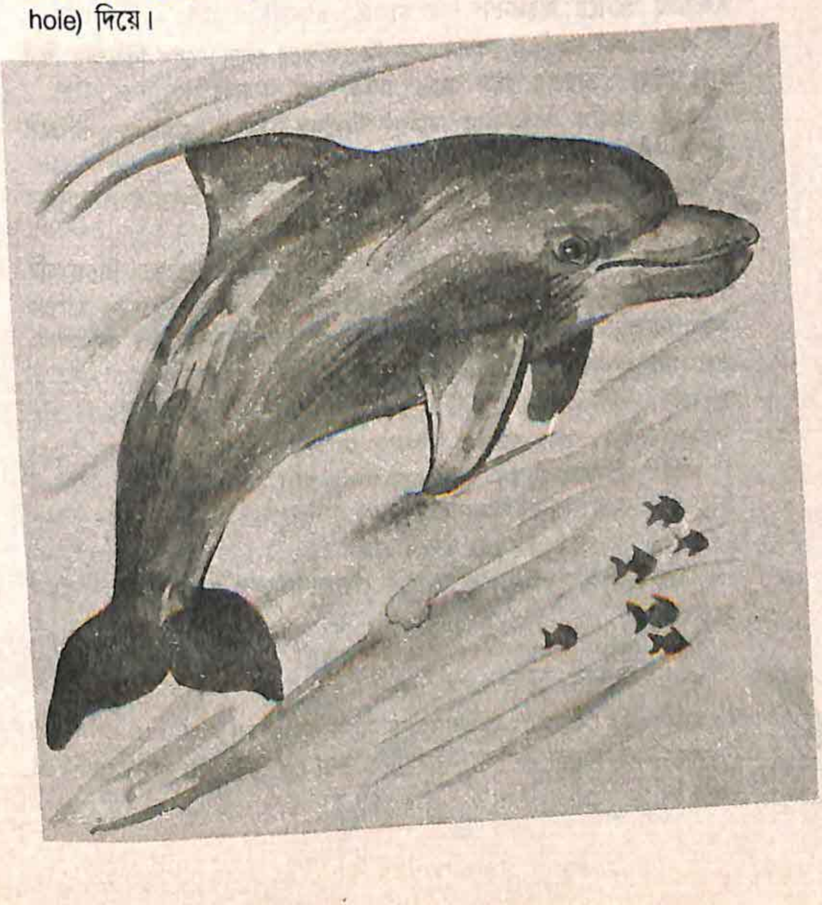
এই কথোপকথনের ক্লাস চলত একটানা বারো থেকে বিশ মিনিট। এক এক বারে তিন থেকে দশটি ধ্বনিগুচ্ছ। ওরা নিজেদের উচ্চারণ-ভঙ্গিতে প্রায় নির্ভুল উচ্চারণ করে যেত। গড়ে নব্বইটা নির্ভুল। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা — ধ্বনিগুচ্ছর সংখ্যার তারতম্যে ভ্রান্তির ইতরবিশেষ হয় না! মানে ধরুন সকাল বেলায় 'তিন-ধ্বনি' বিশিষ্ট গুচ্ছ নিয়ে দেখা গেল ডলফিনটা



শতকরা আট/দশটা ভুল করল। বিকালে 'দশ-ধ্বনি' বিশিষ্ট গুচ্ছ নিয়ে দেখা গেল ভুলের শতকরা হার সেই একই, আট থেকে দশ। মানুষের ক্ষেত্রে কখনই তা হয় না। মানুষ 'দশ-ধ্বনি-বিশিষ্ট' শব্দে অনেক বেশি ভুল করে জিহ্বার জড়তার জন্যই হোক অথবা অমনোযোগের জন্যই হোক।

লিলির মতে, মানসিক প্রতিযোগিতায় এই যে ডলফিন মানুষকে হারিয়ে দিচ্ছে তার কারণ মস্তিষ্কের শ্রুতি অংশে ওরা অনেক বেশি উন্নত। মানুষ ডলফিনের চেয়ে দশগুণ ভালো দেখতে পায়, তুলনায় ডলফিন মানুষের চেয়ে বিশ গুণ ভাল শুনতে পায়। তার হেতু, ওদের স্বাভাবিক বাতাবরণে আলোকের অভাব, তাই ওরা দৃষ্টি-শক্তিটাকে উন্নত করেনি; কিন্তু যেহেতু শব্দ জলের তলায় বেশি জোরে যায় তাই শ্রুতিকে উন্নত করেছে। তিম্যাদি জীবরা কয়েক শত মাইল দূর থেকে পরস্পরের শব্দ শুনতে পায়, বুঝতে পারে। যদিও জলের তলায় একশ মাইল যেতে শব্দের সময় লাগবে প্রায় পৌনে দু-ঘণ্টা!

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডলফিন-মস্তিষ্কে কান থেকে কর্টেক্স যোগাযোগকারী স্নায়ুর সংখ্যা যেখানে এক লক্ষের উপর, সেখানে মানুষের মাত্র পঞ্চাশ হাজার। ওরা অবশ্য মুখ দিয়ে শব্দ করে না, করে নাক (blow-hole) দিয়ে।



একবার একটা সুইমিংপুলে একজোড়া মাদী-মদ্দা ডলফিনের মাঝখানে একটা স্টিলের পার্টিশান তুলে দেওয়া হল। প্রথমে দুজনেই খুব অস্থির হয়ে ঘাই দিয়ে উঠতে থাকে। ক্রমশ ওরা নতুন পরিস্থিতিটা মেনে নিল।

এরপর শুরু হল ওদের কথোপকথন। চোখে না দেখতে পেলেও ওরা পরস্পরের কথা শুনতে পাচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখা গেল, ওরা আধঘণ্টা পর্যন্ত একটানা কথোপকথন চালাতো। 'একটানা' মানে একজন যখন বলত অপরজন শুনত। আমরা যেমন টেলিফোনে কথা বলি।

দু'পক্ষের কথাই টেপ-রেকর্ড করা হয়েছিল। তারপর ওদের একজনকে অনেকদূরের একটি চৌবাচ্চায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। দুজনেই সলিটারি প্রিজন-এ বন্দী। দু'জনেই মনমরা হয়ে গেল।

দীর্ঘ চার মাস পরে যান্ত্রিক পদ্ধতিকে স্ত্রী ডলফিনের প্রথম উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ পার্টিশানের ওপাশ থেকে মদ্দাটাকে একদিন হঠাৎ বাজিয়ে শোনানো হল। মদ্দাটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

টেপ-রেকর্ডের কণ্ঠস্বরটা থামতেই মদ্দাটা যে শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করল সেটা হুবহু প্রথমবারের বিরহের পর প্রথম উচ্চারিত তার নিজের কথা! সে থামতেই বিজ্ঞানীরা মাদী-ডলফিনের চার মাস আগে রেকর্ড করা দ্বিতীয় শব্দগুচ্ছ শুনিয়ে দিলেন।

এবার মদ্দা ডলফিন কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর যেন ছোট্ট একটা প্রশ্ন করল।

তার জবাবে বিজ্ঞানীরা মাদি-ডলফিনের তৃতীয় শব্দগুচ্ছ বাজিয়ে শোনালেন।

আশ্চর্য! মদ্দা ডলফিন ভ্রূক্ষেপও করল না। সে বুঝে নিয়েছে ও প্রান্তের শব্দটা তার সঙ্গিনীর নয়।

টেপ-রেকর্ডিং ব্যাপারটা তার বুদ্ধির অগম্য; কিন্তু ওদের শব্দ নিচয় যদি অর্থপূর্ণ হয়, কালিদাসের ভাষায় যদি 'বাগর্থ সম্পৃক্ত' হয় তবে যান্ত্রিক কথোপকথনের চালাকি কিছুক্ষণের মধ্যে সে বুঝে ফেলবেই। ধরা যাক, প্রথমবার কথাবার্তাটা এইজাতের হয়েছিল:

মাদি: তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?
মদ্দা: হ্যাঁ। শুধু চোখেই দেখতে পাচ্ছি না।
মাদি: দুই-আলো (দু'দিন) তোমাকে দেখি না।
মদ্দা: কবে আবার আমাদের এক হতে দেবে?
মাদি: হয়তো কোনদিন দেবে না।

তাহলে দ্বিতীয়বার চারমাস পরে কথোপকথনটা হয়তো এই পর্যায়ে হয়েছিল:

মাদি: তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ!
মদ্দা: আশ্চর্য! তুমি এসে গেছ!
মাদি: দুই 'আলো' (দুদিন) তোমাকে দেখি না!
মদ্দা: দুই আলো কি গো! পুরো চার ভরা কোটাল (চার মাস) পার হয়ে গেছে!



মাদি: হয়তো কোনদিন দেবে না।

কী ভাবে বুঝতে পেরেছিল কে জানে, কিন্তু বুঝতে যে পেরেছিল এ-বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সবাই একমত।

ওদের বুদ্ধিবৃত্তির আর একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিল — 'সিসি'; লিলির সংগ্রহশালার এক মাদি ডলফিন! ডুবন্ত মানুষকে ডলফিন কীভাবে বাঁচায় তার একটা ডকুমেন্টারি তোলা হচ্ছে। স্থির হল লিলি যখন ডলফিনদের নিয়ে খেলা করবেন তখন ওঁর এক সহকারী, জর্জি, সুইমিং পুলের ওপ্রান্তে হঠাৎ পা-ফসকে পড়ে যাবে, আর যেন ডুবে যাচ্ছে এ-ভাবে অভিনয় করবে।

ক্যামেরা সাজিয়ে, লাইট জ্বেলে ডিরেক্টর সঙ্কেত জানালেন: স্টার্ট সাউন্ড! এ্যাক্‌শান!

ওঁর সহকারী জর্জি হঠাৎ জলে উল্টে পড়ল। ডুবে যাবার অভিনয় করে হাবুডুবু খেতে থাকে। তৎক্ষণাৎ সিসি ছুটে গেল সেদিকে। নাক দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে জর্জিকে পৌঁছে দিল ডাঙায়!

সব কিছু শেষ হবার পর ক্যামেরাম্যান বললে, কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়েছে স্যার! ক্যামেরা-লেন্সের ঢাক্‌নিটাই খুলতে ভুলে গেছি!

উপায় কি? শট্‌টা দ্বিতীয়বার তোলার জন্য সব আয়োজন হল। আবার ডিরেক্টর হাঁক পাড়লেন: স্টার্ট সাউন্ড! এ্যাক্‌শান!

জর্জি যথারীতি জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। এবারও নক্ষত্রবেগে সাঁতরে এল সিসি! কিন্তু ঐ পর্যন্তই! প্রথমবারের মতো জর্জিকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না আদৌ! দুই হাতডানায়'জর্জির দু'গালে দুটি থাপ্পড় মেরে নিশ্চিন্তমনে ফিরে গেল!

সিসি বুঝে নিয়েছে জর্জি সাঁতার জানে। ন্যাকামি করছে! 'ডলফিন'-বিষয়ে অনেকগুলি বই পড়েছি! তারমধ্যে পেয়েছি এই একমাত্র একটি উদাহরণ যেখানে ডলফিন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় মানুষকে থাপ্পড় মারছে!

বিশিষ্ট তিম্যাদি বিশারদ জোয়ান ম্যাকিনটায়ারের মতে... "আধুনিক মানুষের মনোজগতের চেয়ে ডলফিনের মনের প্রাঙ্গণ আরও মুক্ত, আরও বাধাবন্ধনহীন" (The mind of the dolphin is a more free playground than the modern human mind.)

লিলি আরও এককাঠি উপরে উঠেছেন: "আমার বিশ্বাস, তিমি ও ডলফিনরা অধ্যাত্ম চিন্তার পথে সহজেই এগিয়ে যেতে পারে এবং অনায়াসে ধ্যানস্থ হয়ে যেতে পারে" (Whales and dolphin quite naturally go in the direction we call spiritual , in that they get into meditative status quite simply and easily.)



না-মানুষ দরদীদের দরবারে

জীবজন্তু পশুপাখির বিষয়ে আমাদের কতটা আগ্রহ তার একটা তির্যক পরিমাপ করা যেতে পারে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভার থেকে। এখানে কিছু প্রশ্ন রাখা গেল, প্রথমে ইংরেজিতে, পরে বাঙলায়। ইংরেজি শব্দের উত্তরগুলি160পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে। বাঙলা শব্দগুলি আপনাদের লিখতে হবে। তাহলেই অনুভব করবেন — না-মানুষ বিষয়ে আমাদের অনীহা কী নিদারুণ! সলজ্জে স্বীকার করতেই হবে, এ বিষয়ে আমরা ইংরেজদের চেয়ে কম উৎসাহী। ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাড়া আমাদের কৌতূহল নেই। 'ষাঁড়'-এর স্ত্রী লিঙ্গ 'গরু' ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে 'স্ত্রীয়াম' ঈপ্'-এর বাঁধা ফর্মূলা। চুন্নুমুন্নু প্রসঙ্গেও গরুর ক্ষেত্রে 'এঁড়ে-বক্না' — বাদবাকিতে সবই 'হরিণের বাচ্চা', 'বেড়াল-ছানা' — নতুন শব্দের প্রয়োজন হয়নি। ধ্বনির ক্ষেত্রেও তাই — সংস্কৃতের কল্যাণে 'বৃংহিত, হ্রেষা, হাম্বা' ইত্যাদি শব্দ ছাপিয়ে তৎভব বা তৎসম শব্দ মুষ্টিমেয়। কীট-পতঙ্গ বিষয়ে আমাদের অনীহা আরও করুণ! ইংরাজীতে Dragon fly, Damsel fly, Bush Cricket, Field Cricket, Kariatid ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্প নিয়ে উপস্থিত হয় ; বাঙলায় 'ফড়িং' শব্দে সব কিছুকেই বোঝানোর চেষ্টা। ফড়িং-এর প্রয়োজন যে নেই — নেহাৎ মা-কালীকে 'ধরে ধরে খা' আবেদন জানানোর প্রয়োজন ছাড়া!

A) বিপরীত-লিঙ্গের জীবটির কী নাম? (যেমন Lion = Lioness/সিংহ = সিংহী)

(1) Hen ... মুরগি ...
(2) Goose ... রাজহাঁস ...
(3) Doe ... হরিণী ...
(4) Duck ... হাঁস ...
(5) Boar ... শুয়োর ...
(6) Tiger ... বাঘ ...
(7) Ram ... ভেড়া ...
(8) Fox ... শেয়াল ...

(B) এবার চুনুমুনু বাচ্চাদের প্রসঙ্গ (যেমন Dog = puppy/গরু = এঁড়ে/বক্‌না)

(9) Bear	...	ভালুক	...	(10) Sheep	...	ভেড়া	...
(11) Duck	...	হাঁস	...	(12) Frog	...	ব্যাঙ	...
(13) Swan	...	রাজহাঁস	...	(14) Hen	...	মুরগি	...
(15) Horse	...	ঘোড়া	...	(16) Mare	...	ঘুড়ী	...
(17) Deer	...	হরিণ	...	(18) Elephant	...	হাতি	...
(19) Cat	...	বেড়াল	...	(20) Bull	...	ষাঁড়	...

C) এদের 'ডাক'কে কী-নামে চিহ্নিত করা যায় ? (যেমন **Dogs 'bark'**/অশ্বের হ্রেষা)

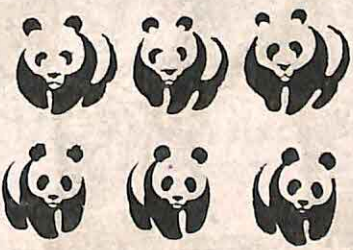
(21) Lion	...	সিংহ	...	(22) Pigs	...	শুয়োর	...
(23) Sheep	...	ভেড়া	...	(24) Cow	...	গরু	...
(25) Ducks	...	হাঁস	...	(26) Wolves	...	নেকড়ে	...
(27) Crows	...	কাক	...	(28) Snakes	...	সাপ	...
(29) Donkeys	...	গাধা	...	(30) Geese	...	রাজহাঁস	...
(31) Wild Geese	...	বন্যহংস	...	(32) Hens	...	মুরগি	...
(33) Cocks	...	মোরগ	...	(34) Frogs	...	ব্যাঙ	...
(35) Doves	...	ঘুঘু	...	(36) Elephants	...	হাতি	...

D) যূথবদ্ধ হয়ে থাকলে সেই 'দল'কে কী বলে ? (যেমন **A 'pack' of hounds** মৌমাছি — 'ঝাঁক')

(37) A ... of Sheep/ভেড়ার ...
(38) A ... of Cattle/গরুর ...
(39) A ... of lions/সিংহের ...
(40) A ... of Wolves/নেকড়ের ...
(41) A ... of snipe/কাদাখোঁচার ....
(42) A ... of fish/মাছের ...
(43) A ... of geese/রাজহাঁসের ...
(44) A ... of bears/ভালুকের ...

E) মনুষ্য-নির্মিত আবাসস্থলের কী নাম ?
(যেমন **A 'stable' for horses**/গরুর 'গোয়াল')

(45) A ... of dogs/কুকুরের ...
(46) A ... of chicken/মুরগিছানার ...
(47) A ... of sheeps/ভেড়ার ...
(48) A ... of Rabbit/খরগোশের ...
(49) a ... of pigeon/পায়রার ...
(50) A ... of pigs/শুয়োরের ...

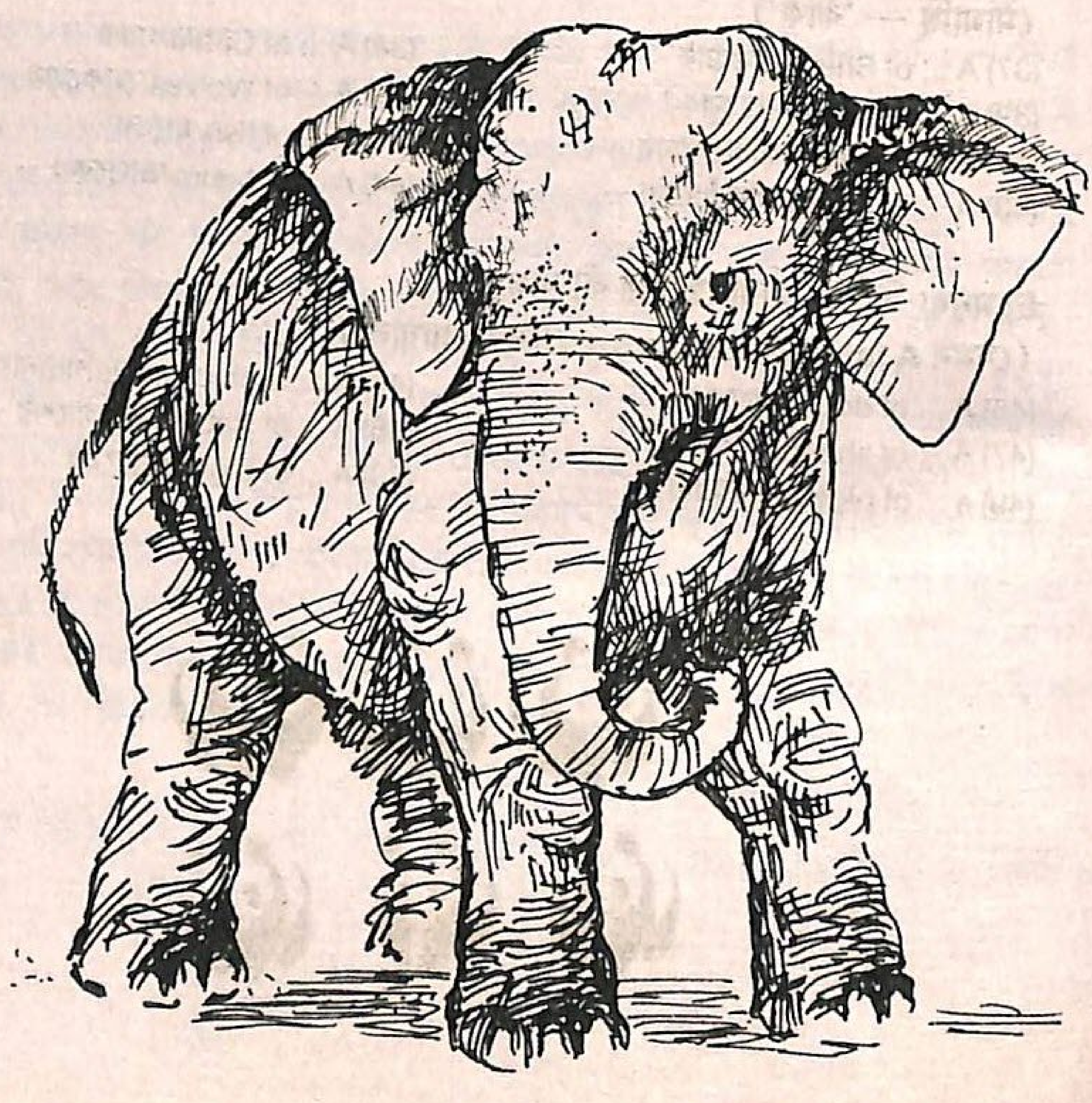


মা-শুয়ে

'হাতি' বিষয়ে এর আগে লিখেছি 'গজমুক্তা' (প্রকাশকাল : 1981)। পরেও লিখেছি 'হাতি আর হাতি' (1988)। শেষেরটা একেবারে বাচ্চাদের জন্যে — যুক্তাক্ষরবর্জিত বাঙলায়। এ-কাহিনীর উৎস জেমস্ উইলিয়াম।

আমি তখন বর্মাদেশে এক সেগুনকাঠের ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। মা'শুয়ে আমাদের পোষা হাতী। ভারী বাধ্য ছিল সে আমার। ক্রমে মা'শুয়ের একটি বাচ্চা হল।

বাচ্চাটার কী নাম রাখা হল এতদিন পরে তা আমার মনে নেই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, বাচ্চা হবার পরেও মাহুত মায়ের নামটা বদলালো না। ওঃ আপনাদের বলা হয়নি — বর্মী ভাষায় মা'শুয়ে অর্থ 'মিস্ গোল্ড' বা কুমারী-সোনামণি! মিস্ মিসেস্ হলেন, কিন্তু নামটা রয়েই গেল। তা সে যাই



হোক বাচ্চাটা যখন মাস-তিনেকের তখন আমাকে একবার ইমেথিন থেকে মান্দালয়ের দিকে একটা কাঠগুদামে যেতে হল। মাইল পনের দূরের ঘাঁটি। পাহাড়ে রাস্তা, পাকদণ্ডি পথ, টংদুইন নদীর অববাহিকা ধরে খাড়া উত্তর মুখো। ভোর ভোর রওনা দিলে ওখানে পৌঁছে লাঞ্চ খাওয়া যাবে। তবে সময়টা বর্ষাকাল, গত রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে — পথ কেমন আছে কে জানে?

যাত্রার সময় দেখি বাচ্চাটা এসে জুটেছে। কিছুতেই মাকে ছাড়বে না। ভারি বায়না ওর। ভাবলাম চলুক, ওটাও চলুক। তিন মাসের হাতির বাচ্চা অনায়াসে দিনে পনের মাইল পাড়ি দিতে পারবে।

আমাদের পথ নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, একদিকে ঘন জঙ্গল, অন্যদিকে কলনাদিনী টংদুইন। বাচ্চাটার কী ফূর্তি! কখনো আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে জঙ্গলে লুকায়। একবার বাঁকের মুখে তাকে দেখতে না পেয়ে সোনামণি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এ জঙ্গলে বাঘ আছে। বাধ্য হয়ে উল্টো পথে বেশ কিছুটা ফিরে আসতে হল। দেখি, বাচ্চাটা খাড়া নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খরস্রোতা টংদুইনকে দেখছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখি, গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার জন্যে টংদুইনের জল বাড়ছে। প্রতি মিনিটে তার রূপ বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রচণ্ড বন্যার তাণ্ডব এসে পড়ল বলে। হঠাৎ নদীর ধারের একটা চাপড়া ভেঙে গেল, আর সশব্দে বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল নদীগর্ভে। তীব্র বৃংহিত-এ সোনামণি সারা অরণ্য কাঁপিয়ে তুলল। আমি তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ি ওর পিঠ থেকে। সোনামণি দৌড়ে গেল নদীর কিনারায়। বিশ হাত দূরে বাচ্চাটার মাথা জেগে উঠল একবার, পরক্ষণেই তা ডুবে গেল। অকুতোভয়ে সেই আট ফুট উঁচু পাড় থেকে তার বিশাল দেহ নিয়ে ঝাঁপ দিল সোনামণি। মা আর বাচ্চা দুজনেই ভেসে গেল।

আমিও ছুটতে থাকি নদীর কিনারা বরাবর।

দেখলাম, সাঁতরে গিয়ে সোনামণি তার বাচ্চাকে ধরেছে। শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তিলতিল করে বিপরীত দিকে তাকে টেনে আনছে। অবশেষে এসে পৌঁছালো কিনারায়। কিন্তু নদীর পাড় সেখানে একেবারে খাড়া! পা রাখার জায়গা নেই। উঠবে কেমন করে? বাচ্চাটার সেখানে ডুব জল, ওর মা বোধহয় মাটিতে পা পাচ্ছে। নিজের প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে সে ঠেসে ধরল বাচ্চাটাকে নদী-কিনারের খাড়া-পাহাড়ে। মিনিট পনের এভাবেই কাটল। ইতিমধ্যে নদীতে ঢল নেমেছে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে জলের গভীরতা বাড়ছে, বাড়ছে স্রোতের টান। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে শুঁড় তুলে মা'শুয়ে প্রচণ্ড একটা গর্জন করল। জানি না, সে নদীকেই অভিশাপ দিল — না, ঈশ্বরকে! একবার সে অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকালো! সে মর্মভেদী দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার ক্ষমতা কতটুকু? ঠিক তখন টংদুইন নিষ্ঠুর রাক্ষসের মতো ওর শুঁড়ের বন্ধন থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিল।

এক লহমায় বিশহাত দূরে ছিটকে পড়ল সেই হস্তিশিশু। কিন্তু মা'শুয়ে হার মানবে না, সেও দ্বিতীয়বার ঝাঁপ খেয়ে পড়ল গভীর জলে। দুজনেই



ভেসে গেল পঞ্চাশ-ষাট হাত! কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করল সোনামণি — আবার নাগাল পেল তার সন্তানের। আবার সাঁতার কেটে ঠেলতে ঠেলতে সে এসে পৌঁছাল নদী-কিনারে। গজকুম্ভ দিয়ে আবার ঠেসে ধরল বাচ্চাটাকে খাড়া পাহাড়ের গায়ে। তার পরেই একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সোনামণি তার শুঁড়টা চালিয়ে দিল বাচ্চাটার তলপেটের নিচে। চ্যাম্পিয়ার ওয়েট লিফ্টার অলিম্পিকের আসরে যেভাবে বারবেলটাকে সর্বশক্তি দিয়ে মাথার উপরে তোলে, তেমনি করে শুঁড় দিয়ে সে তিন-মাসের একটা হস্তিশাবককে তুলতে থাকে জলের উপর। পুরো একমিনিট লাগলো তার। জানি না, তখন সে মাটিয়ে দাঁড়িয়ে অথবা সাঁতার কাটছে! কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করল সোনামণি। জল থেকে তুলে বাচ্চাটাকে বসিয়ে দিল একটা পাথরের খাঁজে। জলতল থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উপরে। আতঙ্কতাড়িত বাচ্চাটা যেই লাফ দিয়ে পাথরে নামল অমনি তার প্রতিঘাতে পদস্খলন হল সোনামণির। টংদুইন যেন শিকার ফসকে যাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে। ছা-এর বদলে মা! গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতের মতো ভেসে গেল সোনামণি। নদী তখন ভয়ঙ্করী। চকিতে আমার মনে পড়ে গেল ওখান থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে এক জলপ্রপাত আছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে নদী সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সোনামণির অনিবার্য মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি হায়-হায় করে উঠি। ওর বাচ্চাটা এসব কিছু জানে না — আতঙ্কতাড়িত দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় দশ মিনিট পরে দেখি — না, সোনামণি হার মানেনি। জল থেকে সে উঠে পড়েছে। প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে সে ভীম বেগে ছুটে আসছে। কিন্তু ভুল করে সে উঠে পড়েছে নদীর ওপারে। হয়তো ভুল করে নয়, বাধ্য হয়ে। কারণ এদিকে খাড়াপাড়, ওদিকে তা নয়। ওপার থেকে বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়ে সে আকাশবিদীর্ণ করা আনন্দের উল্লাসধ্বনি করল। কিন্তু মাতাপুত্রে মিলন তখন আর সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যে নদী আরও ফুট পাঁচেক বেড়েছে — অর্থাৎ বাচ্চাটার পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে চলেছে জলস্রোত। এখন ওর মায়ের মতো দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেও টংদুইন অনতিক্রম্য!

নদীর ওপারে মা, এপারে আমি, আর মাঝখানে একটা ডুবো-দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চাটা। সারাটা দিন এইভাবেই কাটল। জল কমার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সোনামণি মাঝে মাঝে ওপার থেকে গর্জন করে উঠছে, বাচ্চাটা ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না। কান নাড়াচ্ছে শুধু। সাড়া দিচ্ছে টংদুইন তার খলখল হাস্যরোলে।



ঘনিয়ে এল রাত। বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলাম একটা গাছের উপর। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে কানে আসছিল মায়ের গর্জন আর একটানা টংদুইনের ফেনিল আক্রোশ! নীরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শেষে ক্লান্ত হয়ে সোনামণি তার গর্জন বন্ধ করল। আমি নেমে এলাম গাছ থেকে। টর্চ জ্বেলে দেখি — না, দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নদীর রূপ অপরিবর্তিত। আমার টর্চের আলোয় বাচ্চাটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল।

চঞ্চল হয়ে উঠল। ভয় হল — শেষে না জলে লাফিয়ে পড়ে। নিবিয়ে দিলাম টর্চ।

ভেবে দেখলাম, আমার কিছুই করণীয় নেই। খামকা রাত্রে ওদের মাঝে মাঝে বিরক্ত করে কী লাভ? উদাসীন মহানাট্যকার এই নাটকটা ফেঁদেছেন তাঁর অমোঘ ইচ্ছাটাই জয়ী হবে। ফিরে গেলাম গাছের উপর। কাল সকালে এসে দেখব — ওদের ভাগ্যে কী ঘটল!

পরদিন ভোর না হতেই ছুটে এলাম নদীর কিনারায়। তার পূর্বেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। নদীতীর নিস্তব্ধ। ওরা কেউ নেই। না মা, না তার সন্তান। আর আশ্চর্য নিরাসক্ত নিষ্ঠুর ঐ টুংদুইন। এ নাটকে তার যে ভূমিকাটুকু ছিল সেটি শেষ করে এখন দাঁত বার করে হাসছে। জলের গভীরতা এখন একেবারে কমে গেছে। পাথরের উপর সূর্যালোক চিক্‌চিক্ করছে। গতকাল যে পাথরটার উপর বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ছিল সেই পাথরটা একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাছে গাছে প্রভাতী পাখি ডাকছে। বৃষ্টি ধোওয়া গাছের পাতায় পাতায় রোদের ছোপ-ছোপ! হয়তো আধমাইল দূরে জলপ্রপাতের কিনারে মা-ছেলের মৃতদেহ ঘিরে এতক্ষণে নেমেছে শকুনের দল!

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম নদীর কিনারে। কতক্ষণ তা খেয়াল নেই। তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি অন্তরে। এমনভাবে শেষ হল টংদুইন আর সোনামণির দ্বৈরথ সমর।

হঠাৎ চমকে উঠি প্রচণ্ড এক বৃংহিতধ্বনিতে! পিছন ফিরে দেখি গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে মা'শুয়ে আর কোলঘেঁষে ন্যাওটা বাচ্চাটা।

আকাশে শুঁড় তুলে সোনামণি যেন আমাকে হাঁকাড় দিচ্ছে: আসুন স্যার, এবার রওনা দেওয়া যাক! আমরা মায়ে-পোয়ে বহাল-তবিয়ৎ!



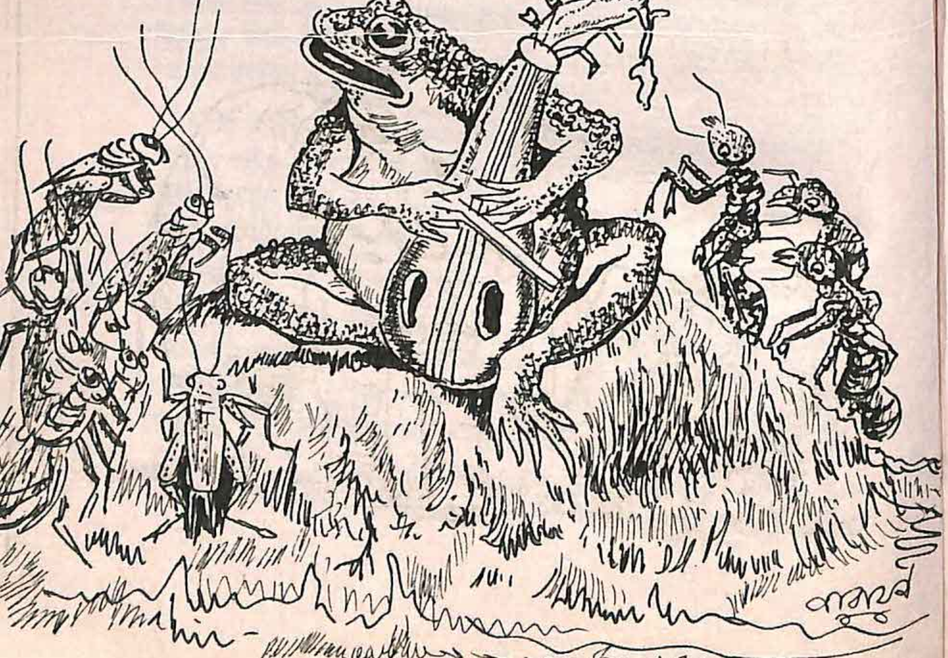
একটি বিজ্ঞানভিত্তিক রূপকথা

আমার কাহিনীর নায়ক একটি ব্যাঙ! যে-সে ব্যাঙ নয়, বিশেষ প্রজাতির ব্যাঙ। কাহিনীটা শিরোনামার স্বীকারোক্তি মোতাবেক : 'বিজ্ঞানভিত্তিক'। ফলে প্রাথমিক data দাখিল করতেই হবেঃ ক্লাস — অ্যাম্ফিবিয়া; বর্গ — ANURA পরিবার — DENDROBATIDAE; গণ-প্রজাতি — Colostethus punctatus, এদের কতকগুলি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য আছে··· কিন্তু না! এখনি তা কবুল করতে পারছি না। — দেখুন, 'বিজ্ঞানভিত্তিক' হলেও এটি 'রূপকথা'। অর্থাৎ উপসংহারটা আপনাদের জানা — সেই চিরাচরিত 'And they lived happily ever after-wards!' ঐ প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যটুকুই আমার তুরুপের টেক্কা! কাহিনীর সাস্‌পেন্স! আপাতত ওটা আমার আস্তিনের তলাতেই থাক না?

প্রথমে একটা চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতের ঝিলিক; আর তার পরেই কড়-কড়-কড়াৎ!

ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। যাবেই! এমন বজ্রবিদ্যুতের ধাক্কায় স্বয়ং কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে যায়।

মাথাটা তুলতে চেষ্টা করল। পারল না। ভীষণ ভারী লাগছে মাথাটা। টানা কয়েক মাস ঘুমিয়েছে তো? একটানা নিরম্বু উপবাস! হাত-পা অবশ,



নাড়তে পারা যাচ্ছে না। মানুষ হলে এ সময় হয়তো প্রথামাফিক প্রশ্ন করত, 'আমি কোথায়?' তা সে করল না। ও তো মানুষ নয়, না-মানুষ।

তাছাড়া শুধাবে কাকে? ওর সেই নিঃসঙ্গ গুহায় সে যে একেবারে একা। স্বেচ্ছাবন্দীর জীবন। টুপ-টাপ্! — সেই পরিচিত শব্দ! বিলম্বিত-লয়ের মিঠে আওয়াজ!

খুশিয়াল হয়ে ওঠে এতক্ষণে। পুকুরের জলে প্রথম ধারাপাতের শব্দটার দারুণ মাদকতা আছে! একটা আকর্ষণ! জীবনের আহ্বান, প্রকৃতি-নাটকে অংশীদার হবার হাতছানি!

আর শুয়ে থাকা চলে না। ওকে এবার উঠতে হবে। নাক দিয়ে সে রুদ্ধ গুহার ছাদের দিকে একটা ঠেলা দিল। ভিজে-মাটির একটা আল্‌গা চাপড়া খসে পড়ে। এক ঝলক্ আলো! আহ্! কী আনন্দ! কদ্দিন পরে আলোর মুখ দেখল। প্রাণপণ বলে অবশ হাত-পাকে টেনে বার হয়ে এল গর্ত থেকে। মুহূর্তে ভেসে ওঠে জলতলে।

হ্যাঁ, বৃষ্টিই নেমেছে। শীতকালটা তাহলে আর একবার পাড়ি দেওয়া গেল। বসন্ত এল নতুন করে। গাছ-গাছালি, পাখ্‌পাখালি পাড়ায় এবার শুরু হবে সাজো-সাজো রব। জীবনকে উপভোগ কর। যৌবনকে উপভোগ কর। যে আনন্দ-অমৃত পান করলে অঞ্জলিভরে, তার মূল্য মিটিয়ে দাও এবার পরবর্তী প্রজন্মের কুশীলবদের আমন্ত্রণ জানিয়ে। তোমরা আসবে, তোমরা যাবে, কিন্তু প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে চিরন্তন নাটকের অভিনয় যে অব্যাহত রাখতে হবে!

প্রাক্-বসন্তের প্রথম ধারাপাত! আকাশ ছেয়ে কালো-কালো মেঘের জটলা। কোন সুদূর সমুদ্র থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে ওরা, যেন ঝুঁকে পড়ে বলছে — কী? খবর সব ভাল তো? অনেক ঘুমিয়েছ, এবার গা-তোল! উপভোগ কর যৌবনকে।

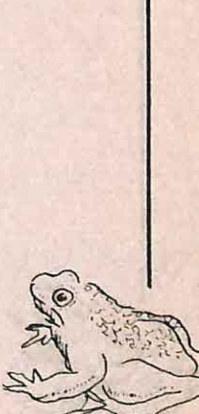
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক আর গুরুগুরু ডাক। নজর হল, ওর মতো অনেক-অনেক ভেকের ঘুম ভেঙে গেছে। টুপ্‌টাপ একে একে ভেসে উঠছে জলতলে।

দারুণ খিদে পেয়েছে ওর। পাবে না? টানা তিনমাস একটি পোকাও খায়নি! প্রথম ধারাপাতের আনন্দে অনেক জলপোকাও নাচন জুড়ে দিয়েছে। মশার শুককীটরা তড়িঘড়ি ওঠা-নামা করছে শ্বাস নিতে। সবার আগে ও তাই বেশ কিছু পোকা খেয়ে নিল। গায়ে তাগদ পেল এতক্ষণে!

ওদিকে ততক্ষণে টুপ্-টাপ হয়েছে রিম্‌ঝিম্! জমাটি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে!

হঠাৎ কানে গেল শব্দটাঃ গ্যাঁ—গ, গ্যাঁ—গ!

ব্যাঙ ডাকছে। বেঙীদের ডাকছে। পুকুরের এ প্রান্তে, ও প্রান্তে। শত শত। হাজার হাজার! দারুণ আনন্দ হল ওর! জীবন কী সুন্দর। বেঁচে থাকার কী আনন্দ!



একটা ওড়কল্‌মি জাতীয় কি একটা লতার জল সইসই পাতার উপর উঠে বসল। সারা গায়ে বৃষ্টির ছাট। মনের আনন্দে গলা ফুলিয়ে···

কিন্তু না! গাইল না। মাঝ পথেই থমকে গেল। ওর ফুলে ওঠা গলা ধীরে ধীরে চুপসে গেল। ওর মনে পড়ে গেল। স—ব কথা। যেন জাতিস্মর। এমন বর্ষা তার জীবনে এর আগেও অনেক অনেকবার এসেছে। জৈবিক প্রেরণায়, জেনেটিক বার্তার নির্দেশে প্রাণের আনন্দে সে নাগাড়ে গান গেয়ে গেছে প্রতিবার — ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন।

সে আসেনি।

নিষ্ফলা ওর মণ্ডূকারাব। কেউ এসে বলেনি, আর কত গাইবে গো দু-চোখ বুজে? চেয়ে দেখ, আমি এসে গেছি।

না। আমার কাহিনীর নায়কের জীবনে নায়িকা আজও অনাগত। এত বছর পরেও। কত বছর? তা ধর গিয়ে ওর হাতে যতগুলো আঙুল তার সমান। এ বয়সে সবাই বাপ হয়ে যায়। ও হয়নি, সঙ্গিনী জোটেনি বলেই।

— গ্যাঁ-গ, গ্যাঁ-গ। শতশত সবুজ ব্যাঙ ডাকছে। পুকুরের এ প্রান্তে ও প্রান্তে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। কেন ও এমন একা? এ পুকুরে শুধুই পান্নারঙের ব্যাঙের কান্না। হঠাৎ নজর হল — জলের ভিতর থেকে এক জোড়া চোখ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর বুকের মধ্যেও গুরগুর করে মেঘ ডাকল। বললে, কী দেখছ গো অমন ডাগর চোখ মেলে? পদ্ম পাতায় উঠে এস। দেখছ না — সাড়া আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে?

মেয়েটি একটু চমকে ওঠে। লজ্জাও পায়। জল থেকে উঠে আসে কচু পাতায়। মুখ নিচু করে বলে, ও আপনি! আমি ভেবেছিলাম...

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। মেয়েটির পরনে সবুজ শাড়ি। সে ভিন্ন 'গণ'-এর, ভিন্ন 'প্রজাতি'র। তবু ভদ্রতা করে বললে, কী? কী ভেবেছিলে গো তুমি?

— সে কিছু না। যা হোক, কখন শীত-ঘুম ভাঙল আপনার?

মনে হল মেয়েটি ওকে চেনে। তাই ওর কণ্ঠে অমন যেন পরিচিত সুর। ও কিন্তু মেয়েটিকে চিনতে পারছে না। বেশ স্বাস্থ্যবতী, পুরন্ত গড়ন। বললে, তুমি আমাকে চেন?

— ওমা, কেন চিনব না? গোটা পুকুরের কোন্ বেঙী আপনাকে না চেনে? এমন লাল-হলুদ, নীল-কমলা রঙের বাহার এ তল্লাটে আর কোন মরদ-ব্যাঙের আছে? আপনি তো রদ্দুরদা।

— রদ্দুর নয়, আমার নাম দর্দুর। কিন্তু আমি তো ঠিক তোমাকে...

মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

'[খিলখিলিয়ে' ক্রিয়াপদটা চলবে তো? বেঙীর গলায় 'খিল্‌খিল্' হাসি! বেঙীকে নায়িকা করে এর আগে কোন গল্প লিখিনি তো... কী বললে? রূপকথার গল্পে এসব চলে? তবে তো কথাই নেই]



হাসি থামিয়ে মেয়েটি বলল, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি 'বেঙীমণি'!

দর্দুর অবাক হয়ে যায়। বলে, ও মা! তুমি আমাদের সেই বেঙীমণি! কী ডিগ্‌ডিগে ছিলে গো তুমি! এখন তো দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছ!

বেঙীমণি লজ্জা পেল। দর্দুর বলে, তা খাবে কিছু? পোকা ধরে দেব?

বেঙী বলে, আপনি যেন কী! আমি কী খাবার লোভে এসেছি? শীত-ঘুম শেষ হতেই তো এক-পেট জলপোকা খেলুম।

দর্দুর একটু ঘনিয়ে এসে বললে, তবে কিসের লোভে এসেছ গো বেঙি?

মেয়েটি লজ্জায় কচুপাতায় যেন মিশে গেল। জড়সড় হয়ে বলে, না··· মানে, আমি যে আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি, তাই···

দর্দুর সামলে নিল নিজেকে। বেঙী ভিন্ন প্রজাতির। সবুজ শাড়িপরা মেয়ে। আর ও নিজে হচ্ছে রামধনু-বর্ণা — হলুদ, কমলা, লাল, নীল! পুকুরের জলে প্রতিবিম্ব ছাড়া এমন অদ্ভুত বহুবর্ণা ব্যাঙ সে সারাজীবনে দেখেনি। বছরে বছরে গলা ফাটিয়ে ডেকেছে, কিন্তু···

— এবার আমি তাহলে যাই রদ্দুরদা?

দর্দুর ওর সম্বোধনটা সংশোধন করল না এবার। করল ভাষাটা। বললে, 'যাই' বলতে নেই বেঙি, বল — 'আসি'।

এতক্ষণে পুকুরের চারপাশে সবুজ ব্যাঙেরা রীতিমতো কনসার্ট জুড়ে দিয়েছে। বেঙীমণি আর সেই ছোট্ট কিশোরীটি নেই, তাকে এবার স্বজাতীয়ের ডাকে সাড়া দিতে হবে। সে চঞ্চলা হয়ে উঠেছে, তবু সে এক কথায় চলে যেতে পারলে না। এই কন্দর্পকান্তি নিঃসঙ্গ রাজপুত্রের জন্য তার মনে শুধু কৌতূহলই নয়, কেমন যেন একটা বেদনাবোধ ছিল। একটা আকর্ষণও — হোক্ সে ভিন্ন প্রজাতির। বললে, আপনার কোন বান্ধবী নেই, না রদ্দুরদা? আপনার জাতির কোন বেঙীকে তো কখনো দেখিনি এ পুকুরে।

দর্দুর জবাব দিল না। ম্লান হাসল শুধু।

বেঙী প্রশ্ন করে, কত বয়স হল আপনার?

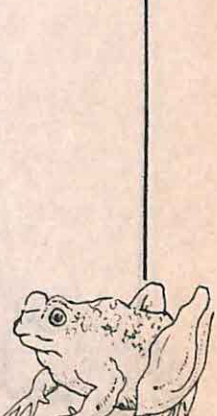
দর্দুর তার একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, এ হাতে যতগুলো আঙুল।

বেঙীমণি তার ভিজে ভিজে হাতে স্পর্শ করে ওর আঙুলগুলো গুনতে থাকে, এক···দুই — এক···দুই···

ওর সেই নরম আঙুলের ছোঁওয়ায় দর্দুরের বুকের ভিতর আবার মেঘগর্জন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আত্মবিস্মৃত হল না সে। বললে, দুইয়ের পর তিন। বল, এক··· দুই··· তিন···

বেঙীমণি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ও কঠিন অঙ্ক তার মাথায় ঢোকে না।

দর্দুর হাতটা টেনে নেয়। সে জানে, এই সবুজ-ব্যাঙেরা বেশ নির্বোধ! কিন্তু ওরা কি দুই-এর বেশি গুন্‌তেও পারে না? বললে, এবার এস তুমি। ঐ শোন, ওরা তোমায় ডাকছে।



— আপনি তাহলে এখন কী করবেন?

— 'কী করব' বলতে পারছি না, 'কী করব না' তা বলতে পারি।

এবারও বেঙীমণি তার ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে।

দর্দুর বুঝতে পারে, এই সবুজ-ব্যাঙেরা ভাষার প্যাঁচও বোঝে না। নিতান্ত সরল ওরা। বলে, বলছি, আর যাই করি গলা ফুলিয়ে ডাকব না।

— কেন?

আঃ! কী গবেট মেয়েটা! তবু রাগ চেপে বললে, এ পুকুরে আমার জাতির বেঙী নেই বলে।

এবার বুঝল। বললে, আপনাকে একটা পরামর্শ দেব, রদ্দুরদা?

দর্দুর ম্লান হেসে বলে, সেটাই বাকি আছে! তোমার মতো বুদ্ধিমতীর পরামর্শ নেওয়া!

এমন তির্যক বাক্‌প্রয়োগও বেঙীমণির মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। সে সরল মনে বললে, আপনি সন্ন্যাসীদাদুর ডেরায় যান একবার। তিনি আপনাকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

— সন্ন্যাসীদাদু কে? কোথায় থাকেন তিনি?

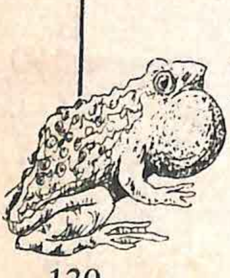
বেঙীমণি সব কথা বুঝিয়ে বলে। সন্ন্যাসীদাদু এ পুকুরের সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যাঙ। সন্ন্যাসী না-মানুষ। থাকেন নিঃসঙ্গ, একা। মানুষ-সন্ন্যাসী যেমন সাধনার শেষ পর্যায়ে কৌপীন পর্যন্ত ত্যাগ করে একান্তচারী হয়ে পড়েন উনিও তেমনি ভেকধর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে 'মণ্ডূকারাব' পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। বর্ষাকালে তিনি ডাকেন না আদৌ।

দর্দুর বোকা-সোকা সবুজ ব্যাঙ নয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার।

নিজের কী জাত তা সে জানে না, শুধু এটুকু জানে যে, সে স্বতন্ত্র, সে পৃথক, সে অনন্য। তার মনে হল, ঐ অজ্ঞাত সন্ন্যাসীদাদু 'মণ্ডূকারাব' ত্যাগ করেছেন দুটি হেতুর যে কোন একটির জন্য। হয় অতিবৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রজনন-ক্ষমতা হারিয়েছেন, অথবা দর্দুরের মতো তিনিও বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর প্রজাতির মাদী ব্যাঙ-এ পুকুরে নেই। দর্দুরের কৌতূহল হল। দাদু প্রবীণ, বিচক্ষণ, দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছেন — বেঙীমণি তাই বলছে — হয়তো তিনি বলতে পারবেন দর্দুর কোন প্রজাতির। স্বজাতের বেঙী সে কোথায় পেতে পারে। জানতে চায়, কোথায় থাকেন ঐ সন্ন্যাসীদাদু?

— পুকুরের যেদিকের জলে আকাশের আগুনগোলাটা রোজ ডুবে যায়, সেদিকে একটা কাশঝোপের আড়ালে তাঁর গর্ত। যাকে শুধোবেন সেই পথ বাৎলে দেবে।

নির্দেশটা দর্দুর বুঝতে পারে। সে জানে, আকাশের ঐ আগুনগোলাটা সন্ধ্যাবেলার পুকুরের জলে আদৌ ডোবে না। সে অস্ত যায় অনেক অনেক দূরে। দিগন্তের ওপারে। এসব পাতি সবুজ-ব্যাঙেরা সেসব কথা জানে না। বোঝে না। দর্দুর বোঝে। সে কৌতূহলবশে নিজেই ডাঙায় উঠে দেখেছে। আশপাশে আর কোন পুকুর আছে কিনা, সেখানে ওর স্বজাতীয়রা আছে কিনা খোঁজ নিতে ইতিউতি ঘুরেছে। লক্ষ্য করে দেখেছে, আকাশের আগুনগোলাটা মাঠের শেষপ্রান্তে অস্ত যায়। তখন আকাশে ফোটে ঝিল্‌মিল্ তারা আর পুকুরে ঝিক্‌মিক্ জোনাকি।



বেঙী বলে, এবার তাহলে যাই রদ্দুরদা? ওরা বড্ড ডাকাডাকি করছে···

— এস বোনটি। আশীর্বাদ করি শিগ্‌গির মা হও।

ফিক্ করে হেসে ফেলে সবুজ শাড়ি-পরা মেয়েটি। মুখখানা লুকাতে টুপ করে ডুব দেয় জলে।

দর্দুর বুদ্ধিমান। বিচক্ষণ। অনেক কিছু সে বুঝতে পারে। আবার অনেক রহস্য সে ভেদ করতে পারেনি। পুকুরের জলে নিজের প্রতিবিম্বকে সে খুঁটিয়ে দেখেছে। এটুকু বুঝতে পেরেছে, — সে অনন্য, সে অসাধারণ। তার মতো বিচিত্রবর্ণ কোন ব্যাঙ-বেঙী এ পুকুরে নেই। কিন্তু কেন? তাহলে সে এ পুকুরে এল কেমন করে? না — ঐ সমস্যার সমাধানটুকু সে করতে পেরেছে। একেবারে শৈশবের কথাও ওর মনে আছে। মাকে তার আবছা মনে পড়ে তবে বাপের স্মৃতিটাই স্পষ্ট। বাপ ওকে — হ্যাঁ, একমাত্র ওকেই এই পুকুরে পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, আর ভয় নেই! যা! ঐ জলে নেমে যা!

দর্দুরের বয়স তখন মাস দুই আড়াই। ব্যাঙাচি পর্যায় সবে পাড়ি দিয়েছে। লেজ নেই, ছোট্ট দর্দুর তার বাপকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আর তুমি? তুমি আসবে না?

ওর পথশ্রান্ত বৃদ্ধ বাপ তখন মৃত্যুশয্যায়। বলেছিল, না রে খোকন! আমি আর পারছি না। আমাকে শান্তিতে এখানেই মরতে দে।

ঠিক তখনই আকাশ ভেদ করে নেমে এসেছিল একটা ভীষণ-দর্শন পালকওয়ালা আতঙ্ক! দুরন্ত ভয়ে প্রাণধারণের জৈবিক প্রেরণায় দর্দুর ঝাঁপ দিয়েছিল জলে। ওর বাপ পুকুর পাড়ে শুয়েই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য! পরম আশ্চর্য! ঐ নভোচারী মাংসাশী রাক্ষসটা ওর রাপের মুমূর্ষু দেহটা ছোঁ মেরে তুলে নিল না। বার কয়েক গোল হয়ে পাক খেল, তারপর পাখা সাবটে মিলিয়ে গেল আকাশে।

ভয়ে ভয়ে বাপের কাছে এগিয়ে এসেছিল দর্দুর। বাপকে প্রশ্ন করেছিল, ও কেন তোমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল না, বাপি?



বাপ তার শেষ হাসি হেসে বলেছিল, এটা আমাদের বাপ-দাদাদের পুণ্যফল! ঈশ্বরের আশীর্বাদ! কেউ আমাদের ছুঁতে পারে না, খেতে পারে না! ভয় নেই রে খোকন, যখন তোকে কেউ আক্রমণ করতে আসবে…

বাকিটা বলবার সময় পায়নি। মৃত্যুর আক্রমণে ঢলে পড়েছিল দর্দুরের বাবা।

সেটাও একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য! ঐ ঈশ্বর লোকটা কে? কোথায় থাকে? সে কেন অহেতুক শুধু ঐ তাদের প্রজাতির ব্যাঙকেই এমন একটা আশীর্বাদ করে বসল খামোকা? কিন্তু কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। নিজের জীবনে এটা সে বারে বারে লক্ষ্য করে দেখেছে। সবাই ওকে ডরায়।

সব্বাই! মায় যারা টপাটপ ব্যাঙ খায়। এ পুকুরে বড় জাতের অনেক মাছ আছে — কার্প, রোচ, পাইক। দর্দুরের মাপের ব্যাঙ তারা হামে-হাল গিলে খায়। দু একবার তাদের মুখোমুখি পড়ে গেছে। বেঁচে গেছে — কী জানি কেমন করে! কেউ ওকে শেখায়নি — কিন্তু ওর ক্রোমোজম-বিধৃত 'জীন'-এই ছিল বাপ-দাদাদের নির্দেশ! অমন শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়লেই ও দম বন্ধ করে কটমট করে শত্রুর দিকে তাকায়। তৎক্ষণাৎ তারা সারা গায়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নানান রঙের বাহার — লাল, কমলা, হলুদ, নীল! আক্রমণকারী থমকে থেমে পড়ে। নিস্পলক নেত্রে কী যেন দেখে। তারপর হঠাৎ যেন 'বাবা গো — মা গো' বলে পালিয়ে বাঁচে। আশ্চর্য ব্যাপার! কার্য-কারণ বোঝা যায় না, যেন নিতান্ত রূপকথার গল্প! কিন্তু সব্বাই ওকে ডরায় — বড় জাতের মাছ, নদী পারের গাছে থাকে যে সব গায়ে কাঁটাওয়ালা চারপেয়ে অথবা ফণাওয়ালা 'নিম্পা', কিংবা আকাশ-পথের উড়ে আসা 'পালকী' দু পেয়ে।

আর কিছু না হক এই ধাঁধার সমাধানটা কি বাৎলে দিতে পারবেন ঐ ভূয়োদর্শী সন্ন্যাসীদাদু? প্রথমত, ঐ ঈশ্বরটা কে? আর দ্বিতীয়ত, সে কেন ওকে দিয়েছে এই অযাচিত সহজাত কবচ-কুণ্ডল?

সন্ন্যাসীর গুহাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ঠিকই বলেছিল বেঙীমণি। ও পাড়ার সবাই সন্ন্যাসী দাদুকে এক ডাকে চেনে। পথ দেখিয়ে দিল তারা।

গুহার ভিতরটা অন্ধকার। দর্দুর মুখে করে একটা বড় জাতের জলপোকা নিয়ে এসেছিল। সন্ন্যাসী-দর্শনে আসছে, একেবারে খালি হাতে যেতে নেই। প্রণামী নিয়ে যেতে হয়। যতই নিঃশব্দে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুক, বুড়ো টের পেয়ে গেল। হেঁড়ে গলায় বললে, কে রে? প্লবী এলি? এত সকালে?

দর্দুর ওঁর চার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে, আজ্ঞে না, প্লবী নই। আমার নাম দর্দুর। এই পুকুরেই থাকি আমি।



— অ! তা অসময়ে আমার কাছে কেন?

— অসময়ে?

— নয়? বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি, এ সময়ে তোর না গলা ফুলিয়ে গ্যাঙর-গ্যাঙ করার কথা! দিন দিন কী বেয়াক্কেলে হচ্ছিস রে তোরা? কুলধর্ম ভুলে গেলি?

হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দর্দুর বললে, তা আপনিও তো ব্যাঙ! কই আপনি তো···

— দূর বোকা! আমি যে সন্ন্যাসী!

তা বটে! দর্দুরের রাগ জল হয়ে গেল। বললে, দাদু, আপনার জন্য সামান্য 'জলৌকা-ভেট' নিয়ে এসেছি। সেবা করুন।

বুড়ো খুশি হল। বললে, বেশ করেছিস। চোখে তো দেখতে পাই না। অর্ধেক দিন উপোস করতে হয়। ঐ প্লবী মাঝে মাঝে কিছু পোকা নিয়ে আসে, তাতেই বেঁচে আছি। তা দে, কী এনেছিস দে—

তৃপ্তি করে খেতে থাকে। দর্দুর শুধোয়, প্লবীটা কে?

— আমার এক পাতানো নাতনী। সবুজ বেঙী। ভাল নাম 'প্লবঙ্গমী', আমি আদর করে ডাকি 'প্লবী'। এ পাড়াতেই থাকে। মাঝে মাঝে পোকা-মাকড় নিয়ে আসে। তা যাক সে কথা, এবার বল, কী জানতে এসেছিস এই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর কাছে? সমস্যা কিছু একটা নিশ্চয় আছে; না হলে এমন ঘনঘোর বর্ষায়···

— আজ্ঞে হ্যাঁ? কিছু জানতেই এসেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন, বলুন তো, ঈশ্বর লোকটা কে?

সন্ন্যাসীদাদু শুয়েছিল। এ-কথায় নড়ে চড়ে উঠে বসল। বললে, ওরে ব্বাস! তুই যে 'শেষ প্রশ্ন' দিয়ে শুরু করলি রে, দাদু ভাই! ঈশ্বর লোকটা কে, কোথায় থাকে, জানলে কি তোর পাখ্‌না গজাবে? আর তা ছাড়া শুনিস্ নি — শাস্ত্রে আছে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'! 'অথাতো' মানে বুঝলি? 'অথাতো' মানে 'তারপর'। অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করার আগেও কিছু আছে। সে সব ঘাটে পারানির কড়ি গুণে দিয়েছিস তো?

দর্দুর বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু দাদুর কথার মানে বুঝল না। বললে, কী বলছেন?

— সংসার-ধম্মো করেছিস? ব্যাঙাচি কয়টি?

দর্দুর বললে, আজ্ঞে না। আমি দারপরিগ্রহ করিনি। আমার জাতের বেঙী এ পুকুরে নেই।

— অ! তা কী জাত দাদু তোমার?

— তা আমি জানি না। সেটাও জানতে এসেছি আপনার কাছে। আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন —

— না রে দাদু পাচ্ছি না। দৃষ্টি খুইয়েছি। তুই মুখে মুখে বল দিকিন?

দর্দুর নিজ দেহাকৃতির বর্ণনা দিল। পুকুরের জলে যেমনটি দেখেছে। শুনে দাদু বললে, সারাজীবন কয়েক হাজার ব্যাঙ দেখেছি, কিন্তু এমন হল্‌দে-সবুজ ওরাংওটাঙের কথা কখনো শুনিনি।

দর্দুর বলে, কয়েক 'হাজার' মানে? কতগুলো?

সন্ন্যাসী জানতে চায়, কদ্দুর গুনতে পারিস দর্দুর?

— সংখ্যার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। আমি সবুজ ব্যাঙ নই।

— অ! সংখ্যার একেবারে শেষ সীমান্ত? তা গোন্ দেখি, এক-দুই করে—



দর্দুর 'এক' থেকে 'নয়' পর্যন্ত গুণে থামল। দাদু বললে, তারপর? 'নয়'-এর পরে?

— 'নয়'-এর পর তো আবার 'এক'!

সন্ন্যাসী হাসল। বললে, তাই বুঝি? তা হবে! — কে রে ওখানে?

দর্দুরের নজর হল গর্তের মুখে একটি সবুজ বেঙী নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বেঙীই। তবে দর্দুর বুদ্ধিমান, বুঝে নিয়েছে ঐ হচ্ছে সন্ন্যাসীদাদুর পাতানো নাতিনী। তাই বলে, ও হচ্ছে প্লবঙ্গমী।

বেঙী এগিয়ে এসে বলে, ওমা! রদ্দুরদা! আপনি আমার ভাল নামটাও জানেন?

— কেন জানব না? তোমার মতো সুন্দরী সবুজ বেঙী কটা আছে এ পুকুরে?

সন্ন্যাসী বলে, প্লবী এলি নাকি? তা পোকা-মাকড় ভালমন্দ কিছু এনেছিস্?

বেঙী ধমক লাগায়, না! আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি। রদ্দুরদার আনা অতবড় জলপোকাটাকে একা একা বসে গিলেছ। রদ্দুরদার জন্যে পাতে একটু পেসাদও রাখনি।

দাদু লজ্জা পেল। বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা তুইও চুপটি করে বস্। আমাকে ব্যাপারটা সমঝিয়ে নিতে দে। তা হ্যাঁ রে দর্দুর, তুই একটা কথা বুঝিয়ে বল দিকিনি। বাপ-মা ছাড়া তো ব্যাঙাচি পয়দা হয় না। তুই এ পুকুরে এলি কেমন করে?

দর্দুর তার বাল্যস্মৃতির কথা বলে গেল আদ্যন্ত।

ওর জন্ম অন্য একটা জলাশয়ে। সেটা অনেক বড়। সেখানে অনেক জলচর 'পালকী' দু-পেয়ে। বড় বড় মাছ তো আছেই। ওরা ছিল সাত ভাই বোন। সবাই বাস করত বাপের পিঠে। তখনো ওরা কেউ ব্যাঙ হয়নি, সবাই ব্যাঙাচি। বাপ ওদের সাত ভাইবোনকে পিঠের ওপর সামলে সুমলে রাখত। কিন্তু বুঝতেই কিছু হল না। একে একে ওর ছয় ভাইবোন মারা পড়ল মাছের আক্রমণে। ব্যাঙ হয়ে যাবার পর কি জানি কেন কেউ ওদের ঘাঁটায় না, কিন্তু ব্যাঙাচি অবস্থায় ওরা মাংসাশী প্রাণীর ভক্ষ্য।

বেঙী বলে, এমন আজব কথা জন্মে শুনিনি বাপু! ব্যাঙাচি কখনো তার বাপের পিঠে থাকে?

দাদু বললে, থাকে রে পাগলি, থাকে। তুই দুনিয়াদারীর কতটুকু জানিস্? কত কত বিচিত্রজাতের ব্যাঙ আছে এই দুনিয়ায়। এক-এক জাতের এক-এক ব্যবহার। সাধারণত ডিম থেকে ব্যাঙাচি হয় — তারা ইতিউতি ঘুরে বেড়ায়, লেজ নেড়ে নেড়ে। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হতে সময় নেয় হপ্তা দশ বারো। এই যেমন তোরা। সবুজ ব্যাঙেরা। কিন্তু কোন কোন বিশেষ প্রজাতির ব্যাঙ নিজের পিঠে করে না-ফোটা ডিম নিয়ে ঘোরে। তারা মাদী ব্যাঙ। কোন কোন পুরুষ জাতের ব্যাঙ ব্যাঙাচিদের পিঠে করে নিয়ে ঘোরে। আবার এক জাতের অদ্ভুত মাদী ব্যাঙ আছে যারা 'জিপ্'-লাগানো ওভারকোট গায়ে চড়ায়। তার ফাঁকে বাচ্চা ব্যাঙ লুকিয়ে থাকে যতদিন না তারা লায়েক হয়।



ওদের নামগুলো ভুলে গেছি ; কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। যাহোক তারপর কী হল বল ?

দর্দুর বলতে থাকে তার বাল্যের কথা। ওর বাপ শত্রুদের চোখ এড়িয়ে তার সাত ভাইবোনকে ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে পরিণত করতে চেয়েছিল। পারেনি। একে একে ওর ছয় ভাইবোন বড় মাছের পেটে গেছে। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে ওর বাবা ওকে পিঠে তুলে নিয়ে ভিন্-পুকুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। থপ্ থপ্ করতে করতে এই অ্যা—ত্ত দূরে চলে আসে। দূরত্বটা কতটা ? চার আগুনগোলার ব্যাঙপথ ! তখন সে নিতান্ত শিশু ; কিন্তু ওর মনে আছে — ওদের আসবার পথে চার-চারবার আগুনগোলা আকাশে উঠেছে, অস্ত গেছে। শেষমেশ ওর বাপ ক্লান্ত দেহে ওকে এই পুকুরে পৌঁছে দিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। আর তাতেই ও এখানে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ !

সন্ন্যাসীদাদু খুব মন দিয়ে শুনছিল। ও থামতেই বললে, কিন্তু ওটা তুই কী বললি ? তোকে কোন পাখি বা মাছ খেতে পারে না ? তোকে দেখলেই পালিয়ে যায় ?

— হ্যাঁ দাদু। তাই যায়। কেন, তা আমি জানি না।

দাদু অনেকক্ষণ একমনে কীসব ভাবল। তারপর বললে, দেখ দর্দুর ! সত্যি কথাই বলব। আমি অনেক-অনেক ব্যাঙ জীবনভোর দেখেছি — যা গুনতে তোকে অনেকবার 'এক থেকে নয়' পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু এমন অদ্ভুত জাতের ব্যাঙের দেখা কখনো পাইনি, যার গায়ের রঙ লাল-কমলা-হলুদ-নীল ! যাকে দেখলে গিরগিটি, সাপরা পর্যন্ত পালিয়ে যায় ! দেখিনি, কিন্তু শুনেছি ! একটা আজব ব্যাঙের গল্প আমি শুনেছি খুব ছোটবেলায়। তুই বোধহয় সেই জাতের ব্যাঙ !

দর্দুর ঘনিয়ে আসে, কী গল্প ? কোথায় শুনেছ ? কী জাতি আমার ?

— বলব, তবে আজ নয়। আমি আর একটু ভেবে দেখি। তবে কোথায় শুনেছি তা আজই বলতে পারি। তাহলে আমার জীবনের কথা তোকে বলতে হয়। সেও একটা দারুণ গল্প। আমি এ পুকুরে কেমন করে এলাম। কেন আমি বর্ষাকালে গলা ফুলিয়ে ডাকি না...

বেঙী বললে, তোমার স্বরভঙ্গ হয়েছে বলে। সে তো আমরা সবাই জানি।

দর্দুর বললে, না ! ব্যাপারটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি দাদু। যেহেতু এ পুকুরে তোমার জাতের দিদিমারা নেই — তাই নয় ?

দাদু হাসল। বললে, ঠিকই ধরেছিস্। তোর মতো আমি নিঃসঙ্গ, একা। তবে তোর মতো বাপের পিঠে চড়ে আমি এ পুকুরে আসিনি। এসেছি নিজের পুরুষকারে ! ভাল কথা, তোর 'দর্দুর' নামটা কে দিয়েছিল ? বাপ্ ?

দর্দুর স্বীকার করল। সন্ন্যাসী বললে, আমার নাম দিয়েছিল ঐ দু-পেয়েরা।

বেঙী বললে, ঐ পালকওয়ালা দুপেয়েরা ? যারা আকাশে ওড়ে ?

— নারে ? পাখি নয়, মানুষ। 'মানুষ' বুঝিস ? ঐ যারা ইচ্ছে মতো গায়ের চামড়া খুলে ফেলতে পারে। ছিপ্ হাতে মাঝে মাঝে পুকুরে মাছ ধরতে আসে ?



বেঙী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মানুষ সে চেনে না? যেহেতু খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক নেই ব্যাঙ-মানুষে। কিন্তু দর্দুর বুঝতে পারে। সে মানুষকে দেখেছে। চেনে। বললে, আপনার কী নাম দাদু?

— আমার নাম 'এস্ ল্যাক্স'। আর আমার মায়ের নাম ছিল 'এক্স ল্যাক্স'। তাঁর নাম তুই জানিস্ না কিন্তু 'দু-পেয়েদের', মানে মানুষদের কেতাবে তার নাম লেখা আছে। তিনি একটা বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারিণী।

— 'বিশ্ব-রেকর্ড' মানে কী? 'বিশ্ব' কাকে বলে?

সন্ন্যাসী দাদু হাসল। বলল, দর্দুর! গল্পটা আমাকে বলতে দে। অনেক কিছুই তুই বুঝবি না। কথায় বলে, কুয়োর ব্যাঙ সাগরের খোঁজ রাখে না। এ গল্পটা কোনদিন কাউকে বলিনি, এই প্লবীকেও নয়। ওরা কিছুই বুঝবে না। তুই 'নয়' পর্যন্ত গুনতে শিখেছিস, হয়তো কিছু কিছু বুঝবি। সবটা না বুঝলেও ক্ষতি নেই — বলেই আমার তৃপ্তি! শোনঃ

দাদু অতঃপর তার আত্মজীবনী শুনিয়েছিল সেই গুহার প্রায়ান্ধকারে। দর্দুর তার অনেক কথাই বুঝতে পারেনি। কিন্তু তোমরা বুঝবে। দাদু সেই দুর্লভ প্রজাতির ব্যাঙঃ Acris gryllus! যার কথা লিখে গেছেন মার্ক টোয়েন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ব্যাঙ-নাচানোর' গল্পে।

মিথ্যা বলেনি দাদু। ওর মা — সেই বিশ্ববিজয়িনী 'এক্স ল্যাক্সের' কথা লেখা আছে 'গ্যিনেস্ বুক অফ্ রেকর্ডস্'-এ। 'ব্যাঙ-লাফানি' প্রতিযোগিতায় 'এক্স ল্যাক্স' অলিম্পিক রেকর্ড ধরে রেখেছেন আজও। তাঁর দেহ-দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র দুই ইঞ্চি, কিন্তু তিনি লাফিয়েছিলেন সাড়ে সতের ফুট! তিনিই সন্ন্যাসী দাদুর গর্ভধারিণী!

জন্মাষ্টমী তিথিতে নয়, কিন্তু সন্ন্যাসী-দাদুর জন্ম হয়েছিল কংসের কারাগারেই। বন্দীদশায়! ওর বাবা এবং মা দু'-জনেই ছিল বন্দী। ব্যাঙ-লাফানি প্রতিযোগিতা ওদেশে বহুদিন ধরে চলছে।

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা যারা করে তারা এই বিশেষ জাতের ব্যাঙ পোষে। বন্দী করে রাখে চৌবাচ্চায়। বছর বছর ব্যাঙ-লাফানি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হত ওর বাপ-মাকে। বন্দী জীবন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খানদানি, কী খাবে কখন খাবে, কতটা খাবে — সব এক্সপার্ট-এর ছক বাঁধা। মায় গরমের দিনে ঘরটা ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা, শীতের দিনে গরম রাখা। একই চৌবাচ্চায় থাকত ওরা — প্রায় পঞ্চাশটি ব্যাঙ। একই প্রজাতির — 'এ্যাক্রিস্ গ্রীলাস্' — ওরাই ব্যাঙ-লাফানোতে সব চেয়ে দড়। এমনকি ওদের রক্ষক মাঝে মাঝে সকলকে আউটিঙে নিয়ে যেত। যাতে ওদের মন-মেজাজ ভাল থাকে। সে বড় বিচিত্র আয়োজন। মশারির মতো ঘেরাটোপ একটা জালতির মধ্যে বন্দী করে ওদের পঞ্চাশটি ব্যাঙকে নামিয়ে দেওয়া হত কোন প্রাকৃতিক জলাশয়ে। যাতে ওরা যে বন্দী সে-কথাটা সাময়িকভাবে ভুলে থাকতে পারে। তাতে মনে স্ফূর্তি আসে। সেখানে ওরা ছোট ছোট জলজ পোকা মাকড় — মশার শূককীট, জলৌকা ইত্যাদি শিকার করে খেতে পারে অথচ বড় জাতের মাছ ওদের খেতে পারে না।



দর্দুর যেমন শুধু তার বাপকে চেনে, মাকে নয় — সন্ন্যাসীদাদু তেমনি

আবার শুধু তার মাকেই চেনে, বাপকে নয়। মা তাকে বলত, যেমন করে হোক, এই বন্দীদশা থেকে পালাতে হবে। তুই একটু বড় হয়ে নে। পিছনের পায়ে আর একটু জোর হোক, তারপরেই দুজনে…

— কিন্তু কেমন করে পালাবে, মামণি? ওরা যে সারাক্ষণ পাহারা দেয়!

— দিক্! সে তোকে শিখিয়ে দেব'খন। কীরে? আমার মতো লাফ মারতে পারবি তো?

ছোট্ট খোকন তার ছোট্ট বুকটা ফুলিয়ে বলত, তোমার চেয়েও বড় লাফ দেব, দেখ!

— নিশ্চয় দিবি! কিন্তু সেটা ঐ বুড়োকে বাজি জেতাতে নয়। তোর মুক্তির জন্যে। কেমন?

বেচারী এক্স ল্যাক্স! সে তার ছোট্ট খোকন-সোনাকে ঐ পালাবার মন্ত্রটা শেষপর্যন্ত শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। দক্ষিণ আমেরিকার এক ধনকুবের — ম্যাক-গ্রেগরী — গোটা দশেক ব্যাঙ কিনে নিয়ে গেলেন। ওর মা এক্স ল্যাক্স রয়ে গেল ক্যালিফোর্নিয়ায়, আর তার খোকনকে ঐ ম্যাক-গ্রেগরী নিয়ে এল সাও পাওলোতে, ব্রেজিলে। ম্যাক-গ্রেগরী বিরাট ধনী, মস্ত শিকারী, তার হঠাৎ সখ হয়েছে — ক্যালিফোর্নিয়ায় অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যেমন ব্যাঙ-লাফানির রেস হয়, ব্রেজিলেও তেমন রেস-খেলার আয়োজন করবে। তাতে টুরিস্ট আকর্ষণ বাড়বে। ম্যাকের অনেকগুলি হোটেল। বড়লোকের খেয়াল। যে-কথা সেই কাজ। তাই ভাল জাতের ডজনখানেক 'পেডিগ্রিড'-ব্যাঙ কিনে নিয়ে এল সে। আমাদের কাহিনীর রঙ্গমঞ্চ যে পুষ্করিণী সেটি ঐ ম্যাকগ্রেগরীর খাস্ তালুকে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে। সাও পাওলো শহর থেকে ও পুকুরটা মাইল কুড়ি দূরে। এখানে ম্যাকের একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি আছে। ছুটি-ছাটায় সপরিবারে এবং সবান্ধবে বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। এ বাড়িতে আগে থেকেই ব্যাঙচাষের জন্য বিরাট একটা চৌবাচ্চা বানানো হয়েছিল। ম্যাক আর তার মেয়ে



সন্ন্যাসীদাদুসহ গোটা দশ-পনের ব্যাঙ নিয়ে সানফ্রান্সিস্কো থেকে উড়ে এল ব্রেজিলে।

দর্দুর এতক্ষণ চুপচাপ গল্প শুনে যাচ্ছিল। অনেক কথাই সে বুঝতে পারেনি। ঐ 'দুই ইঞ্চি', 'সাড়ে সতের ফুট', 'আউটিঙ', 'পেডিগ্রি' প্রভৃতি শব্দ তার মাথায় ঢোকেনি আদৌ। তবু সে কোন প্রশ্ন করেনি। কারণ গল্প শুরু করার আগেই সন্ন্যাসীদাদু বলে রেখেছিল — 'সব কথা তুই বুঝবি না'। কিন্তু এবার আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। বললে, উড়ে এল? মানুষও তাহলে উড়তে পারে?

দাদু বললে, না রে বোকা! কিন্তু ওদের একজাতের পোষা পাখি আছে। তাদের গায়ে পালক নেই, তারা 'পালকী' নয়; কিন্তু মানুষের হুকুমে তারা ইতি-উতি ওড়ে। তাকে বলে, 'এয়ারোপ্লেন'। বুঝলি? তার পিঠে চেপেই এলুম আমরা। যা হোক, শুনে যা। বাধা দিস্ না বারে বারে।

সন্ন্যাসীদাদু আবার শুরু করে তার আত্মজীবনী।

বাগানবাড়িটা এই পুকুর থেকে মাইলখানেক দূরে। দারোয়ান, মালি, খিদমদগারেরা ছাড়া বড় একটা কেউ থাকে না। সাহেব হয়তো বছরে একবার কি দুবার আসতেন। তখন সাজ-সাজ রব পড়ে যেত। ব্যাঙদের আবির্ভাবের পর অবস্থা বদলে গেল। উঁচু তারের জাল দিয়ে সমস্ত বাগানটা ঘিরে ফেলা হল, যাতে ব্যাঙের লোভে সাপ না আসে। এল ব্যাঙের খিদম্‌দ্‌গার, সর্বক্ষণের পশুচিকিৎসক। ট্রেনার-সাহেব প্রতি সপ্তাহান্তে মেয়েকে নিয়ে ব্যাঙের তত্ত্বতালাশ নিতে আসেন। কোন্ ব্যাঙ কতটা লাফাচ্ছে মেপে দেখেন। শোনা যাচ্ছে — আগামী 'টুরিস্ট-সিজ্‌নে' ব্যাঙ লাফানির রেস হবে। ওদের দলে যে কজন ব্যাঙ আছে তাদের মধ্যে অনেকেই বারো-চৌদ্দ ফুট লাফাতে পারে। কিন্তু তাতে ম্যাক-গ্রেগরীর মন ওঠে না। এক্সল্যাক্সের রেকর্ডটা ভাঙা চাই।

ট্রেনার বলে, কিছু চিন্তা করবেন না স্যার, এস্-ল্যাক্সই তার মায়ের রেকর্ডটা ভাঙবে। মাস-ছয়েক যেতে দিন।

—এখন ও কতটা লাফাচ্ছে?

— গত সপ্তাহে একবার চৌদ্দ, একবার চৌদ্দফুট তিন ইঞ্চি লাফিয়েছে!

— মাত্র চৌদ্দ?

— ও তো এখন শিশু স্যার!

চৌবাচ্চার অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যাঙরাও ওকে উৎসাহ যোগাতো — যেমন করেই হোক, মায়ের রেকর্ড তাকে ভাঙতে হবেই। এস্ ল্যাক্স মনে মনে বলত, নিশ্চয় পারব। তাহলেই আমার নাম কাগজে ছাপা হবে। মা-ও নিশ্চয় শুনবে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসে।

তারপর হঠাৎ একদিন এস ল্যাক্স স্বপ্ন দেখল (আচ্ছা, ব্যাঙ স্বপ্ন দেখে তো? রূপকথার গল্পের খাতিরে এটাও না হয় ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নিও তোমরা), যেন ওর মা এসেছে। বলছে, খোকন! তোকে আমি কী বলেছিলাম?



— কী বলেছিলে? খুব জোরে লাফাতেই তো বলেছিলে?

— হ্যাঁ! কিন্তু সে কি প্রতিযোগিতা জেতার জন্য?

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা! মা না তাকে বলত — বন্দীজীবন থেকে ওকে পালাতে হবে! মা নেই, কিন্তু বন্দীদশা থেকে মুক্তির বাসনাটা তো আছে! কিন্তু পালাবে কেমন করে? সব সময়েই পাহারা। চতুর্দিকে লোকজন। বাগানে শিক্ষিত অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর — তারা ব্যাঙকে কামরায় না, কিন্তু পালাতেও দেয় না। তাহলে?

দারুণ একটা সুযোগ এসে গেল হঠাৎ।

কী-একটা অসুখে পর-পর তিনটে ব্যাঙ মারা গেল চৌবাচ্চায়। পশুচিকিৎসক বললেন, ব্যাঙের মড়ক লেগেছে। যারা সুস্থ আছে তাদের সবাইকে ইন্‌জেকশন দিতে হবে!

সেই মতোই ব্যবস্থা হল। ব্যাঙদের টেবিলের উপর তুলে একের পর এক সূচ ফোটানো হচ্ছে। ম্যাক-গ্রেগরীর মেয়ে, ডরোথী, ঐ মরা ব্যাঙ তিনটেকে তুলে নিয়ে গেল। মেয়েটার হবি হচ্ছে 'ট্যাক্সিডার্মি'। বাপ জীবজন্তু শিকার করে আনে, আর মেয়ে তাদের সাজিয়ে রাখে ড্রইংরুমে। নিজে হাতে 'স্টাফ্' করে।

[এখানেও দর্দুর বিহ্বল হয়ে পড়ে। 'ট্যাক্সিডার্মি' বা 'স্টাফ্' করা ব্যাপারটা বোঝে না। কিন্তু সে বাধা দেয় না। চুপচাপ শুনে যায়।]

ডাক্তারবাবু একে একে ব্যাঙ তুলে নিয়ে ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন। তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এস্ ল্যাক্স, মানে সন্ন্যাসী দাদুর নজর হ'ল — দরজাটা হাট করে খোলা আছে। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। একবার যদি সে এই দরজার বাইরে যেতে পারে তাহলেই মুক্তি! অন্ধকারে কেউ ওকে খুঁজে পাবে না। টর্চ এনে খোঁজাখুঁজি করতে করতেই সে বার দশেক লাফ মারতে পারবে। অবশ্য গোটা বাগানটাই তারের জালতি দিয়ে ঘেরা। দশ ফুট উঁচু তারের জালতি! কিন্তু পরের কথা পরে। আপাতত এ ঘর ছেড়ে কী করে বার হওয়া যায়? দরজাটা ফুট পনের দূরে। এক লাফে কি...

যে-কথা সেই কাজ। এস্ ল্যাক্স দিল এক মোক্ষম লাফ! শূন্য পথে উড়তে উড়তে গিয়ে পড়ল একেবারে বাগানে! ঘাসের উপর। ঘরের ভিতর হৈ-চৈ চ্যাঁচামেচির শব্দ। সে তখন মরিয়া। পর পর তিনটে লাফে একেবারে সদর ফটকের সামনে!

সন্ন্যাসীদাদুর বৃহস্পতি তখন তুঙ্গে। একটু আগে একটা মটোর-ভ্যান বেরিয়ে গেছে। দারোয়ান তখনো গেটটা বন্ধ করেনি। ব্যস্! আর এক লাফে এস্ ল্যাক্স মুক্ত!

বাগানের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে জ্বলে উঠল জোরালো সার্চ-লাইট। কুকুরগুলোর চেন খুলে দেওয়া হল। টর্চ হাতে যে যেখানে ছিল নেমে পড়ল বাগানে। কিন্তু কোথায় কে?

সন্ন্যাসী দাদু জানে না। পরে মেপে দেখা হয়েছিল — টেবিল থেকে সে প্রথম যে লাফ্‌টা মারে তা একটা বিশ্ব রেকর্ড! ছায়ের কাছে হেরেছে মা! কিন্তু 'গ্যিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ তথ্যটা নেই — এটা স্বীকৃত রেকর্ড নয় বলে।



তারপর ক্রমে এস্ ল্যাক্স হয়ে গেছে সন্ন্যাসী। এই পুকুরেই কেটে গেছে তার দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবন। এই দক্ষিণ আমেরিকায় কোথায় পাওয়া যাবে Acris gryllus প্রজাতির ব্যাঙ?

গল্পটা শেষ হলে বেঙী বললে, কিন্তু দাদু, দর্দুরদার মতো এমন হলুদ-কমলা-লাল-নীল রঙের ব্যাঙ আপনি কখনো দেখেননি, নয়?

— না রে! কখনো দেখিনি। কিন্তু ওকে দেখে সবাই পালিয়ে যায় শুনে আমি আন্দাজে বুঝতে পেরেছি, ও কী জাতের।

দর্দুর প্রশ্ন করে, কী জাত দাদু?

— তুই আসলে হচ্ছিস্ ঐ দু পেয়ে — না, পাখি নয়, পালক-হীন দুপেয়ে — মানুষ!

বেঙী বলে, 'মানুষ' কী দাদু?

দর্দুর অবাক হয়ে বলে, আমি… আমি… দু-পেয়ে পালকহীন? আমি… মানুষ?

— তাই তো মনে হচ্ছে আমার।

— কেমন করে? কোন্ যুক্তিতে? আমাকে দেখতে কি মানুষের মতো?

— কাল আসিস, বুঝিয়ে বলব। আর হ্যাঁ, আসার সময় পারলে একটা উচ্চিংড়ে ধরে আনিস তো। অনেকদিন উচ্চিংড়ে খাইনি!

সারা রাত দর্দুরের ঘুম হল না। ওটা কী বলল সন্ন্যাসী দাদু! সে ব্যাঙই নয়! সে মানুষ! ধু—স্! তাহলে সে জলে থাকে কেন? দাদুটা বদ্ধ উন্মাদ! তবু দুর্দান্ত কৌতূহল হয়েছিল তার। পরদিন সকালেই সে একটা উচ্চিংড়ে ধরল। খেল না। মুখে করে সেটা নিয়ে দেখা করতে গেল সন্ন্যাসী দাদুর গর্তে।

গর্তের মুখেই দেখা হয়ে গেল বেঙীর সঙ্গে।

— কী ব্যাপার রে বেঙী? তুই এই সাত-সকালে এখানে?

— তোমার জন্যেই বসে আছি। দাদু ঘুমাচ্ছে। দাও উচ্চিংড়েটা দাও। ভাঁড়ারে রেখে আসি। কাল অতবড় জলৌকাটা খেয়ে দাদুর অম্বল হয়েছে। আজ কিছু খেতে দেব না।

পাকা গিন্নির মতো বেঙী ভাঁড়ার সামলে এগিয়ে এসে বসল। বললে, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে রদ্দুরদা।

— কী কথা, বল না?

— তুমি মানুষ হয়ে যেও না! ব্যাঙ হয়ে জন্মেছ, ব্যাঙ হয়েই থাক।

দর্দুর হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, 'মানুষ' কাকে বলে তুই জানিস্?

— কাল জানতুম না। পরে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। মানুষরা ভাল নয়, ওরা মাছ মারে!

— ভালই তো করে। মাছরা আবার যে ব্যাঙ মারে?

— তা হোক। বল, কথা দাও, তুমি মানুষ হয়ে যাবে না?

ঐ সরল মেয়েটির বোকামিতে দর্দুর মজা পায়। বেঙী ভেবেছে দর্দুর ইচ্ছা করলেই বুঝি মানুষ হয়ে যেতে পারে। সে হেসে বললে, কী আর করি বল



বেঙি। মানুষ না হলে আমি বে-থা করব কী করে? সংসার পাতব কেমন করে? পুকুরপাড়ে অনেক মেয়েমানুষ দেখেছি, কিন্তু আমার জাতের বেঙী যে এ তল্লাটে একটাও নেই।

— তোমার জাতের নাইবা হল? বেঙী তো আছে।

— দূর বোকা! তারা আমাকে 'বে' করতে রাজি হবে কেন? আমাকে বে' করলে সে তো কোনদিন 'মা' হতে পারবে না। কোন বেঙীই তাতে রাজি হবে না!

— তোমাকে বলেছে! তুমি এত সুন্দর! কোন বেঙীকে কখনো জিজ্ঞাসা করে দেখেছ?

দর্দুর রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। বলে, এই বেঙী! আমার দিকে তাকিয়ে দেখ তো?

বেঙী পারল না। মুখটা নিচু হয়ে গেল তার!

দর্দুর বুঝতে পারল। বলল, তা হয় না রে বেঙী! ভগবানের তা বিধান নয়। তুই তাহলে কোনদিন কোন ব্যাঙাচির মা হতে পারবি না।

বেঙী অন্যদিকে ফিরে বলল, নাই বা হলুম। দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারব তো?

এ কী পাগল মেয়ে!

ঠিক তখনি নিদ্রাভঙ্গ হল সন্ন্যাসীদাদুর। হাঁকাড় পাড়ল, দর্দুর এলি নাকি? উচ্চিংড়ে পেয়েছিস্?

দর্দুরকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে বেঙী বলল, না, পায়নি। পরে একদিন এনে দেবে বলেছে।

—তা ভাল। কাল থেকে গরহজম হয়ে আছে। আয়, তোরা বোস দিনি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। কাল রাত্রে আমি অনেক ভেবেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস: তুই আসলে মানুষ। ব্যাঙের ছদ্মবেশে আছিস্ কোন অপদেবতার শাপে।

দর্দুর বলে, তাই কখনো হয়?

— কেন হবে না? ছিলি ব্যাঙাচি, হলি ব্যাঙ — এ তো তোদের দুজনের জীবনেই ঘটেছে। ছিল ডিম, হল পাখি; ছিল শোঁ-পোকা, হয়ে গেল পেরজাপতি — এমন তো হামেশাই হচ্ছে।

— তাই বলে ব্যাঙ থেকে মানুষ?

— তাও হয়রে! আমি জানি!

— তুমি কখনো হতে দেখেছ?

— না স্বচক্ষে দেখিনি। তবে ঘটনাটা আমার জানা। সে-কথাই আজ বলব তোদের। শোন্:



সন্ন্যাসীদাদু তখন গল্পটা বিস্তারিত শোনালো। ঘটনাটা সে শুনেছিল ডরোথীর নার্স-এর মুখে। ডরোথী মানে ঐ ম্যাকগ্রেগরীর মেয়ে — যার হবি 'ট্যাক্সিডার্মি' করা। সে তখন তা করত না। তখন সে ছোট্ট বেণী-দোলানো বাচ্চা মেয়ে। তাকেই মুখে মুখে গল্পটা শুনিয়েছিল তার নার্স। সন্ন্যাসীদাদু তখন সে ঘরেই ছিল। তখন সেও নেহাৎ বাচ্চা। মানুষের ভাষায় কথাই না

হয় বলতে পারে না, বুঝতে অসুবিধা হয় না কিছু।

শোন এবার গল্পটা বলি ঃ

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার ছেলে নেই। অনেকগুলি মেয়ে। সবারই বে-থা হয়ে গেছে, যে-যার শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বাকি আছে শুধু ছোট রাজকন্যা — ফুলের মতো ফুটফুটে ডরোথী।

দর্দুর বাধা দিয়ে বললে, তার নামও ডরোথী?

— তাই তো বলেছিল নার্স। বোধহয় তার একমাত্র শ্রোতাকে খুশি করতে। শোন ঃ

সেই রাজবাড়ির বাগানে ছিল একটা পদ্মদিঘী। আর তাতে বাস করত একটা ব্যাঙ। তা দিঘীতে ব্যাঙ তো থাকতেই পারে না; সে কথা নয়। এ একটা বিশেষ জাতের ব্যাঙ। তার গায়ে লাল-হলুদ-কমলা-নীল রঙের ছোপ-ছোপ দাগ। তার নাম মণ্ডূককুমার। আর মজা হচ্ছে এই যে, সে-জাতের ব্যাঙ এ পুকুরে দ্বিতীয়টি নেই। তাই মন্ডূককুমার নিতান্ত নিঃসঙ্গ, একা! কেউ তার সঙ্গে মেশে না, আলাপ করতে আসে না। এমনকি বড় জাতের মাছেরাও তাকে সভয়ে এড়িয়ে চলে…

দর্দুর ঘনিয়ে এসে বলে, ঠিক আমার মতো? না দাদু?

— মণ্ডূককুমার রোজ বিকেলে ঘাটের ধারে এসে বসে থাকে। সারাটা দেহ জলে ডুবিয়ে, শুধু চোখ দুটো জলের উপরে ভাসিয়ে। কেন জানিস? সে জানে, রোজ বিকেলে রাজকন্যা ঐ ঘাটের ধারে খেলতে আসে। রাজকন্যারও কোন সঙ্গীসাথী নেই। সেও একা-একা। ঘাটের ধারে বসে কখনো আপন মনে গান গায়, কখনো বা একটা সোনার বল নিয়ে লোফালুফি খেলে।

একদিন হয়েছে কি — লোফালুফি করতে করতে সোনার বলটা গড়িয়ে পড়ল জলে। ঘাটের পাষাণ-রানায় বসে বেচারি হাপুস-নয়নে কাঁদতে থাকে।

মণ্ডূককুমারের মনে হল, এ এক দুর্লভ সুযোগ। চট্ করে জল থেকে উঠে এল সে। বললে, রাজকন্যে, রাজকন্যে, তুমি কাঁদছ কেন?

রাজকন্যা প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিল। তারপর তার নজর হল। দেখল ব্যাঙটাকে। বললে, কাঁদব না? আমার সোনার বলটা যে জলে পড়ে গেল? মণ্ডূককুমার বলে, কেঁদ না রাজকন্যে, আমি এখনি তোমার বলটাকে তুলে দিচ্ছি—

রাজকন্যার চোখ প্রত্যাশায় চিক্‌চিক্ করে। বলে, পারবে? তাহলে তুমি যা চাইবে তাই দেব আমি। আমার গলার মালা, সবচেয়ে ভাল ডল পুতুল, আমার মাথার মুকুট…

— না। ওসব চাই না আমি। তুমি আমার বন্ধু হবে?



রাজকন্যে তখন বলটা ফিরে পাওয়ার লোভে সবেতেই রাজি। বললে, আলবৎ।

— রোজ আমার সঙ্গে খেলবে? এক টেবিলে খাবে? এক খাটে শোবে?

— বললাম তো। সব, স—ব কিছুতেই আমি রাজি। শুধু বলটা এনে দাও।

দর্দুর এ গল্পটা জানত না। অবাক হয়ে শুনতে থাকে। কিন্তু তোমাদের কাছে এ অতি পরিচিত রূপকথার কাহিনী — জ্যাকব আর উইলহেম রচিত 'গ্রিমস্ ফেয়ারি টেলস্'-এর। দীর্ঘ কাহিনী শেষ হলে দর্দুর জানতে চায়, কেমন করে এমনটা হল দাদু? মণ্ডূককুমার কেমন করে রাজপুত্তুর হয়ে গেল?

— সে-কথাই তো বল্‌ছি। ব্যাঙাচি যেমন ব্যাঙ হয়, শোঁ-পোকা হয়ে যায় পেরজাপতি, তেমনি তেমন-তেমন ক্ষেত্রে ব্যাঙও রাজপুত্তুর হয়ে যেতে পারে। সবাই নয়। বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ। যারা আসলে দু-পেয়ে, কোনও ডাইনীর শাপে চার-পেয়ে হয়ে গেছে।

দর্দুর জানতে চায়, কিন্তু ডাইনীর অভিশাপ কাটল কেমন করে?

— ঐ যে রাজকন্যে ওকে এক প্লেট থেকে খেতে দিল, এক বিছানায় শুতে দিল। ভালবাসায় কী না হয়?

বেঙী ফস্ করে প্রশ্ন করে বসে, সত্যিকারের ভালবাসলে তাহলে সবুজ ব্যাঙও রদ্দুরদার মতো আগুন-রাঙা হয়ে যেতে পারে?

দর্দুর ও দাদু দুজনেই হো-হো করে হেসে ওঠে ওর মূর্খামিতে।

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে দর্দুরের জীবনে। দাদুর মুখে ঐ রূপকথার গল্পটা শোনার পর থেকে। সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছে যে, সে নিজে এক শাপভ্রষ্ট পালকহীন দু-পেয়ে! কোন ক্রমে যদি কোন রাজকন্যার সঙ্গে এক পাতে বসে খেতে পারে, এক বিছানায় শুতে পারে তাহলেই সে আবার হয়ে যাবে রাজপুত্তুর। কিন্তু রাজকন্যা কোথায় পাবে?

বেঙী মাঝে মাঝে পোকা-মাকড় নিয়ে আসে। ওকে ডাকতে আসে। বলে, চল না, দুজনে একসঙ্গে সাঁতার কাটি। পোকা ধরি—

দর্দুর বলে, দূর! ওসব ভাল লাগে না।

বেঙী ম্লান মুখে ফিরে যায়।

দর্দুরের মনে হল, দাদু বলেছে — ইদানিং রাজা আর পাওয়া যায় না। যারা খু—ব বড়লোক তাদেরই বলে রাজা। তা এ তল্লাটে তেমন বড়লোক··· হ্যাঁ আছে! ঐ ম্যাকগ্রেগরী। আশ্চর্য! তার একটি মেয়েও আছে। আর কী যোগাযোগ, দাদু বলেছে, তার নামও ডরোথী।

মাঝে মাঝে সাইকেলে চেপে বন্ধুর সঙ্গে ডরোথী বাগানে বেড়াতে



আসে। দর্দুর দেখেছে দূর থেকে। কিন্তু কেমন করে আলাপ জমাবে? দিনের পর দিন সে ঘাটের ধারে চুপটি করে বসে থাকে — যদি ঘাটে নাইতে আসে ডরোথী। কিম্বা হাত-পা ধুতে।

ডরোথী জলের কিনারায় আসে না। তাকে দূর থেকে দেখতে পায় শুধু।

বেঙী বলে, তুমি কি শেষ-মেষ পাগল হয়ে যাবে দর্দুরদা? আজ এক হপ্তা হয়ে গেল, খাওয়া নেই, ঘুমানো নেই, তুমি এই পাষাণরানায় ঠায় বসে আছ?

হঠাৎ খেয়াল হয় দর্দুরের। বেঙী জীবনে এই প্রথম ওকে 'দর্দুরদা' বলে ডেকেছে। একটু অবাক হয়ে বললে, ওটা কি বল্‌লি রে বেঙী? এক 'হপ্তা' মানে? 'হপ্তা' কী?

— আহা! জান না যেন! হপ্তা মানে তো সাত দিন!

— সাত দিন! সাত দিন কাকে বলে তুই জানিস?

— আমি কি সেই ছোট্টটি আছি? কেন জানব না? এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়ের পর যে দিনটা আসে তাকেই বলে সাতদিন।

দর্দুর বলে, তোর তো অনেক উন্নতি হয়েছে বেঙি!

উন্নতিটাই লক্ষ্য করে; কিন্তু কোন্ প্রেরণায় এই উন্নতি তা অনুমান করতে পারে না।

সে যে নিজের চিন্তাতেই বিভোর। কেমন করে ঐ ডরোথীর সমতলে পৌঁছাবে! কেমন করে যাবে ঐ বাগানবাড়িতে? পথ অনেকটা। তা হোক, দর্দুর যেতে পারবে। কিন্তু ভিতরে ঢুকবে কেমন করে? চারদিকে যে উঁচু তার, জালতির বেড়া!

দিবারাত্র এই চিন্তাতেই সে বিভোর।

তাই তার নজরে পড়ে না — একটি নতমুখী সবুজ-বেঙী কী নিরলস নিষ্ঠায় উঁচু তারের বেড়া ডিঙিয়ে দর্দুরের মানসিক সমতলে তিল তিল করে উঠে আসছে! দাদুর ঐ শেষ কথাটায় বেঙীও যে বিশ্বাস রেখেছেঃ ভালবাসায় কী না হয়?

তারপর একদিন অদ্ভুত সুযোগ এসে গেল একটা।

সবুজ-বেঙী সাত-সকালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ওর ডেরায় এসে হাজির।

— ও দর্দুরদা! শিগ্‌গির এস! মস্ত ভোজ হচ্ছে যে আজ! কী বসে আছ গর্তের ভিতর।

— ভোজ! কিসের ভোজ?

বেঙী বুঝিয়ে দিল — সায়েব-বাড়ির পালকহীন দু-পেয়েরা আজ পুকুরে মাছ ধরতে এসেছে দল বেঁধে। সকাল থেকে পুকুরে 'চার' ছড়াচ্ছে।

দর্দুর বললে, 'চার' ছড়াচ্ছে তো বঁড়শিতে করে মাছ ধরবে বলে।

— হ্যাঁ, কিন্তু বঁড়শিতে মাছই ধরবে ওরা, ব্যাঙ নয়। পালকহীন দু-পেয়েরা ব্যাঙ খায় না।



— কিন্তু ভুল করে যদি বঁড়শি গিলে ফেলি?

— ফেলবে না! একটু সমঝে চল, তাহলেই বঁড়শি এড়িয়ে 'চার' খেতে পারবে। আর দেখছি তো, ছিপে ব্যাঙ উঠ্‌লে ওরা বঁড়শি খুলে ব্যাঙটাকে আবার জলেই ফেলে দেয়।

— কী দরকার বাপু উট্‌কো ঝামেলায়?

পিছন থেকে অন্যান্য সবুজ ব্যাঙেরা বললে, তবে তুমি গর্তেই বসে থাক। আমরা ভোজ খাব। অত পুতু-পুতু করলে কি চলে? আয় রে বেঙী!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবুজ ব্যাঙের দলের সঙ্গে বেঙীকে যেতে হল।

হঠাৎ একটা কথা মনে হলে দর্দুরের। সাহেব বাড়ি থেকে এরা মাছ ধরতে এসেছে! তাহলে ডরোথীও এসেছে নাকি? তড়িঘড়ি সেও ভেসে চলে ওদিকে।

হ্যাঁ, এসেছে। দলবেঁধে অনেকে এসেছে মাছ ধরতে। পিকনিক-বাস্কেট। সারাদিন এখানে হৈ-হৈ করবে। বন-ভোজন আর কী। মাছধরা তারই একটা পর্যায়। প্রথমেই তাই 'চার' ছড়াচ্ছে। দর্দুর একটা কচুপাতায় উঠে সব দেখতে থাকে। ডরোথীকে এত কাছ থেকে এর আগে কখনো দেখেনি। দেখেই মোহিত হয়ে গেল সে! কী সুন্দর! কী মিষ্টি মেয়েটি। দাদু কী যেন বলেছিল? — হ্যাঁ, ফুটফুটে ফুলের মতো সুন্দর!

মেয়েটি যদি একা থাকত তাহলে দর্দুর সাহস করে এগিয়ে গিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে তো একা নয়। দলে ওরা অনেক। সারাটা দিন দর্দুর কচুপাতার উপর বসে বসে দেখল মেয়েটিকে। ওরা অনেক মাছ ধরল। কিছু ব্যাঙও উঠল ছিপে। ঠিকই বলেছিল বেঙী। বঁড়শি থেকে খুলে ফেলে দিল তাদের।

ক্রমে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি পোকা জ্বলতে থাকে। দর্দুর জানে, জোনাকি পোকার মেয়েগুলো উড়তে জানে না। ওড়া-উড়ি করে শুধু পুরুষ-জোনাকি। বারে বারে আলো জ্বালে আর নেবায়। আলোর সঙ্কেতে বলে: 'কই গো তুমি?' আর মেয়ে জোনাকি দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি মোটেই করে না। মেটে ঘরের দাওয়ায় যেন পিদিম জ্বেলে সাড়া দেয়: 'চোখের মাথা খেয়েছ? এই তো আমি!'

বিকেল-বিকেল এক ঝাঁক মে-ফ্লাইও উড়ে এসেছে পুকুরে।

ওরা আজব পতঙ্গ — দর্দুর ওদের কথাও জানে।

কোন এক চৈতালী অপরাহ্নে ওদের জন্ম। শত শত — হাজার-হাজার! কিন্তু ওদের জীবন বড় ছোট! মাত্র দেড়-দুঘন্টার মেয়াদ। জন্মায় বিকালে, মারা যায় সন্ধ্যায়! সবচেয়ে আজব কাণ্ড ওদের দেহে খাদ্যনালীই নেই। খাদ্যনালী নেই তো খায় কী? খায় না তো! খাবার সময় কোথা? মাত্র দু-তিন ঘন্টার জীবন — এর মধ্যে খাবার জন্য সময় নষ্ট করা যায়? মে-ফ্লাই তাই খেতে জানে না, বিশ্রাম নিতে জানে না, ওরা কেউ কোনদিন সূর্যোদয় দেখেনি। জন্মের পর ওদের একটিই কাজ — কোনক্রমে সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়া। আগামী প্রজন্মের ব্যবস্থা করা। সন্ধ্যের পরই স্ত্রী-পতঙ্গ ঝোপে-ঝাড়ে ডিম পাড়ে আর তৎক্ষণাৎ মারা যায়। পুরুষেরা যায় সহমরণে। তাই ওদের নাম 'ক্ষণচর'। অথচ আশ্চর্য! ওরা এই দুনিয়ায় টিকে আছে আজ বিশ কোটি বছর! বিশালকায় ডাইনোসরের দল এসেছে, হারিয়ে গেছে — কিন্তু ক্ষণচরেরা প্রতিটি সন্ধ্যায় আউড়ে গেছে সেই মন্ত্রটা: গোত্রং নঃ বর্ধতাম!



লা-মা-১০

ওরা শুধু 'ক্ষণচর' নয়, ওরা 'শাশ্বত'!

দর্দুর ওদের খায় না। আহা! বেচারীদের মাত্র দু-তিন ঘণ্টার জীবন। তার মধ্যে কেন অহেতুক ঝামেলা করা। তার চেয়ে ওরা গেয়ে নিক ওদের সেই গানটা : 'জীবন এত ছোট কেনে'?

অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় পিকনিক পার্টিও শেষ হল। খিদ্‌মৎগারেরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিল বাগানবাড়ি-পানে। দর্দুর দেখল, ডরোথী আর তার বুড়ি নার্স এগিয়ে এল ঘাটের দিকে। নার্সটাকে ঠিকই চিনেছে দর্দুর। দাদুর বর্ণনা মোতাবেক। ঘাটের কাছে এসে ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ধুয়ে নিল ওরা। দর্দুর কচু পাতা থেকে মারলে ত্রিং করে এক লাফ — একেবারে ঘাটের পাষাণ-রানায়। ডরোথী চম্‌কে উঠেছিল! এক পা পিছিয়েও গেল ভয়ে। তারপর নার্সকে বলে, আরে দেখ, দেখ, অদ্ভুত একটা ব্যাঙ! সবুজ রঙের নয় মোটেই!

দর্দুর তৎক্ষণাৎ ডরোথীর দিকে কটমট করে তাকালো। ইচ্ছে করেই — তার রঙের বাহার দেখাতে। অমনি তার সারা শরীরে হলুদ-কমলা-লাল-নীল ফুটকি ফুটে উঠল। ওর বাপ-দাদাদের আশীর্বাদ! সেই ঈশ্বর নামের অজানা লোকটার অহৈতুকী করুণা!

নার্স বললে, সত্যিই তো! এমন অদ্ভুত ব্যাঙ আমি জীবনে দেখিনি। বহুরূপীর মতো রঙ ফেরাচ্ছে আবার!

দর্দুর কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল — বলা হল না— তার নজরে পড়ল একটা ব্যাপার। মুখে জলের ছিটে দেবার সময় ডরোথীর কানের এক পাটি দুল আচমকা জলে পড়ে গেল। ডরোথী টের পায়নি সেটা — কিন্তু ঠিক নজরে পড়েছে দর্দুরের। সে ত্রিং করে এক লাফ মেরেছে জলে।

হীরে বসানো সোনার দুল। বেশ ভারী। দ্রুতগতিতে সেটা নেমে যাচ্ছে জলাশয়ের নিচের দিকে। চিক্ চিক্ করছে পোকার মতো। একটা বড় কার্প মাছ সেটা দেখতে পেয়েছে।

রুই মাছ আর কি? খাদ্য-বস্তু মনে করে সেই বিশালকায় রোহিত মৎস্য তীরের বেগে এগিয়ে এল দুলটাকে গিলে খেতে। কিন্তু দর্দুরের সঙ্গে পারবে কেন? সে না শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র! নেহাৎ ব্যাঙ-জন্ম খতম হয়নি, না হলে এখন তো তার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় পালকী দু-পেয়ের মতো আকাশে ওড়ার কথা! এক লাফে দর্দুর গিয়ে দখল নিল দুলটার। রুই মাছটা প্রকাণ্ড। সে অবাক মানল — আরে, আরে! কী দুঃসাহস ঐ ব্যাঙটার!



বিরাট মুখ ব্যাদান করে রোহিতরাজ এগিয়ে এল পোকা-সমেত ব্যাঙটাকে গিলে খেতে। কিন্তু হঠাৎ ব্রেক কষল সে। থমকে গেল! চোখ দুটো নাটা-নাটা হয়ে গেল অগাধ-জল-সঞ্চারী রোহিত মৎস্যের। দর্দুর তখন এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন দৃষ্টি দিয়ে বলছে আরে, আরে! কী দুঃসাহস ঐ পুঁচকে রুই মাছটার!

রুই মাছটা সমঝে নিয়েছে! এ সেই আজব ব্যাঙ! যা খেতে নেই! বাপ-দাদাদের নিষেধ। খেলে কী হয় রোহিতরাজ তা জানে না, তবে শাস্ত্র-বাক্য মানে : ওতে নাকি 'মস্তকপাতন' হয়! তড়িঘড়ি রোহিতরাজ

পালিয়ে গেল — যেদিকে দুচোখ যায়।

দুল মুখে করে দর্দুর ভেসে উঠল জলতলে!

আঃ! কী কেলেঙ্কারী! দুলটা যে খুলে জলে পড়ে গেছে তা ওরা কেউ টের পায়নি। না ডরোথী, না তার নার্স! তারা তখন ফিরে যাচ্ছে বাড়ির দিকে।

দর্দুর কী আর করে? তার মনে হল, বাড়িতে ফিরেই ডরোথীর নিশ্চয় খেয়াল হবে। আয়নায় মুখ দেখতে গেলে; কিংবা কারও না কারও নজরে পড়বে ব্যাপারটা। হয়তো তখনই খোঁজ করতে আসবে পিক্‌নিক-স্পটে, এবং পুকুর পাড়ে। সেই সম্ভাবনার প্রত্যাশায় দর্দুর সারারাত ঠায় বসে রইল ঘাটের কিনারায়।

সারাটা রাত। ডরোথী এল না। কেউই খোঁজ নিতে এল না। একটা ক্ষীণ আশা ছিল — বেঙী ওর তত্ত্বতালাস নিতে আসবে। বাসায় তাকে না দেখতে পেলে। বেঙী রোজ সন্ধ্যার পর ওর কাছে আসে। কখনো মুখে করে নিয়ে আসে কিছু পোকামাকড়। অথবা সে যে কত-কত বিদ্যে শিখেছে তার কেরামতি দেখাতে। মেয়েটা কী বোকা! সবুজ ব্যাঙেরা যে অন্য প্রজাতির, এটা সে বোঝে না। আর তাছাড়া দর্দুর তো ব্যাঙই নয়! নেহাৎ শাপভ্রষ্ট হয়ে পড়ে আছে এই পুকুরে···

পরদিন ভোর-ভোর সে ফিরে এল তার গর্ত-বাসায়। সেখানে পেল নানান দুঃসংবাদ। মাছ-পাড়ায় এর ছেলে, ওর মেয়ে, তার বাপ-খুড়ো খোয়া গেছে। যাবেই। পালকহীন দু-পেয়েরা যখন 'চার' ছড়ায় তখন এমন ব্যাপার ঘটবেই। মাছেরা যে ব্যাপারটা জানে না তাও নয়। মৎস্যপুরাণে যথারীতি সাবধানবাণী লেখা আছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! জেনে-বুঝেও ওরা দলে-দলে সাঁতরেযায় 'চার' ছড়ালেই! সবাই ভাবে অ্যাইসা কায়দা করে খাব যে, বঁড়শিটা এড়িয়ে শুধু খাবারটুকুই মুখে চলে আসবে। আরে বাবা! আমাদের সঙ্গে কি বুদ্ধিতে পারিস তোরা?

দর্দুরের মানসিক উন্নতি হয়েছে। এখন আর 'পালকহীন দু-পেয়ে' কিংবা 'মানুষ' বলে না সে; বলে 'আমাদের জাত'! ও ধরে নিয়েছে ও মানুষই! নেহাৎ ব্যাঙ-জন্মটা এখনো খালাশ হয়নি, তাই···

ব্যাঙ-পাড়ায় শোনা গেল আর এক দুঃসংবাদ। প্লবঙ্গমীকে কাল নাকি বিকেলের পর আর কেউ দেখেনি। দলের সঙ্গে সেও পংক্তি ভোজনে যোগ দিয়েছিল। সারাটা দিন খুব হৈ চৈ করেছে। দু-চারটে ব্যাঙ ছিপে ধরাও পড়েছিল। পালকহীন দুপেয়েরা বঁড়শি খুলে তাদের জলে ফেলে দিয়েছে আবার। পালকহীন দু-পেয়েরা সবুজ-ব্যাঙ খায় না। দর্দুরের মনে হল, বেঙী বোধহয় কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে। হয়তো নতুন কোন সবুজ-ব্যাঙের সঙ্গে আস্‌নাই হয়েছে। আহা তাই হোক! তাহলে পাগ্‌লিটার খোয়াব খতম্ হবে! দর্দুরের পিছনে অহেতুক ঘুরঘুর করবে না আর।

দর্দুর আর অপেক্ষা করল না। ফিরে গেল পুকুরঘাটে। কী জানি যদি ইতিমধ্যে দুলের খোঁজ করতে ডরোথী ঘাটে আসে!

যা ভেবেছে তাই। নার্স আর ডরোথী ঝোপে-ঝাড়ে কী যেন খুঁজছে।



দারুণ আনন্দ হল দর্দুরের! মনে হল — সন্ন্যাসীদাদুর গল্পটা ওর জীবনেও বর্ণে বর্ণে ফলে যাচ্ছে।

ডরোথী যেই জলের কিনারে এসেছে অমনি জড়োয়া-দুলটা মুখে নিয়ে দর্দুর দিল এক লাফ্!

এক লাফে রাজকন্যার পায়ের কাছে!

— ও মা গো! — ডরোথীও মেরেছে এক লাফ!

আর ঠিক তখনই বুড়ি নার্সটার নজরে পড়েছেঃ আরে! আরে! ঐ তো!

ডরোথী স্তম্ভিত — হ্যাঁ, তাই তো! ব্যাঙটার মুখে সেই হারানো দুলের পাটিটা।

নার্স বলে, খুব হুঁশিয়ার! ভয় পেয়ে ব্যাঙটা না জলে লাফ দেয়!

ডরোথী হাস্তে হাস্তে বলে, দেবে না, মিস্ ট্যাটলক্! মনে নেই সেই 'গ্রিমস্ ফেয়ারী টেলের' গল্পটা? ব্যাঙটা তো আসলে রাজপুত্র! এসেছে আমার সঙ্গে মিতালী পাতাতে!

বাঃ! ডরোথী তো দারুণ বুদ্ধিমতী! ঠিক বুঝে ফেলেছে!

দর্দুর দুলটা পাষাণ-রানায় নামিয়ে রেখে সন্ন্যাসীদাদুর মুখে শোনা সেই রূপকথার ছড়াটা শুনিয়ে দিলঃ

"ঠিক বলেছ রাজার মেয়ে, বন্ধু তোমার আমি।
সোনার চেয়ে তোমার সোনা-মুখের কথাই দামী!"

হায়! রূপকথার যুগ সেই কবে হারিয়ে গেছে শেয়াল-ডাকা পিদিম-জ্বালা বিগত সন্ধ্যার সাথে-সাথে। শুধু তাই নয়, তার পরবর্তী জমানারও পালা-বদল হয়েছে। ঢাকিরা আর খালে-বিলে ঢাক বাজায় না, মস্তান-পার্টি মাইক বাজায় তার বদলে। জমিদারের বুড়ো হাতিটাও দেহ রেখেছে জমিদারীর সাথে সাথে, তার বদলে এসেছে ষড়যন্ত্রীমশাইদের লিমুসীন! তাই রূপকথারও রকমফের হয়েছে। ব্যাঙ আর এখন পারে না মানুষের বোধগম্য-ভাষায় কথা বলতে। এ তো আর সেই বাল্মীকি — বুদ্ধ — সেন্ট-ফ্রান্সিস্ অব আসিসীর যুগ নয়! তাই ডরোথী শুধু শুনতে পেলঃ গ্যাঙর-গ্যাঙ!

নার্স ইতিমধ্যে সাবধানে তুলে নিয়েছে হীরের জড়োরা দুলটা। বললে, যাক, এটা যে ফেরত পাওয়া গেল তাই যথেষ্ট। ডরোথী! তোমার উচিত হবে ব্যাঙটাকে একটা 'থ্যাঙ্কু' দেওয়া!

শুধু 'থ্যাঙ্কু'! দর্দুর বিহ্বল হয়ে পড়ে।

ডরোথী খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঠিক দর্দুরের মনের কথাটাই বলে যেন! বললে, কী যে বল মিস্ ট্যাটলক্! শুধু মৌখিক ধন্যবাদে ও খুশি হবে কেন? এ যে আমার সঙ্গে মিতালী করতে চায়! আমার সঙ্গে এক টেবিলে খাবে, এক বিছানায় শোবে। না রে, প্রিন্স চার্মিং?



দর্দুর 'কার্টিসি-বাও' করবার চেষ্টা করল। গদগদভাবে বললে — কী বললে, তা বোঝা গেল না; শোনা গেলঃ গ্যাঁঙর-গ্যাঙ!

ডরোথী ততক্ষণে নিচু হয়ে খুলে ধরেছে তার 'ফুটানি-কি-বটুয়া'। বলছে, কাম-অন্ মাই ডার্লিং!

মিস্ ট্যাটলক ধমক দেয়, ওটা কী হচ্ছে ডরোথী! মতলবটা কী তোমার?

— রাজপুত্রকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। ওকে সাজিয়ে রাখব আমার ড্রেসিং টেবিলে — সেই পান্নাকুমারীর পাঁজর ঘেঁষে। দুটিতে জুটি বেঁধে থাকবে — স্টাফ্ড্ পেপার-ওয়েট!

নার্স ধমকে ওঠে — ছিঃ! কী নিষ্ঠুর তুমি!

রাজকন্যার কথার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারেনি, তবু দারুণ আনন্দ হল দর্দুরের। এতদিনে শাপমুক্ত হয়ে সে আবার রাজপুত্র হয়ে যাবে। ঠিকই বলেছিল দাদু! ও পালকহীন দু-পেয়ে! রাজকন্যার বিছানায় একরাত শুলেই...

নিখুঁত টিপ করে সে মারল একটা স্প্রিং লাফ্। অব্যর্থ লক্ষ্য। একেবারে ভ্যানিটিব্যাগের গর্তে।

ডরোথীর বেড-রুমে পৌঁছে সে দিশেহারা হয়ে গেল।

কী সুন্দর ঘর! কী নরম বিছানা! জানলায়-জানলায় সৌখিন ট্যাপেস্ট্রি পর্দা। ফুলদানিতে একগুচ্ছ গ্ল্যাডিওলাই। দেওয়ালের রঙ লাইল্যাক। কিন্তু ওগুলো কী?

দেওয়াল থেকে মুখ বার করে আছে বাঘ-মোষ-হরিণের মাথা!

ওরা অমন প্যাট-প্যাট করে দর্দুরের দিকে তাকিয়ে আছে কেন?

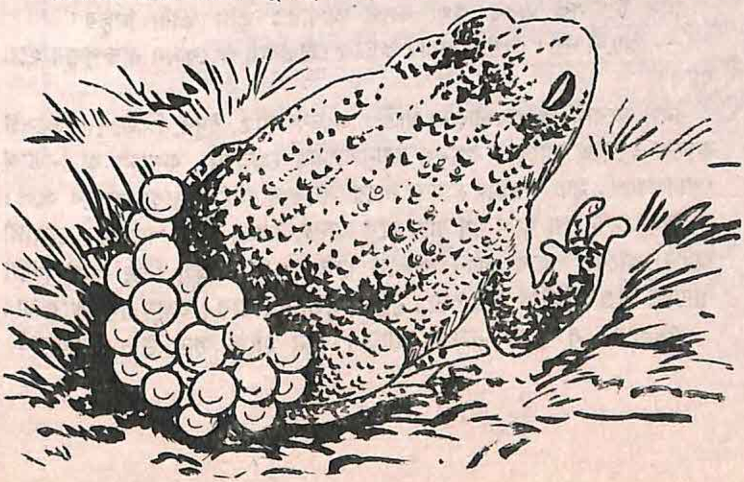
প্রথমে দারুণ ভয় পেয়েছিল। তারপর মনে হল, এরা বোধ হয় ঐ রাজকন্যার পোষা জীবজন্তু। কিন্তু ওদের বাকি দেহটা কোথায়? ও! বোঝা গেছে! দেহটা দেওয়ালের ওপাশে।

দেওয়াল-বরাবর আছে গর্ত। তাই দিয়ে ওরা শুধু মুখটুকু এঘরে বার করে আছে। কিন্তু এমন নট নড়ন-চড়ন কেন? শীত ঘুম? তাহলে চোখ খোলা কেন? আর শীত তো শেষ হয়ে গেছে সেই কবে!

ডরোথী দর্দুরকে বার করে তার টেবিলে রাখল। একটা কাচের গবলেট উপুড় করে ঢাকা দিল। বাটিটার এক কোণায় নিচের দিকে একটা পঞ্চাশ ক্রজিরো গুঁজে দিল। যাতে দর্দুর দম-বন্ধ হয়ে মারা না যায়। তারপর সে তার ল্যাবরেটারি-রুমে চলে গেল 'ডিসেক্শান বক্স'টা আনতে।

ঠিক তখনই দর্দুরের নজর গেল টেবিলের ও-প্রান্ত!

আরে ঐ তো! বেঙী! টুম-টুম হয়ে বসে আছে! সেই চিক্‌চিকে সবুজ



রঙা শাড়ি পরা ওর খেলার সাথী! ও! তাই বুঝি ডরোথী বলেছিল ও-কথা — 'পান্নাকুমারীর পাশাপাশি ওকে ঠাঁই দেব!' কিন্তু বেঙী কি এটা ঠিক ভাবে নিতে পারবে? ও রাজপুত্র হয়ে গেলে? পারবে! ঠিক পারবে! এখন তো আর সে বোকা-সোকা নেই। সাত পর্যন্ত গুণতে শিখেছে। বললে কেন বুঝবে না যে, দর্দুরের ঘরণী হওয়া সম্ভবপর নয় বেঙীর পক্ষে। দর্দুর যে আদৌ ব্যাঙই নয়…

দর্দুর মিঠে গলায় ডাকল, বেঙী! এই বেঙী! তুই তো আচ্ছা পাগলী রে! এখানে লুকিয়ে বসে আছিস্? ও দিকে ব্যাঙ-পাড়ায় তোকে দেখতে না পেয়ে…

এ কী! বেঙী ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, কিন্তু যেন সাড়া নেই তার!

— বেঙী! এই বেঙী! কী দেখছিস্ প্যাট প্যাট করে? কথা কইছিস্ না কেন?

বেঙী না রাম, না গঙ্গা!

— রাগ হয়েছে? অভিমান? কী করব বল? আমি যে ব্যাঙই নই আদপে…

নাঃ! বেঙী যে ওর কথা শুনছে, বুঝতে পারছে, এমন তো মনে হচ্ছে না! ঘুমাচ্ছে? তা কেমন করে হবে? চোখ দুটি তো খোলা। ও তো মাছ নয় যে, তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমাবে!

হঠাৎ নজর হল সেই বুড়ি নার্স, মিস্ ট্যাটলক্ পা টিপে টিপে চুপিসাড়ে এগিয়ে এল। চারদিকে চোরা চাহনি হেনে চট্ করে খুলে দিল ওর ঢাক্‌নাটা! বললে, শিগ্‌গির পালা! ঐ দেখ্, দরজাটা খোলা আছে। মার দেখি এস-ল্যাক্সের মতো একটা লাফ!

দর্দুর অবাক হয়ে বলে, ওমা! পালাব কেন? আমি তো রাজকন্যের বন্ধু! দেখ না, কাল সকালেই আমি হয়ে যাব রাজপুত্তুর!

বেচারি দর্দুর! মিস্ ট্যাটলক্ শুধু শুনতে পেল ব্যাঙের ডাক!

তৎক্ষণাৎ ছুটে এল ডরোথী। সবার আগে কাচের গব্‌লেটে আবার ঢাকা দিল দর্দুরকে। মিস্ ট্যাটলককে বললে, আমার এমন একটা আশঙ্কা ছিলই তুমি হয়তো ওকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবে। এবার যাও তুমি! এখন রাজপুত্তুরের সঙ্গে আমার খেলা শুরু হবে।

মিস্ ট্যাটলক একই কথা বলল আবার: তুমি ভারী নিষ্ঠুর!

— আদৌ নয়! দেখ, সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় ও কেমন রাজপুত্তুর হয়ে যাবে।



মিস্ ডরোথী জীববিজ্ঞানের ছাত্রী। অনেক ব্যাঙ, ইঁদুর, গিনিপিগ ডিসেক্ট করতে হয়েছে তাকে। কখনও জ্ঞানলাভের প্রেরণায়, কখনো বা নিতান্ত খেয়ালবশে। মৃত জন্তুটার চামড়া দিয়ে 'স্টাফ্‌ড়' সৌখিন দ্রব্য বানাবে বলে।

ইন্সট্রুমেন্ট-বক্স খুলে সে বার করে আনল একটা তীক্ষ্ণ শলাকা। ডরোথী জানে, কানের পাশে কোন্ বিন্দুতে সেই সূচটা আমূল বিদ্ধ করে দিলে ব্যাঙের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যায়। মুহূর্তে মৃত্যু হয় তার। অথচ রক্ত ঝরে না।

দর্দুরকে সে তুলে নিল বঁ-হাতে। ডান হাতে তার উদ্যত শলাকা।

ডরোথীর নরম আঙুলের ছোঁওয়ায় দর্দুরের চোখ দুটি আবেশে বুজে যায়।

বেঙী তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

দর্দুর ভাবে ঐ সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় এখুনি সে রাজপুত্তুর হয়ে যাবে। রাজকন্যে বলেছে। সে কি মিছে কথা বলতে পারে? কথা যে সোনার চেয়েও দামী।

আইন-মোতাবেক রূপকথার গল্পটা এখানেই শেষ হবার কথা।

কারণ পরমুহূর্তেই আমার কাহিনীটা হয়ে পড়ল নায়কহীন!

তা পড়ুক! গল্পটা বাপু এখনো শেষ হয়নি আমার। এটা যে 'বিজ্ঞান-ভিত্তিক'!

কারণ দুর্ঘটনা তো একটা হয়নি। হয়েছিল দুটো। নায়কের আঘাতটা বড় — মরণান্তিক! নায়িকার আঘাতটা যৎকিঞ্চিৎ— সিকি ইঞ্চি পরিমাণ। কিন্তু দুর্ঘটনাকে কি ইঞ্চি দিয়ে মাপা যায়?

ব্যাপারটা নিতান্তই তুচ্ছ। দর্দুরের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার সময় অসাবধানে ডরোথীর ডান হাতের তর্জনীতে সামান্য একটু কেটে গেল। ব্লেডের আঘাত — সিকি-ইঞ্চি পরিমাণ।

কর্ণমূলে শূলবিদ্ধ হবার সময় দর্দুরের রক্ত ঝরেছিল মাত্র দু-ফোঁটা!

অসাবধানে আঙুলটা কেটে যাওয়ায় ডরোথীরও রক্ত ঝরল ঐ দু-ফোঁটাই!

আশ্চর্য! চোখে দেখে কে বলবে একটা উভচরের, একটা স্তন্যপায়ীর। চার ফোঁটা রক্তই সমান লাল!

সামান্য ক্ষত। সামান্য ক্ষতিই হবার কথা। হল না। বাধ্য হয়ে সে-রাত্রে দর্দুরকে 'স্টাফ' করা গেল না। আঙুলে একটা স্টিকিং প্লাস্টার জড়িয়ে ডরোথী সে-রাত্রে দর্দুরকে ডুবিয়ে রাখল মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতলে। ভেবেছিল, দিন দুই পরে কাজটা শেষ করবে। বানাবে একজোড়া সৌখিন পেপার-ওয়েট। ব্যাঙ-বেঙী! বিচিত্রবর্ণ বর আর পান্না রঙের কনে।

ডরোথীর সে বাসনা চরিতার্থ হয়নি।

সে রাত্রেই প্রবল জ্বল এল ওর।

পরদিন ম্যাক-গ্রেগরী সাও পাওলো থেকে একজন ডাক্তারবাবুকে পাকড়াও করে আনলেন। আদরের দুলালী রাত থেকে জ্বরে পড়ে আছে। শুধু জ্বর নয়, ভোর রাত থেকে আঙুলে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ডরোথীর।

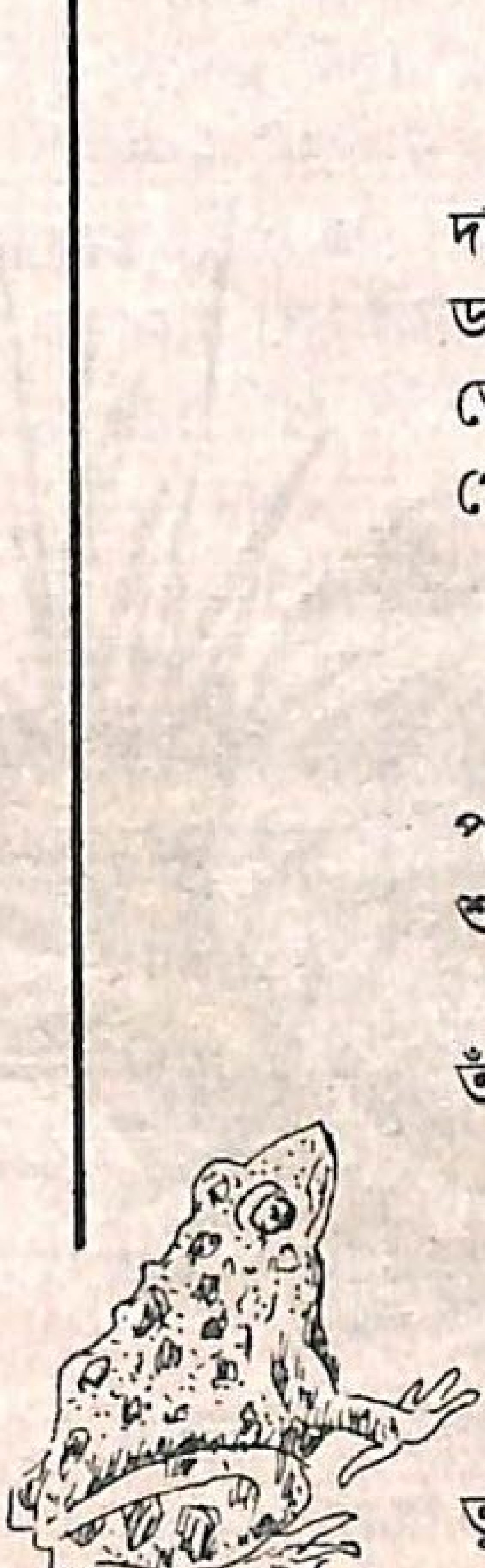
ডাক্তারবাবু ব্যান্ডেজ খুলে আঙুলটা পরীক্ষা করলেন। ভ্রূকুঞ্চিত হল তাঁর। বললেন, কীভাবে কাটল আঙুলটা?

— ব্লেডে।

— ব্লেড-এ? মর্চে ধরা ব্লেড?

— না, না। প্যাকেট-খোলা আনকোরা নতুন ব্লেড।

— স্ট্রেঞ্জ! তাহলে সেপ্‌টিক হল কেমন করে? ব্লেড দিয়ে কী করছিলে তুমি?



অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে ডরোথী কোনক্রমে বললে, একটা ব্যাঙ ডিসেক্ট করছিলাম।

— ব্যাঙ! কী ব্যাঙ? কোথায় স্পেসিমেনটা?

ধনকুবের দাঁড়িয়েছিলেন পাশেই। বিরক্ত হয়ে বললেন, সে সব পরে হবে। কী ব্যাঙ, কোথাকার ব্যাঙ জেনে কী হবে। রোগিণীকে দেখুন। কীরকম কাৎরাচ্ছে!

ডাক্তারবাবু পূর্ণদৃষ্টিতে ম্যাকগ্রেগরীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কী যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। অগাধ সম্পত্তির মালিক — একমাত্র কন্যা — হয়তো তাই সাধারণ সৌজন্যটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন উনি।

ইতিমধ্যে নার্স ট্যাটলক নিয়ে এসেছে স্পিরিটের শিশিটা।

ব্যাঙটাকে গ্লাভস্-পরা হাতে 'টং' দিয়ে বোতল থেকে বার করলেন ডাক্তারবাবু। রোগিণীকে ছেড়ে আলোর সামনে ব্যাঙটাকেই পরীক্ষা করতে থাকেন। দর্দুরের গায়ের চামড়া ছাড়ানো হয়নি। তার চোখ দুটি বোজা। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে সোনার কাঠির ছোঁয়ায়।

ডাক্তারবাবু রোগিণীর দিকে ফিরে আবার প্রশ্ন করেন, এ ব্যাঙ তুমি কোথায় পেলে?

ডরোথী জবাব দিতে পারল না। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে।

জবাব দিল নার্স। বললে, আমাদের বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে।

— পুকুরে? কেমন করে ধরলে ওকে?

আর সহ্য হল না ম্যাক্‌গ্রেগরীর। দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে ওঠেন, ফর



হেভেন্‌স্‌ সেক ডক, আপনার জুয়োলজিকাল কিউরিওসিটিকে একটু সামলান! ডরোথীকে দেখুন এবার।

ডাক্তার শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনি একটু ও-ঘরে চলুন দেখি।

গৃহস্বামীকে নিয়ে ডাক্তারবাবু পাশের ঘরে চলে এলেন।

ম্যাকগ্রেগরী এতক্ষণে একটু ঘাবড়ে গেছেন। বলেন, কী ব্যাপার? এনিথিং রঙ? এঘরে কেন?

— হ্যাঁ। গ্যাংগ্রিন্‌ শুরু হয়ে গেছে। অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে পচন কার্যটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি এখনই মিস ডরোথীর তর্জনীটা কেটে বাদ দিতে চাই। গার্জেন হিসাবে আপনাকে একটা অনুমতিপত্র লিখে দিতে হবে।

— গুড হেভেন্স! আঙুল কেটে বাদ দেবেন মানে? ওটা যে ওর ডান হাত।

— জানি! এ ছাড়া উপায় নেই!

ধনকুবের অস্ফুটে গর্জন করে ওঠেন, ইম্পসিবল্‌! অ্যাবসার্ড! আমি কিছুতেই সম্মত হব না! যাক, আপনি যতটুকু করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। এবার আসুন আপনি। বিলটা পাঠিয়ে দেবেন।

— দেব। কিন্তু আপনি কী করতে চান এখন?

— ডরোথীকে নিয়ে এখনি সাও পাওলো যাব! বেস্ট মেডিক্যাল অ্যাডভাইস্‌ নেব আমি। হাতুড়ে ডাক্তার নয়! যারা প্রথমেই আঙুল কেটে বাদ দেবার কথা বলে না! সেখানে উপযুক্ত ডাক্তার না পেলে চার্টার্ড প্লেনে করে ডরোথীকে ভিয়েনায় নিয়ে যাব আমি! আচ্ছা আসুন আপনি।

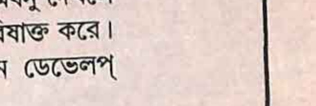
— ঠিক আছে। তবে ফী-জ যখন নিচ্ছি তখন আর একটু মেডিক্যাল অ্যাডভাইজ দিয়ে যাওয়া কর্তব্য মনে করছি, মসিয়ো ম্যাকগ্রেগরী। সাও পাওলাতে গিয়ে ও-বেলা অপারেশন করালে হয়তো মিস্‌ ডরোথীর কব্জি থেকে কেটে বাদ দিলেই চলবে — কিন্তু সেখানকার ডাক্তারকেও হাতুড়ে মনে হলে যেন ভিয়েনা যাবার চেষ্টা করবেন না, প্লীজ! তাহলে গোটা ডান হাতখানা বাদ দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারবেন না।

— মানে?

— আপনি 'ব্যাঙ-নাচানি' জুয়ো খেলার ব্যবস্থা করছেন, আর এ ব্যাঙটাকে চেনেন না?

ম্যাকগ্রেগরী জবাব দেবার অবস্থায় নেই। তাঁর চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ল শুধু।

— এই ব্যাঙের নাম 'ডেন্‌ড্রোবেট'। অতি দুর্লভ প্রজাতির ব্যাঙ। এদের চামড়ার নিচে থাকে অতি তীব্র বিষ! সাপ পর্যন্ত এই ব্যাঙের রামধনু দেখলে পালিয়ে যায়। আদিবাসীরা এর তীব্র বিষ দিয়েই তীরের ফলা বিষাক্ত করে। আর সেই জন্যেই মাত্র বারো ঘন্টার ভিতর এভাবে গ্যাংগ্রিন ডেভেলপ্‌ করেছে!



গল্পটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল, নয়?

গোড়ায় গলদ করে বসেছি আমি নিজেই। 'বিজ্ঞান-ভিত্তিক রূপকথা'

হচ্ছে সোনার পাথর বাটি। ও হবার নয়! আমার কী দোষ?

তবে শুনেছি, সঠিক জানি না — মিস্ ট্যাটলক নাকি ঐ একই স্পিরিটের বোতলে রেখে দিয়েছিল রাজকন্যার কাটা আঙুলটা — যে আঙুলের স্পর্শে রাজপুত্র শেষমুহূর্তে শিহরিত-তনু হয়েছিল! রাজপুত্তুর আর রাজকন্যার কাটা আঙুল ঐ মেথিলেটেড স্পিরিটের শিশিতেই lived happily ever afterwards!

তথ্যসূত্র

তথ্য-উৎস জীববিজ্ঞানের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ: General Zoology, লেখক ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকজন অধ্যাপক, প্রকাশক Tata Mc Graw Hill Publishing Co. Ltd, 1979.

1) কয়েক জাতের মাদী-ব্যাঙ পিঠে ডিম নিয়ে ঘোরে, যেমন Carathyla sp.। যে প্রজাতির পুরুষ-ব্যাঙ ব্যাঙাচিদের পিঠে করে ঘোরাফেরা করে তারা ডেনড্রোবাটিডি (Dendrobatidae) পরিবারের। গণ-প্রজাতি *Colostethus punctatus.*। অর্থাৎ এ কাহিনীর নায়ক যে-জাতের। পিঠে চামড়ার থলির তলায় যারা ব্যাঙাচিদের আশ্রয় দেয় তারা হাইলিডি পরিবারের (Hylidae)। সন্ন্যাসীদাদু বলেনি, কিন্তু এমন বিচিত্র জাতের ব্যাঙ আছে যাদের ডিমকে 'তা' দেওয়া হয় পুরুষ-ব্যাঙের গলার থলিতে, এমন কি মাদী-ব্যাঙের পাকস্থলীতে। (The eggs of Darwin's Frog, *Rhinoderma darwini*, are carried throughout their development in the vocal pouch of the male and the *Rheobatrachus silus*, a stream-dwelling Australian frog, transports and broods its larvae and juveniles in the stomach of the female! P - 708

সন্তান জন্মানোর সময় হলে বাপ অথবা মা 'সন্তান-বমি' করে।

2) "At the annual Calaveras Country, Jumping Frog Jubilee at Angels Camp, California, in 1975, 'Ex-lax' made a single leap of 17 ft. 6 3/4 in. for its owner Bill Moniz" — *Guinness Book on World Records*. 1980, p. 37.

3) Class : Insecta, Order : Ephemeropta, *General Zoology,* Tata Mc. Graw Hill Publishing Co. Ltd., 1979, p. 588.

4) শীতঘুম — hibernation

5) ক্রজিরো — ব্রেজিলের মুদ্রা

শেষকথা

একটি বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে কাহিনীটি রচিত। রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকায় পড়েছিলাম। মূল কাহিনীকারের নাম ভুলে গেছি বলে লজ্জিত। তবে আমার অনূদিত কাহিনীটি যখন একটি সাময়িক পত্রিকায় ছাপা হয় (সম্ভবত *কথাসাহিত্য*-পত্রিকায়) তখন তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছিলাম মনে আছে।

আমাদের বাড়িটা আল্পস্ পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালুতে। অস্ট্রিয়ায়। আমরা দশ ভাইবোন। আমাদের অন্নসংস্থানই রীতিমতো সমস্যার কথা — কারণ সম্পদের মধ্যে বাপির ছিল ছোট্ট একটা চাষের জমি। বড়দিনের সময় প্রতিবেশীরা নানান ভোজের আয়োজন করে, আর আমাদের ভাগ্যে প্রতিবারেই নিরামিষ-ভোজ — গাজর, পালঙ, আলু, মটর, বীন, বড়জোর ফুলকপি।

মাংসের কী দাম?

একবার গরমের সময় মাম্মির মাথায় দারুণ একটা আইডিয়া এসে গেল!

একজোড়া রাজহাঁসের বাচ্চা কিনে যদি পোষা যায়? সারা বছর এঁটো-কাঁটা খাবে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরবে, গায়ে-গতরে বাড়বে! বড়দিনের



সময় দারুণ রোস্ট বানানো যায়।

গ্র্যান্ড আইডিয়া! — বাপি সায় দেয়।

যে-কথা, সেই কাজ। মা গেল বাজারে। কিন্তু দোকানদার বললে, আমি দুঃখিত ম্যাডাম! রাজহাঁসের বাচ্চা নেই। একজোড়া অবশ্য ধুঁকছে। তা আমি তাদের বেচব না বাপু!

—কেন? বেচবে না কেন?

— ও দুটো আজ রাতেই পটল তুলবে, যদি নাড়া-চাড়া না করি। আর তুমি যদি ওদের খরিদ করে বাড়ি পানে হাঁটা ধর, তাহলে তোমার দোর-গোড়া পর্যন্ত পৌঁছাবে না। তার আগেই ফৌত হবে। খাম্‌কা তুমি গাল পাড়বে আমাকে।

মা সহজে হাল ছাড়ে না। বলে, কই দেখাও তো তোমার সেই মর-মর মরাল?

দেখল। দোকানের একপ্রান্ত নেতিয়ে পড়ে আছে এক জোড়া রাজহাঁসের বাচ্চা। ধুঁকছে এখনো। অবশ্য দোকানদার ওদের বংশপরিচয় না দিলে কোন জীববিজ্ঞানী তাদের সনাক্ত করতে পারবেন না। নোংরা-কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। মাথা সোজা করতে পারছে না। তবে প্রাণে বেঁচে আছে, তা বোঝা যায়। কারণ মাঝে মাঝে পেনাল্টি কিক্ করছে। পা খিচছে আর কি! মায়ের দয়ার শরীর। বললে, ঠিক আছে, ঐ দুটোকে কিনব আমি। বল, কত দেব?

দোকানি তার চেনা খদ্দেরকে বললে, দাম দিতে হবে না মা। নিয়ে যাও। ওদের কবর দেবার হেপাজত থেকে যে আমাকে বাঁচালে এতেই আমি কৃতজ্ঞ। নেহাৎ যদি বাঁচে তবে ওদের ভাগ্য আর তোমার হাতযশ।

নোংরা-কাদায় মাখামাখি জীবদুটোকে মা তুলে নিল তার টুকরিতে। ফিরে এল বাড়িতে, মর-মর মরাল সমেত। তাদের দেখে বাপির চোখ উঠল কপালে। সেই কপাল চাপড়ে বলল, হায় লর্ড যীসাস! এ বছরও তোমার জন্মদিন পালন করতে হবে ঘাস-পাতা-গাজর খেয়ে!

মা আড়চোখে তার দিকে তাকালো। কোন কথা না বলে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ঠাণ্ডা-গরম জল বাথটবে মিশিয়ে হাঁসজোড়াকে দিল তাতে ছেড়ে। আমরা দশ ভাইবোন হুমড়ি খেয়ে পড়েছি। মা ওদের স্নান করালো; তুলো ভিজিয়ে মুছল। তারপর দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে একটু একটু খাওয়াতে শুরু করল। বাপি বাথরুমে উঁকি মেরে বলল, বুঝেছি! বড় দিনে যে এক-আধটু ব্র্যান্ডি খাব, এবার তাও কপালে নেই! হাঁস-জোড়া মরার আগে বোতলটা শেষ করে যাবে।



এবার আর আড়চোখে নয়, মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকায়। এ দৃষ্টিকে আমরা সবাই চিনি। মায় বাপি! তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে, ঠিগাছে, ঠিগাচ্ছে! যা ভাল বোঝ কর। তোমার কথাই শেষ-কথা!

হংসশাবক দুটির পরিচর্যা করতে করতে রাত গভীর হল। মা আজ আর রাতের খাবার বানাবার সময় পেল না। ফলে ও-বেলার ঝড়তি-পড়তি খাবার যা পড়েছিল তাই আমরা কজনে ভাগাভাগি করে খেলুম। সোজা কথায়

আমরা দশ ভাইবোন যে-যার পেটে কিল মেরে শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। একটা চিৎকারে। রান্নাঘর থেকে মা চিক্কুড় পাড়ছে, ওগো দ্যাখোসে! ওরা দুটোই উঠে বসেছে!

আমরা সবাই হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসি। দেখি — সত্যিই, ব্র্যান্ডির কল্যাণেই হোক, অথবা মায়ের সেবাযত্নেই হোক, দু-দুটো কিম্ভূতকিমাকার জীব উঠে বসেছে! ডানা ঝাড়ছে!

মা বললে, আর ভয় নেই! ওরা যখন ডানা ঝেড়ে উঠে বসেছে, পালক দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে তখন ওরা প্রাণে বেঁচে গেল! এবার ক্রীস্টমাস সত্যিই হবে 'মেরী ক্রীস্টমাস্'!

বড়দি স্কুলে জীববিজ্ঞান পড়ে। ক্ষীণস্বরে সে প্রতিবাদ করে। বলে, মম্! হাঁসেরা নাক দিয়েই শ্বাস নেয়, পালক দিয়ে নয়।

মা প্রচণ্ড ধমক লাগায়, কে তোদের বলেছে মাঝরাতে পণ্ডিত্যেমি করতে? যা, শুগে যা!

আমরা দুদ্দাড়িয়ে পালিয়ে আসি। মা তখন স্বগতোক্তি করছে, কী যে ছাইপাঁশ শেখায় আজকালকার স্কুলে! রাজহাঁস যে পালক দিয়ে নিশ্বাস নেয় এই সহজকথাটাও শেখায়নি।

বাপি এই মধ্যরাত্রে কোন বিতণ্ডায় যেতে রাজী নয়। তার বোধকরি ঘুমও পেয়েছে। বললে, চল, এবার আমরাও শুয়ে পড়ি! তোমার কথাই শেষ কথা!

এটা বাপির একটা বাঁধা লবজ! সন্ধির ভাষা!

বেঁচে যখন গেল তখন ওদের নামকরণ করতে হয়।

বাপি বললে, মদ্দাটার নাম 'সীজার' আর মাদিটা 'ভেনাস'।

মা ধমকে ওঠে, কী বুদ্ধি তোমার! দুটোই ইতালিয়ান নাম! কেন? না, ওদের নাম 'ফিলিপ' আর 'আগাথা'!

বাপি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। এক কথায় মেনে নিল: ঠিগাছে! তোমার কথাই যখন···

— আলবৎ শেষ-কথা! ব্র্যান্ডি খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব আমি, আর নামকরণ করবেন কর্তামশাই! ইল্লি!

ওরা দুজন আমাদের দারুণ পোষ মানল। সকালে আমরা যখন ইস্কুলে যাই ওরা দুটিতে আমাদের এগিয়ে দিয়ে যেত রেলওয়ে ক্রশিং পর্যন্ত। 'গুজ-স্টেপ' মার্চ করে। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই দুজনে ছুটে আসত সোহাগ কুড়াতে: কঁক্-কঁক্-কঁক!

একদিন এক কাণ্ড হল। আমাদের গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটা পার্বত্য ঝরনা। গাঁয়ে অনেকগুলো কামারদের কামারশালা আছে। গাঁয়ের উজানে একটা লক্‌গেটে বাঁধ দিয়ে জলটাকে ধরে রাখা হয় — কারখানার জলের প্রয়োজনে। সন্ধ্যাবেলায় কাজের ছুটি হলে বাঁধের 'ফ্ল্যাপ-ডোর' খুলে দেওয়া হয়। জল যখন বাঁধা থাকে তখন তির্-তির্ করে রূপালী সুতোর মতো জলের ধারা বইতে থাকে। নদীগর্ভে তখন নানান চক্‌চকে নুড়ি ইতিউতি চোখ মেলে তাকায়। কিন্তু গ্রামের কোন ছোট



ছেলে-মেয়ে যেন নদীগর্ভে না নামে সে-বিষয়ে হুকুম জারি করা ছিল — কারণ বাঁধ খুলে দিলেই প্রচণ্ড জলস্রোত। তাতে ছোটরা তো ছাড়, বড়রাই উল্টে পড়বে। কিন্তু আমরা কি সে সব কথা শুনি? কেউ নজর করছে না বুঝলেই আমরা চুপিসাড়ে নেমে পড়ি নদীগর্ভে। কুড়িয়ে আনি নানান জাতের নুড়ি-পাথর। ফিলিপ আর আগাথাও আজকাল আমাদের সঙ্গে নদীগর্ভে নেমে পড়ে। আমরা খুঁজি চক্‌চকে পাথর, আর ওরা খোঁজে ব্যাঙ, শামুক, গুগ্‌লি। সবাইকে লুকিয়ে।

একদিন ঐভাবে নদীগর্ভে খেলতে খেলতে আমরা তন্ময় হয়ে গেছি। সন্ধ্যার অন্ধকার যে ঘনিয়ে আসছে তা আমাদের খেয়ালই নেই। হঠাৎ আগাথা তীরে উঠে তারস্বরে ডাকতে থাকে: কঁক-কঁক্, কঁক্-কঁক!

শেয়ালে ধরল নাকি? আমরা দুদ্দাড়িয়ে সেদিকে ছুটে যাই। পরক্ষণেই প্রচণ্ড জলোচ্ছাসে নদী গর্জে উঠল। বড়দি ইস্কুলে জীববিজ্ঞান পড়ে। সে বললে, এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ জীবজন্তুরা আগেভাগে টের পায়। আধমাইল উজানে কারখানার কর্মীরা লক্‌-গেট খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আগাথা সেটা টের পেয়েছে। আমরা তা বুঝতেই পারিনি।

ব্যাপারটা চেপে যাব এটাই সবাই স্থির করলুম। আগাথা কী-ভাবে আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে সে-কথা বলতে হলে তার আগে স্বীকার করতে হয় যে, আমরা নদীগর্ভে নেমেছিলুম!

কিন্তু সে বুদ্ধি খাটল না। ধারে বসে জনসন-খুড়ো সবকিছুই দেখতে পেয়েছে। বাড়ি ফিরে আমরা সবাই প্রচণ্ড ধমক খেলুম! আর মা দোকান থেকে একটা ব্রোঞ্জের ক্রস কিনে এনে লট্‌কিয়ে দিল আগাথার গলায়।

জনসন-খুড়ো বললে, ঠিক করেছ মা! ওর মেডেল পাওয়াই উচিত! কী সর্বনাশটাই না হতে যাচ্ছিল আজ! আগাথাই ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছে!

আমাদের একটু খারাপ লাগল। আগাথার গলায় যদি মেডেল থাকে তাহলে ফিলিপ আবার তাকে হিংসে করবে না তো?

বাপি আশ্বস্ত করল আমাদের, না! ফিলিপ হিংসে করবে না! এই তো মায়ের গলায় মফ্‌চেন আছে, বাপির নেই — তাই বলে বাপি কি মাম্মিকে হিংসে করে? তাছাড়া ফিলিপ হচ্ছে পুরুষ — সে কখনো মালা পরে?

ক্রীস্টমাস এগিয়ে আসছে।

আমরা ভুলেই গেছি, সে-কথা। কী উদ্দেশ্যে হাঁসজোড়া কেনা হয়েছিল। কিন্তু ভোলেনি একজন। গাঁয়ের কুখ্যাত সিঁদেল চোর। এক রাতে হাঁসদের ঘর থেকে শোনা গেল ঝুটোপুটি, চিৎকার, চেঁচামেচি। বাপি তার বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ছুটে গেল হাঁসঘরের দিকে। বেচারি চোর। সে এসেছিল হাঁসজোড়া চুরি করতে। বড়দিনের বাজারে হাঁসের কী-দাম! আগাথাকে সে একটা থলিতে বন্দীও করে ফেলেছে। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে ওপাশ থেকে ফিলিপ ছুটে এসে তাকে মর্মান্তিকভাবে ঠোকরাতে শুরু করে। চোরটা অন্ধকারে তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। প্রথম ঠোকর খেয়েই তার হাত থেকে টর্চটা কোথায় ছিটকে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বেচারি পাঁচিল টপ্‌কিয়ে পালাতে



চেয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঠ্যাঙ ভেঙেছে।

গাঁয়ের চৌকিদার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে। খোঁড়া-চোর তখন যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিলাচ্ছে! চৌকিদার ওকে চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

বেচারি চোর! হাঁসের বদলে তার বরাতে জুটল হাসপাতাল!

মা বাপিকে বললে, যাও! এক্ষণি দোকান থেকে একটা ব্রোঞ্জের ক্রস কিনে নিয়ে এস। এবার ফিলিপকেও মেডেল পরাতে হবে।

মায়ের কথাই যেহেতু 'শেষ-কথা' তাই বাপি বলল না যে, পুরুষে গলায় মালা পরে না! তখনই দৌড়ালো মেডেল কিনে আনতে।

অন্যান্য বছর নভেম্বর মাস পড়তে-না-পড়তেই প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে। এবার সে-কথা কেউই তুলছে না। মানে ঐ বড়দিনের ভোজের প্রসঙ্গটা। শেষমেষ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মা নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা তুললো, ভাব্‌ছি হাঁসজোড়াকে বেচে দিই। পোষা-হাঁস কি কেটে খাওয়া যায়?

বড়দি শুধু বললে, কিন্তু মা···

এ বাড়িতে শেষ-কথা বলার হক শুধু মাম্মির! আমরা জানি, কিন্তু এ-কথাও যে জানি, এ-সময় ফিলিপ আর অগাথাকে বিক্রি করা মানে তাদের অবধারিত মৃত্যু!

বড়দিনে মাংসের কী দাম!

বড়দি যদিও কথাটা বলেনি, তবু মা বুঝল। বললে, তাহলে বরং একটা বড় কেক বানাই! কেমন? ক্রীস্টমাস কেক!

বাপি বলে, গ্র্যান্ড আইডিয়া! আর তোমার হাতের কেক্ যা হয় — ম্যাগ্‌নিফিক!

আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা!

বাপি কিনে আনল প্রকান্ড একটা 'ক্রিস্টমাস-ট্রি'। ফুল, ফল আর শিকলি দিয়ে আমরা দশ ভাইবোনে গাছটাকে সাজালুম। এবার একটু রকমফেরও হল। গাছতলায় বড় বাথ্‌টবটাকে উবুড় করে পেতে দেওয়া হল। গলায় মেডেল ঝুলিয়ে ফিলিপ-আগাথা তার উপর উঠে বসল টুম্‌টুম্ হয়ে। দারুণ খোলতাই হল তাতে।

রাত্রে আমরা দশ ভাইবোন, বাপি-মম, আগাথা-ফিলিপ একসঙ্গে নৈশাহার সারলুম মহাআনন্দে। আলু, গাজর, মটরশুটি আর ফুলকপি। ব্র্যান্ডি ফুরিয়েছে — তা হোক মায়ের হাতে বানানো 'ম্যাগ্‌নিফিক' কেকটা তো ছিল!

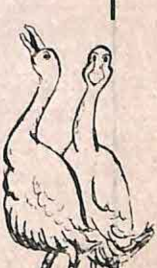
আহার শুরু করার আগে বাপি প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করল।

মা হাসতে হাসতে বললে, এবার বড়দিনে 'শেষ-কথাটা' কিন্তু তুমিই বললে!

বাপি ঢোক গিয়ে বলে, আমি! কই? আমি তো আজ কোন কথাই কইনি!

— না, আজ নয়। সেই প্রথম দিন! যেদিন হাঁসজোড়াকে কিনে এনেছিলাম — সেইদিন!

বাপির তা মনে নেই। স্বীকার করল সে কথা, কী? কী বলেছিলুম আমি?



— ' ও লর্ড যীসাস্! এ বছরও তোমার জন্মদিন পালন করতে হবে ঘাস-পাতা গাজর খেয়ে?'

আমরা সমস্বরে হেসে উঠি!

ওরা কী বুঝল তা ওরাই জানে! আগাথা-ফিলিপও যোগ দিল সেই আনন্দোচ্ছ্বাসে! কঁক্-কঁক্! কঁক্-কঁক্!



না-মানুষ দরদীদের দরবারে

[120 পৃষ্ঠায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর]

1. Rooster
2. Gander
3. Buck
4. Drake
5. Sow
6. Tigress
7. Ewe
8. Vixen
9. Cub
10. Lamb
11. **Duckling**
12. Tadpole
13. Cygnet
14. Chick
15. Colt
16. Filly
17. **Fawn**
18. **Calf**
19. Kitten
20. Bull calf
21. Roar
22. Squeal
23. Bleat
24. Moo
25. Quack
26. Howl
27. **Caw**, croak
28. Hiss
29. Bray
30. Gaggle
31. Honk
32. Cackle
33. Crow
34. Croak
35. Coo
36. Trumpet
37. Flock
38. Herd
39. Pride
40. Pack
41. Wisp
42. Shoal
43. Gaggle
44. Sloth
45. Kennel
46. Coop
47. Fold, Pen
48. Hutch
49. Dovecote
50. Sty



দেবতার প্রতিস্পর্ধী মানুষ চাঁদ ছুঁয়ে এল, কিন্তু তার পদতলে-পিষ্ট তৃণখণ্ডের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি আজও। সৌরতেজ থেকে শারীরধর্ম রক্ষার প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণের জন্য সালোক-সংশ্লেষের কায়দাটা সে রপ্ত করতে পারেনি—না তার দেহে, না ল্যাবরেটারিতে।

তাই সেই 'সবার উপরে সত্য মানুষ আজও উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ্‌ভোজী নানান না-মানুষের দ্বারে ভিখারি।

অথচ জীবজগতের Big Brother, বড়দা গত দু-তিনশ' বছরে যথেচ্ছ শিকার করে, গাছ কেটে, নানাভাবে পরিবেশ দূষিত করে এই পৃথিবীকে করে তুলেছে জীবজগতের পক্ষে প্রায় অনুপযুক্ত। Ecology বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে সে সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহকে ঠেলে দিচ্ছে মহামৃত্যুর দিকে।

এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে প্রাথমিক কাজ জীবজন্তু গাছপালাকে ভালবাসা। মানুষ-নামানুষের সেতুবন্ধন। বুদ্ধ-যীশু-চৈতন্য যে উপদেশ দিয়েছেন আত্মিক উন্নতির জন্য, নির্বাণ বা মুক্তির উপায় হিসাবে, তা-ছাড়াও নিতান্ত প্রাণধারণের তাগিদেই আজ দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে।

এবং catch them young! বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়ের দল তাদের যৌবনকালের big-game-hunting-এর কাহিনী রোমন্থনে কালাতিপাত করতে থাকুন, [কী নির্লজ্জের মতো 'game' শব্দটা ওঁরা ব্যবহার করেন।] কিন্তু আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। উপদেশ বর্ষণে কাজ হওয়া কঠিন; জীবপ্রেমের কাহিনী শুনিয়ে ওদের না-মানুষ-দরদী করে তুলতে হবে। শিকারের গল্প নয়, স্বীকারের গল্প। দু-তিন শ' বছর ধরে না-মানুষদের প্রতি যে অবিচার করেছি তারই সকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে।